



**বাংলাবুক.অর্গ**

শেখ আবদুল হাকিম-এর দুটি উপন্যাস

**মধুবালা, কাঁঠফাটা এবং একজন উদ্যম**

**আমি কি হত্যাকারী**

মধুবালা, কাঠফাটা এবং  
একজন উদ্যম

আমি কি হত্যাকারী

শেখ আবদুল হাকিম

 *The Online Library of Bangla Books*  
**BanglaBook.org**



আকাশ

প্রকাশকাল  
একুশে বইমেলা ২০১৮  
প্রতিষ্ঠাতা প্রকাশক  
ডা. সাদত আলী সিকদার  
প্রকাশক  
আলমগীর সিকদার লোটন  
সুর জাহান পুনম  
প্রচ্ছদ : শিশির আলম



আফোশ  
সিকদার প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস্-এর  
একটি স্বজনশীল প্রকাশনা সংস্থা  
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০  
বিক্রয়কেন্দ্র  
৩৪ বাংলাবাজার (২য় তলা)  
ঢাকা-১১০০  
কম্পোজ : কম্পিউটার ল্যাভ  
৪৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০  
মুদ্রণ ও অফিস  
সিকদার প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস্  
৩/৬ জনসন রোড, ঢাকা-১১০০  
মূল্য : ২৫০ টাকা



প্রতি কপি বই বিক্রির টাকা থেকে আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার  
হাসপাতাল ৫ (পাঁচ) টাকা করে অনুদান পাবে।



The Ahsania Misson Cancer Hospital will get Tk. 5 (Five)  
as grant-in-aid against the sale of each copy of this book.

Sheakh Abdul Hakim

Published by Alamgir Sikder Loton and Sur Jahan Punam

Akash (A House of Literary Publications)

38 Banglabazar, Dhaka 1100

Phone : +8801711526970, 01676532850

e-mail : [info@akashbooks.com](mailto:info@akashbooks.com)

[www.akashbooks.com](http://www.akashbooks.com)

USA Distributor : Muktohdhara, Jackson Heights, New York

UK Distributor : Sangeeta Ltd. 22 Brick Lane, London

Price Taka 250 US\$ 10 only

ISBN 978-984-8057-24-7

## সূচি

মধুবালা, কাঠফাটা এবং একজন উদ্যম	৭
আমি কি হত্যাকারী	১৫৯





বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

---

নানারকম নতুন / পুরাতন  
বাংলা বই এর পিডিএফ  
ডাউনলোড করার জন্য  
আমাদের ওয়েবসাইটে  
(**BANGLABOOK.ORG**)  
আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

---

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :



এক.

আমার ধারণা, আমার মতো একজন করে লোক দেশের সব জেলার কয়েদখানাতেই পাওয়া যাবে-আমি হলাম সেই লোক যে আপনাকে জিনিসটা এনে দেয়। হাতে বানানো এক প্যাকেট সিগারেট (গাঁজা ভরা বা না ভরা), যদি আপনার নেশা থাকে; চোন্দো শিকের ভেতর বসে খবর পেলেন ছেলে বা মেয়ে অনার্স পাস করেছে, শুনে ইচ্ছে হলো একটু উৎসব করবেন, হাজির বিরিয়ানি থেকে শুরু করে সাধন বাবাজির ঢোলাই মদ, সবই এই বান্দা যোগাড় করে দেবে। যৌক্তিকতার ভেতরে থেকে আপনি যা চাইবেন সবই পাবেন এখানে। তবে সব সময় পরিবেশটা এরকম ছিল না।

চট্টগ্রাম বিভাগের এই জেলখানায় আমি যখন এসেছি, ধরুন এটার নাম কাঠফাটা জেলখানা, তখন আমার বয়স ছিল বিশ। কিভাবে, কেন এখানে আমাকে আসতে হলো সেটা গোপন করে কোনো লাভ নেই। না, বিনা অপরাধে এখানে আমাকে নিয়ে আসা হয়েছে, ব্যাপারটা সেরকম নয়। অপরাধ একটা করেছি, সেটা ভুলে করে ফেলিনি বা দুর্ঘটনাও ছিল না। আমি আমার স্ত্রীর নামে বেশ মোটা অঙ্কের একটা বিমা করেছিলাম-সে আমার চেয়ে বছর তিনেকের বড় ছিল-তারপর আমাদের বিয়েতে তার বাবার দেয়া উপহার টয়োটা স্প্রিন্টারের ব্রেকে একটু কারিগরি ফলিয়েছি। যেরকম প্ল্যান করেছি সবকিছু ঠিক সেভাবে ঘটেছে, শুধু আমার প্ল্যানে ছিল না মাঝপথে থেমে আমাদের এক প্রতিবেশী তরুণী আর তার দুধের বাচ্চাকে গাড়িতে তুলে নেবে সে। প্রায় ফাঁকা পাহাড়ি এলাকা, ঢালু রাস্তা, গাড়ির গতি যখন বেড়ে গেছে আর ঠিক তখন যদি ব্রেক ফেল করে, বুঝে দেখুন কি অবস্থা হতে পারে আমার স্ত্রীর আর যেচে পড়ে লিফট দেয়া শিশুসহ প্রতিবেশীর। কজন পথিক পুলিশকে জানিয়েছিল গাড়ির গতি তখন চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশের কম ছিল না। ছুটে গিয়ে বারো চাকার একটা কাভার্ড ভ্যানে ধাক্কা খায় সেটা, সঙ্গে সঙ্গে পেট্রল ট্যাংক বিস্ফোরিত হয় এবং গাড়িতে আগুন ধরে যায়।

ধরা পড়ে যাব, এটাও আমার প্ল্যানে ছিল না, কিন্তু ধরা আমাকে পড়তে হলো। তিনটে প্রাণহানি ঘটায় বিচারক মহোদয় আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন, আমার উকিল আরও উঁচু আদালতে আপিল করে সেটাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে কমিয়ে আনেন।

আমার বয়স কম, দেখতে সুদর্শন। কি? তাহলে আমি নিজেকে এভাবে বরবাদ করলাম কেন? সংক্ষেপে এর উত্তর হলো, আমাকে ঘরজামাই থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল, এবং আমার সঙ্গে একটা নেড়ি কুত্তার চেয়েও খারাপ ব্যবহার করা হতো। ধীরে ধীরে ক্ষোভ জমছিল, সেটা এক সময় আমাকে দিয়ে ওই কাজটা করিয়ে নিয়েছে। সুযোগ পেলে ওই কাজ আবার আমি করব না-হয়তো।

যাই হোক, এখানে আমি আমার নিজের গল্প বলতে বসিনি। আমি যার কথা বলব তার নাম উদ্যম হাসান। তবে উদ্যমের কথা শুরু করার আগে নিজের সম্পর্কে দু'একটা কথা আপনাকে জানাতে চাই। বেশি সময় নেব না।

আগেই বলেছি, এই কাঠফাটা জেলখানায় আমি হলাম সেই লোক যে আপনার সব জিনিস এনে দিতে এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে গত প্রায় ত্রিশ বছর ধরে। শুধু মাদক আর নিষিদ্ধ জিনিস নয়, এখানে সাজা খাটতে আসা দুর্ভাগাদের জন্যে আরও হাজারটা আইটেম নিয়ে আসতে পারি আমি। এখানে এক লোক আছে, ছোট এক মেয়েকে ধর্ষণ করার দায়ে এবং আরও প্রায় ডজনখানেক মেয়ের গায়ে হাত দেয়ার অপরাধে শাস্তি ভোগ করছে; আমি তাকে বেগুনি রঙের বড় বড় তিন টুকরো বিদেশি মার্বেল যোগাড় করে দিই, এবং ওগুলো খোদাই করে ভারি সুন্দর তিনটে মূর্তি বানিয়ে দিয়েছে সে, ওগুলোর নাম দিয়েছে, তিন বয়সে যিশু। ওই ভাস্কর্য এখন এমন এক ব্যক্তির বৈঠকখানার শো-কেসে শোভা পাচ্ছে, যিনি এক সময় এই শহরের মেয়র ছিলেন।

আপনার হয়তো গলাকাটা ফাঁপড়ের নাম শুনেছেন। ওই যে বছর দশেক আগে মানি ব্যাঙ্কে ডাকাতির চেষ্টা করেছিল। পিস্তলের মুখে সবাইকে জিম্মি করতে পারলেও, শেষ পর্যন্ত ওখানে রক্তগঙ্গা বয়ে গিয়েছিল-ছ'জন মারা যায়, তাদের মধ্যে দুজন ছিল গ্যাঙের সদস্য, তিনজন জিম্মি, একজন তরুণ পুলিশ কর্মকর্তা, যিনি ভুল একটা সময়ে ব্যাঙ্কের ভেতর মাথা ঢুকিয়েছিলেন, এবং চোখে একটা বুলেট খান। গলাকাটা ফাঁপড় অনেক কাল আগের ফুটো পয়সা সংগ্রহ করার শখ বা বাতিক আছে। স্বভাবতই জেল কর্তৃপক্ষ তাকে ওগুলো নিয়ে আসতে দেবে না, তবে তার মা এবং এক মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে-মাধ্যম লোকটা লন্ড্রি কোম্পানির ট্রাক ড্রাইভার-আমি তাকে তার কালেকশন নিয়ে এসে

দিয়েছি। আমি তাকে বলেছি, ফাঁপড়, তুমি নিশ্চয়ই বন্ধ উন্মাদ, তা না হলে চোরভর্তি একটা পাথুরে সরাইখানায় কেউ তার শখের কালেকশন রাখতে চায় নাকি। আমার দিকে তাকাল সে, মিটি মিটি হাসল, তারপর বলল, কোথায় রাখতে হবে তার জানা আছে। ‘যথেষ্ট নিরাপদ জায়গায় রাখতে পারব জেনেই ওগুলো এখানে আনিয়েছি। এ নিয়ে তুমি দুশ্চিন্তা করো না।’ এবং সে সত্যি কথাই বলেছে। এই ঘটনার তিন বছর পর ব্রেন ক্যানসারে মারা গেছে ফাঁপড়, কিন্তু তার সেই ফুটো পয়সার কালেকশন আজ পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায়নি।

লোকজনকে ইদানিং আমি পয়লা বৈশাখে ইলিশ আর পান্তা খাওয়াই, বিজয় দিবসে সবগুলো ওয়ার্ডের জন্যে কয়েদিদের জন্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ভিডিও সংস্করণ যোগাড় করি। আমাদের এখানে অনেক ছাত্রও আছে, তাদেরকে আমার আইনের বই, ডাক্তারি বই আনিয়ে দিতে হয়। কৌতুকের বইয়ের খুব চাহিদা এখানে, তবে সবচেয়ে বেশি চাহিদা কামসূত্র বা ওধরনের বইয়ের। কিছু জিনিসের জন্যে আকাশ ছোঁয়া দাম হাঁকি আমি। তবে সব যে আমার পকেটে যায় তা নয়। আর, তা ছাড়া, এই কাজটা আমি শুধু টাকার জন্যে করি না। টাকা আমার কি কাজে লাগবে? আমি একটা মার্সিডিজ কিনতে পারব? কিংবা প্লেনের টিকিট কেটে ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে আমার যাওয়া হবে, ছুটি কাটাতে? একজন ভালো কসাই যে কারণে শুধু তাজা মাংস বিক্রি করে, আমিও সেই একই কারণে এই কাজটা করি; আমার একটা সুনাম আছে, আর আমি সেটা ধরে রাখতে চাই। আমি শুধু দুটো জিনিস এনে দিতে রাজি হই না—একটা কড়া মাদক, আরেকটা আগ্নেয়াস্ত্র। কেউ যদি নিজেকে বা আর কাউকে খুন করতে চায়, আমি তাকে সাহায্য করতে রাজি নই। খুন বিষয়ক প্রচুর জটিলতা এমনিতেই আমার মাথার ভেতরে ঘুণপোকার জন্ম দিচ্ছে।

তারপর একদিন উদ্যম হাসান আমার কাছে এল, এসে বলল চোরাচালানের মাধ্যমে আমি তার জন্যে জেলখানায় মধুবালাকে এনে দিতে পারব কিনা। আমি বললাম এটা কোনো সমস্যা নয়। সমস্যা হয়ওনি।

উদ্যম যে বছর এই জেলে এসেছে, তার পরের বছর আমার কাছে মধুবালার অর্ডার দিতে এল, যখন তার বয়স একত্রিশ। ছোটখাট, পরিচ্ছন্ন একজন মানুষ, মাথায় খুব মিহি চুল, হাতগুলো দেখতে খুব ছোট আর চতুর লাগে আমার। সোনালি ফ্রেমের চশমা পরে। তার নখ নিয়মিত কাটা হয়, নখের ভেতর কখনও কোনো ময়লা দেখা যায় না। বড় কোনো ব্যাঙ্কের ট্রাস্ট ডিপার্টমেন্টে ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করত। উদ্যমের জেলখানায় আসার কারণ হলো স্ত্রী আর তার প্রেমিককে খুন করেছে সে।

বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে এখানে যারা জেল খাটতে এসেছে, তাদের প্রায় প্রত্যেকে নিজেকে নিরীহ বলে মনে করে। তারা নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, বিনয়ে সারাক্ষণ নুয়ে থাকে। সবার মুখে এক কথা, বিচারক তাদেরকে ভুল বুঝেছেন, তাদের উকিল ছিল অযোগ্য, কিংবা পুলিশ ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে ফাঁসিয়েছে।

কাঠফাটায় কয়েক যুগ কাটাবার পর আমি দশজনেরও কম লোকের দেখা পেয়েছি যারা সত্যি সত্যি নিরীহ ছিল। তাদের একজন হলো উদ্যম হাসান, যদিও তার নির্দেশিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে কয়েক বছর সময় লেগেছে আমার। সুপ্রিম কোর্টে আমি যদি তার বিচারক হতাম, সন্দেহ নেই আমিও তার বিরুদ্ধে রায় দিতাম।

সত্যি খুব বিস্ময়কার কেস। সমস্ত উপকরণ সহ রসালো না বলে উপায় নেই। ব্রিটিশ সমাজের উঁচু স্তরের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এরকম সুন্দর এক মেয়ে (মৃত), খেলাধুলোর জগতে নাম করেছে এমন বিদেশি এক ব্যক্তি ( সেও মৃত), এবং তরুণ এক বড় ব্যবসায়ীকে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছিল। যত রকমের নোংরা কেলেকারী হতে পারে, খবরের কাগজগুলো উদ্যম হাসানের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন অকাতরে ছেপে গেছে। প্রসিকিউশনের সামনে ওটা ছিল ওপেন অ্যান্ড শাট কেস।

ঘটনা এভাবে ঘটেছে বলে সাজানো হয়েছিল: উদ্যমের বিদেশি স্ত্রী শার্লট প্রফেশন্যাল গলফ ইস্ট্রাঙ্কটর শ্রীলঙ্কার নাগরিক উত্তম সিংহরাজের কাছে চার মাস মেয়াদের চুক্তিতে গলফ খেলা শিখতে যাচ্ছিল। দু'মাস যেতে না যেতে উদ্যম জানতে পারল উত্তম আর শার্লট পরস্পরের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছে। হত্যাকাণ্ডের আগের দিন বিকেলে এই বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়েছে।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে উদ্যম জানিয়েছে, তার কাছে ধরা পড়ে যাওয়ায় শার্লট খুশি হয়েছে বলে স্বীকার করেছিল, বলেছিল লুকোচুরি খেলতে তার আর ভালো লাগছিল না, বরং খুব অশান্তি লাগছিল। শার্লট তাকে আরও বলেছে, সে ডিভোর্স চাওয়ার প্ল্যান করছে। উত্তমের উদ্যম বলেছে, ডিভোর্স দেয়ার আগে শার্লটকে নরকে পাঠাবে সে। স্বামীর মুখে এ-কথা শোনার পর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায় শার্লট, বলে যায় উত্তমের সঙ্গে রাত কাটানো গলফ কোর্স থেকে বেশি দূরে নয়, একটা ভাড়া করা বাংলোয় থাকতে উত্তম। পরদিন সকালে উত্তমের চাকরানি বিছানার ওপর দুজনকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। তাদের প্রত্যেককে চারটে করে গুলি করা হয়েছে।

শহরের অনুমোদিত আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রেতা সাক্ষি দিতে কাঠগড়ায় উঠে জানালেন, জোড়া খুনের মাত্র দুদিন আগে উদ্যম হাসানকে তিনি একটা সিন্ধু-শট .৩৮ পুলিশ স্পেশাল বিক্রি করেছেন, এবং তাঁর কাছে সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার লাইসেন্স ছিল। ধনী লোকদের ক্লাব ডিফারেন্ট-এর বারম্যান জানিয়েছে, হত্যাকাণ্ডের দিন সন্ধ্যে সাতটার দিকে বারে ঢোকে উদ্যম, বিশ মিনিট সময়-সীমার মধ্যে তিনটে নির্জলা হুইস্কি পান করে, তারপর চলে যাবার জন্যে টুল ছেড়ে দাঁড়ায়, এবং বারম্যানকে এই কথাগুলো বলে: ‘উত্তম সিংহরাজের বাড়িতে যাচ্ছি আমি; তুমি মিয়া, বারম্যান, বাকিটা পত্রিকা পড়ে জেনে নিয়ো।’

আরেক লোক, উত্তমের বাড়ি থেকে মাইলখানেক দূরে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সেলসম্যান, সাক্ষি দিতে কাঠগড়ায় উঠে আদালতকে জানিয়েছে, ঘটনার দিন রাত পৌনে ন’টার দিকে উদ্যম হাসান তাদের দোকানে এসেছিল, সেখান থেকে ক’টা বিয়ারের ক্যান, সিগারেট আর ছোট কয়েকটা তোয়ালে কিনেছিল। সরকারি ডাক্তার সাক্ষি দিয়েছেন শার্লট আর উত্তম রাত এগারোটা থেকে দুটোর মধ্যে খুন হয়েছেন। পুলিশের একজন ডিটেকটিভ, যিনি এই কেস তদন্ত করার দায়িত্বে ছিলেন, সাক্ষি দিতে উঠে আদালতকে বলেছেন, ওই বাংলা থেকে সত্তর গজেরও কম দূরত্বে একটা অস্থায়ী পার্কিং লট আছে, এবং ঘটনার পরদিন বিকেলে ওখান থেকে তিন প্রস্থ এভিডেন্স সংগ্রহ করেছে পুলিশ; সেগুলো হলো: এক, বিয়ারের দুটো খালি বোতল (তাতে আসামীর আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে); দুই, সিগারেটের বারোটা অবশিষ্টাংশ (আসামী এই ব্র্যান্ডের সিগারেটই খান); তিন, গাড়ির চাকার দাগ (এই দাগ আসামীর গাড়ির চাকার সঙ্গে হুবহু মেলে)।

উত্তমের বাংলোর বসার ঘরে, সোফার ওপর তিনটে ছোট তোয়ালে পাওয়া গেছে, ওগুলোয় বুলেটের তৈরি ফুটো আর গান পাউডার ছিল। এসব দেখে ডিটেকটিভ ভদ্রলোক এই থিওরি দেন (উদ্যম হাসানের উকিলের প্রবল প্রতিবাদ কানে না তুলে) যে গুলির শব্দ চাপা দেয়ার জন্যে খুনি মার্ভার উইপনের মাজলে ওই তোয়ালে পেঁচিয়ে রেখেছিল।

নিজেই নিজের পক্ষে বক্তব্য রাখার জন্যে কাঠগড়ায় উঠেছিল উদ্যম হাসান। সম্পূর্ণ শান্ত আর ঠাণ্ডা দেখা গেছে তাকে, আরেগনসিস নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলে গেছে নিজের গল্প। বলল, সে তার স্ত্রী সম্পর্কে প্রচুর অশান্তি সৃষ্টি করে এমন সব গুজব শুনতে পাচ্ছিল জুলাই মাসের শেষ দিক থেকে। আগস্ট মাসে পরিস্থিতি সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে খোঁজ নিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেয়। এক বিকেলে টেনিস ট্রেনিং শেষ করে শপিং করতে যাবার কথা ছিল শার্লটের। উদ্যম

চুপিচুপি তার পিছু নেয়। ট্রেনিং শেষ করে বাইরে বেরিয়ে আসে শার্লট, ওখান থেকে তাকে নিজের গাড়িতে তুলে নেন উত্তম সিংহরাজ, শার্লটকে নিয়ে নিজের বাংলায় পৌঁছান। ওই বাংলায় ওরা দুজন প্রায় আড়াই ঘণ্টা ছিলেন, তারপর শার্লটকে আবার টেনিস কোর্টের কাছে পৌঁছে দেন উত্তম, যেখানে পার্ক করা ছিল শার্লটের গাড়ি।

প্রতিপক্ষের উকিল প্রশ্ন করেছেন, ‘আপনার ঝকঝকে নতুন গাড়ি পিছু নিল, অথচ আপনার স্ত্রী শার্লট সেটা চিনতে পারলেন না?’

‘সেদিন আমি আমার এক বন্ধুর গাড়ির সঙ্গে নিজের গাড়ি বদল করেছিলাম,’ উত্তর দিয়েছে উদ্যম। তার এই ঠাণ্ডা স্বীকারোক্তি থেকে বেরিয়ে আসে স্ত্রীর বিরুদ্ধে তার তদন্ত কতটা সুপরিকল্পিত ছিল, বিচারকের দৃষ্টিতে পুরো ব্যাপারটা তার অনুকূলে যায়নি।

বন্ধুর সঙ্গে আবার গাড়ি বদল করার পর বাড়ি ফেরে উদ্যম। বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিল শার্লট। স্ত্রীকে সে জিজ্ঞেস করল, শপিং কেমন হলো? উত্তরে শার্লট বলল, বেড়ানো হয়েছে, শপিং হয়নি—এমন কিছু পছন্দ হয়নি যেটা কেনা যায়। ‘তখনই আমি নিশ্চিত হই,’ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষায় থাকা আদালত ভর্তি লোকজনকে বলেছে উদ্যম, সেই আগের মতোই শান্ত আর ঠাণ্ডা সুরে।

‘সেদিন থেকে ধরলে সতের দিন পর আপনার স্ত্রী খুন হন, এই সতের দিন আপনার মনের অবস্থা কি ছিল, একটু যদি ব্যাখ্যা করেন,’ উদ্যমের উকিল অনুরোধ করেছেন।

‘আমি খুব মানসিক কষ্টে ছিলাম,’ উত্তর দিয়েছে উদ্যম, আগের মতোই নির্লিপ্ত আর ঠাণ্ডা গলায়, সে যেন একটা ফর্দ পড়ছে, এমনকি সেপ্টেম্বর মাসে চার তারিখে আগ্নেয়াস্ত্র কেনার প্রসঙ্গটাও বাদ দিল না।

এরপর তার উকিল অনুরোধ করল, সেদিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হবার পর শার্লট যখন উত্তমের বাড়িতে রাত কাটাতে বলে চলে গেল, তারপর কি ঘটেছে দয়া করে জানান। জানাল উদ্যম, কিন্তু তাতে পরিস্থিতি তার অনুকূলে গেল না।

আমি তাকে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে চিনি, এবং আপনাকে খুব জোর দিয়ে বলতে পারি উদ্যমের মতো আত্মবিশ্বাসী মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। কোনো ব্যাপার তার জন্যে যদি ঠিক থাকে, প্রতিবার আপনাকে স্ত্রী একটু করে দেবে সে। আর তার জন্যে যেটা ঠিক নয়, নিজেকে বোঝার ভেতর ভরে ছিপি লাগিয়ে রাখবে। তার আত্মা যদি কখনও অন্ধকারে পতিত দেখে থাকে, আপনি তা জানতে পারবেন না। সে ওই জাতের একজন মানুষ, যদি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত

নেয় তাহলে কোনো চিরকুট না রেখে মারা যাবে, তবে নিজের যে-সব কাজ তখন করার কথা ছিল সেগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না করে মরবে না। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সে যদি কাঁদত, কিংবা কথা বলার সময় আবেগে যদি তার গলা ধরে আসত, আদালত তাকে ওরকম চরম সাজা দিত বলে আমি মনে করি না। কিন্তু সে তার গল্প একটা রেকর্ডিং মেশিনের মতো করে বলে গেছে, ভাবটা যেন অনেকটা এরকম, এই হলো ঘটনা, তোমরা মানলে মানো, না মানলে না মানো, আমার তাতে কিচ্ছু আসে যায় না। বিচারক মানেননি।

উদ্যম বলেছে ওই রাতে নেশা করেছিল সে। আপনারাই বলুন, আমাদের দেশের আদালতে দাঁড়িয়ে এ-কথা কেউ বলে? বলেছে, ২৪ আগস্ট থেকেই নেশা করছিল। বলেছে, সে এমন একজন মানুষ, যার পক্ষে অ্যালকোহল ঠিকমতো সামলানো সম্ভব নয়।

অথচ উদ্যম হাসানকে আমি যতদিন ধরে চিনি, বছরে শ্রেফ তিনবার হুইস্কি খেতে দেখেছি তাকে। প্রতি বছর তার জন্মদিনের পাঁচ-সাতদিন আগে খোলা উঠানে, যেখানে আমরা শরীরচর্চা করি, আমার সঙ্গে দেখা করবে সে, আর দেখা করবে পয়লা বৈশাখ আর বড়দিনের কদিন আগে। প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশি হোক বিদেশি হোক একটা করে বোতল ম্যানেজ করা চাই তার। ওগুলো কয়েদিরা যে শর্তে বিক্রি করে তাকে তাতেই রাজি হয়ে কিনতে হয়। জেলখানার ভেতর এসব জিনিস পাওয়া যায়, তবে দাম পড়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশ-পঁচিশ গুণ বা তারও বেশি। হুইস্কি বাবদ উদ্যম হাসানকে যে অবিশ্বাস্য অঙ্কের টাকা খরচ করতে হয়, সেটা আসে কোথেকে? আসে জেলখানার লব্ধিতে ঘাম ঝরিয়ে।

জন্মদিনের সকালে, ২০ সেপ্টেম্বর, বেশ খানিকটা খাবে সে, দ্বিতীয়বার খাবে রাতে আলো নেভার আগে, পরদিন সকালে বোতলটা আমার হাতে ধরিয়ে দেবে, আমি সেটা আশপাশে যারা থাকে তাদের সঙ্গে শেয়ার করব। বাকি দুই বোতলও শেষ পর্যন্ত চলে আসে আমার হাতে, আশপাশে যারা থাকে তাদের সঙ্গে শেয়ার করার নির্দেশসহ। বছরে তিনটে বোতল লাগে তার-অথচ পুলিশ তাদের রিপোর্টে এই লোক সম্পর্কে লিখেছিল-বোতলের মার খাওয়া মোক।

এত জোরে যাতে রক্ত বেরিয়ে আসে।

আদালতকে উদ্যম বলেছিল দশ তারিখে, শার্লটের সঙ্গে দেখা করার আগে, এত বেশি মদ খেয়েছিল যে কি ঘটেছে না ঘটেছে তার কিছু বিচ্ছিন্ন কিছু টুকরো মনে করতে পারে সে।

ইন্সট্রাক্টর উত্তমের কাছে যাবার জন্যে শার্লট যখন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল, উদ্যমের মনে আছে ওঁদের মুখোমুখি হাবার সিদ্ধান্ত নেয় সে। উত্তমের বাংলোর



দিকে যাবার পথে গাড়ি ঘুরিয়ে ডিফারেন্ট ক্লাবে যায় খানিকটা ছইস্কি খেয়ে গা গরম করার জন্যে। ‘উত্তম সিংহরাজের বাড়িতে যাচ্ছি আমি; তুমি মিয়া বাকিটা পত্রিকা পড়ে জেনে নিয়ো’ ওখানকার বারম্যানকে এ-কথা বলেছে কিনা মনে নেই তার। একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে বিয়ার কেনার কথা মনে আছে, তবে ছোট তোয়ালে কেনার কথা মনে নেই। ‘ছোট তোয়ালে আমার কি কাজে লাগবে?’ প্রশ্ন করেছে সে।

পরে উদ্যম আমাকে বলেছে, ‘দোকানের ওই সেলসম্যানকে পুলিশ কিভাবে প্রশ্ন করেছে কে জানে। ঘটনার পর তিন দিন পার হয়ে গিয়েছিল, পুলিশ আমাকে ছাড়া সন্দেহ করার মতো আর কাউকে পাচ্ছিল না। তাদের বিশ্বাস, আমিই খুন দুটো করেছি, আর তাই তাদের প্রশ্নও ছিল বেশ ঘোরানো। যেমন, ধরো, পাঁচ-সাতজন পুলিশ দোকানে ঢুকে সেলসম্যানকে ঘিরে ফেলল, জিজ্ঞেস করল, “এটা কি সম্ভব নয় যে এখান থেকে খুনি লোকটা বেশ কটা তোয়ালেও কিনেছে?” ঘাবড়ে গিয়ে সেলসম্যান মাথা ঝাঁকাতে পারে। ওখান থেকে বাকিটা তারা তৈরি করে নিয়েছে। যথেষ্ট লোকজন যদি তোমাকে দিয়ে কিছু স্মরণ করাতে চায়, সেটাকে এড়িয়ে যাওয়া খুব কঠিন।’

আমি তার সঙ্গে একমত।

‘এর মধ্যে আরও জোরালো কারণ আছে। ওই লোক নিজেকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করে থাকতে পারে যে সে আমার কাছে কয়েকটা তোয়ালে বিক্রি করেছে। কারণটা হলো লাইমলাইট। দিন নেই রাত নেই সারাক্ষণ রিপোর্টাররা তার সঙ্গে কথা বলতে আসছে, পত্রিকায় তার ফটো ছাপা হচ্ছে।

‘কি জানো, সদয়, আমার নিজের উকিলই আমার সব কথা বিশ্বাস করেননি। তাঁর ধারণা ছিল আমার গল্পের অর্ধেকটা মিথ্যে। ওই তোয়ালে প্রসঙ্গ আদালতে তিনি তোলেনইনি। এটা শ্রেফ তাঁর পাগলামি না? আমি মাতাল হয়ে পড়েছিলাম, এতটাই মাতাল যে গুলির আওয়াজ ভোঁতা করার জন্যে তোয়ালে ব্যবহারের কথা আমার মনেই পড়বে না। কাজটা যদি সত্যি আমি করতাম, শ্রেফ ছিঁড়ে ফেলতাম ওদের।’

পার্কিং লটে গিয়ে গাড়ি রাখল সে। ওখানে বসে বিয়ার আর সিগারেট খেলো। ট্রেনার উত্তমের বাড়ির আলো নিভে যেতে দেখল, শুধু দোতলার একটা আলো জ্বলছিল। পনেরো মিনিট পর সেটাও নিভে গেল। উদ্যম বলছে, বাকিটা সে আন্দাজ করতে পারে।

‘জনাব হাসান, আপনি কি তারপর ট্রেনার সিংহরাজের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের দুজনকে খুন করেছেন?’ চড়া গলায় জানতে চেয়েছেন তার নিজের উকিল।

‘না, আমি কাউকে খুন করিনি,’ জবাব দিয়েছে উদ্যম। মাঝরাতে দিকে, বলল সে, তার নেশা কেটে যায়। তবে খুব বাজে ধরনের একটা হ্যাংগওভার ঝামেলা পাকাতে আসছে, বুঝতে পারে সে। সিদ্ধান্ত নিল বাড়ি ফিরে ঘুমাবে, পরদিন একজন পরিণত মানুষের মতো চিন্তা করে বের করবে সমস্যাটা নিয়ে কি করা যায়। ‘গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় আমার মনে হলো, এর সহজ এবং সুষ্ঠু সমাধান সম্ভবত শার্লটকে ডিভোর্স দেয়া।’

‘ধন্যবাদ, জনাব হাসান।’

‘দ্রুততম পদ্ধতিতে ডিভোর্স দিয়ে ফেললেন, তাই না?’ প্রতিপক্ষের উকিল গর্জে উঠলেন। আপনি তাঁকে তোয়ালে জড়ানো .৩৮ রিভলভার দিয়ে ডিভোর্স দিলেন, তাই তো?’

‘না, স্যার, তা আমি দিইনি,’ শান্তসুরে উত্তর দিল উদ্যম।

‘এবং তারপর আপনি তাঁর প্রেমিককে গুলি করলেন।’

‘না, স্যার।’

‘তারমানে বলতে চাইছেন প্রথমে আপনি মিস্টার সিংহরাজকে গুলি করেছেন?’

‘বলতে চাইছি আমি ওদের কাউকে গুলি করিনি।’

‘আপনি এই আদালতকে বলেছেন ২৪ আগস্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আপনার ভেতর আত্মহত্যা করার প্রবণতা ছিল।’

‘জি, স্যার।’

‘আত্মহত্যার প্রবণতা এত বেশি হয়ে উঠল যে একটা পিস্তল কিনে ফেললেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনাকে আমার সুইসাইডাল বলে মনে হয় না, আমি এ-কথা বললে আপনি কি খুব বেশি অস্বস্তি বোধ করবেন?’

‘না, তবে অন্যের অনুভূতি বা ভালো থাকা নিয়ে আপনি খুব বেশি সচেতন, এটা আমাকে বিশ্বাস করাতে পারছেন না। ভবিষ্যতে আমার মধ্যে যদি আবার সুইসাইড করার প্রবণতা দেখা দেয়, সমস্যাটা নিয়ে আমি আপনার কাছে যাব কিনা সন্দেহ আছে আমার।’

আদালতে সামান্য উত্তেজনা ছড়াল। অন্তত কিছু লোককে মনে হলো তারা উদ্যমের জবাব পছন্দ করেছে।

‘১০ সেপ্টেম্বর রাতে আপনি কি ওই রিভলভার সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে ছিলেন?’

‘না, এটা আমি আগেই জানিয়েছি।’

‘ও, হ্যাঁ!’ প্রতিপক্ষের উকিল বিদ্রূপাত্মক হাসি হাসছেন। ‘ওটা আপনি ছুঁড়ে নদীতে ফেলে দিয়েছেন, তাই না? ৯ সেপ্টেম্বর বিকেলে।’

‘জি, স্যার।’

‘খুন হবার একদিন আগে।’

‘জি, স্যার।’

‘তাতে খুব সুবিধে হয়, তাই না?’

‘এতে সুবিধে হবার কিছু নেই, আবার অসুবিধে হবারও কিছু নেই। এটা একটা ফ্যাক্ট, অর্থাৎ শুধু সত্য।’

‘নদীতে তল্লাশি চালানো হয়েছে। কিছু পাওয়া যায়নি। কিছু মানে আপনার রিভলভার।’

‘হ্যাঁ, আমি শুনেছি রিভলভারটা পাওয়া যায়নি।’

‘আপনার জন্যে এটাও বেশ সুবিধেজনক, তাই না?’

‘সুবিধে কিনা, সে প্রশ্ন একপাশে সরিয়ে রাখুন, এটা একটা ফ্যাক্ট যে অস্ত্রটা পাওয়া যায়নি। ওই নদীতে প্রচণ্ড শ্রোত, আর সাগর ওখান থেকে বেশি দূরে নয়। কাজেই নদী থেকে ভেসে ওটা সাগরে গিয়ে পড়তে পারে।’

‘কাজেই যে বুলেটগুলো আপনার স্ত্রী আর তার প্রেমিকের শরীর থেকে পাওয়া গেছে, পরীক্ষা করে বোঝার উপায় নেই যে ওগুলো আপনার রিভলভার থেকে বেরিয়েছে কিনা?’

‘না।’

‘এটাও আপনার জন্যে বেশ সুবিধে বয়ে আনছে, তাই না?’

ছ’সপ্তা ধরে চলা শুনানিতে এই প্রথম উদ্যমের মধ্যে খানিকটা ভাবাবেগের প্রকাশ ঘটতে দেখা গেল, এক চিলতে তিজ্জ হাসি ফুটল তার মুখে। ‘আমি যেহেতু এই জোড়া খুন করিনি, স্যার, এবং আমি যেহেতু অস্ত্রটা নদীতে ছুঁড়ে ফেলার ব্যাপারে সত্যি কথা বলছি, কাজেই অস্ত্রটা না পাওয়াটা আমার কাছে অসুবিধেজনক বলে মনে হচ্ছে।’

সরকারি উকিল টানা দুদিন জেরা করার নামে হাতুড়ির বাঁড়ি মারতে থাকলেন। আপনি তোয়ালে কিনলেন কি মনে করে? কই, কিনেছি বলে আমার মনে পড়ে না। বছর দুয়েক আগে আপনি এবং আপনার স্ত্রী একটা যৌথ বিমা করেন, সত্যি? হ্যাঁ, সত্যি। এই মামলা থেকে আপনি যদি বেকসুর খালাস পান, এটা কি সত্যি আপনি তাহলে ওই বিমা বাবদ বিশ লাখ টাকা পাবেন? সত্যি। এটাও কি সত্যি নয় যে আপনি বুকে খুন করার ইচ্ছে নিয়ে ট্রেনার সিংহরাজের

বাড়িতে গিয়েছিলেন, এবং এও কি সত্যি নয় যে তাঁকে এবং নিজের স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করতে সফল হন আপনি? না, সত্যি নয়। তাহলে আপনিই ব্যাখ্যা করুন, এই ঘটনা কিভাবে ঘটল, কে ঘটাল, যেখানে ডাকাতির কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না?’

‘সেটা জানার আমার তো কোনো উপায় নেই, স্যার,’ বলল উদ্যম।

এক সপ্তা পর রায় হয়ে গেল, ‘যাও, সারাজীবন জেলখানায় পচো।’

দুই.

সরকারি উকিল জানতে চেয়েছিলেন, তাহলে এই জোড়া খুন করল কে? সেটা এড়িয়ে গেছে উদ্যম, উত্তর দেয়নি। তবে তার একটা আইডিয়া আছে কাজটা কে করতে পারে। সে জেলখানায় আসার সাত বছর পর এক রাতে সেটা আমি তার ভেতর থেকে বের করে আনি। এই সাত বছর আমাদের কেটেছে চোখাচোখি হতে মাথা ঝাঁকিয়ে, কখনও বা ক্ষীণ হাসি বিনিময় করে। ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছি আমরা। তবে আরও পাঁচ বছর না কাটতে তাকে আমি খুব কাছের একজন মানুষ বলে অনুভব করতাম না। এবং আমার বিশ্বাস, আমি যতটা তার কাছে পৌঁছাতে পেরেছি, আর কারও পক্ষে সেটা সম্ভব হয়নি। দুজনেই লম্বা মেয়াদে সাজা খাটিছি, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই সেলব্লকে থাকছিও, যদিও করিডরে তার কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে থাকি আমি।

‘আমি কি মনে করি?’ হেসে ফেলল উদ্যম, তবে আওয়াজটা একদম নীরস লাগল কানে। ‘আমার ধারণা ওই রাতে চারদিকে প্রচুর দুর্ভাগ্য ভেসে বেড়াচ্ছিল। ওই অল্প সময়ের একটা বিস্মৃতিতে আর কখনও এত বেশি এক জায়গায় জড়ো হতে পারবে না। আমার ধারণা নিশ্চয়ই কোনো অচেনা লোক হবে, আমরা যাকে আগন্তুক বলি, শ্রেফ এদিক দিয়ে যাচ্ছিল। হতে পারে এমন কেউ একজন ওদিকের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ যার চাকার ঝাঁকাস বেরিয়ে গিয়েছিল, আমি বাড়ি ফিরে যাবার পর। হতে পারে একটা চোর। একজন সাইকোপ্যাথও হতে পারে। সে ওদেরকে খুন করেছে, ব্যস। আর আমি এখানে।’

কিছু একটা চাওয়ার জন্যে প্রথমবার যখন উদ্যম আমার সঙ্গে যোগাযোগ করল, সেদিনটার কথা আজও আমার মনে আছে, যেন গতকালের ঘটনা। যদিও

সেবার মধুবালাকে চায়নি সে, সেটা আরও পরের ঘটনা। প্রথমবার এসেছিল অন্য একটা জিনিস চাইতে।

আমার বেশিরভাগ লেনদেন হতো যেখানে আমরা শরীরচর্চা করতাম সেই খোলা উঠানে। আমাদের ওই উঠান বেশ বড়। নিখুঁত চৌকো আকৃতি, প্রতিটি দিক নব্বুই গজ করে। উত্তর দিকে বাইরের পাঁচিল, দু'মাথায় একটা করে গার্ডটাওয়ার। ওখানে যে গার্ডরা ডিউটি দেয় তাদের কাছে বিনকিউলার আর রায়ট গান থাকে। মেইন গেটটাও ওই উত্তর দিকে। মাল ওঠা-নামা করানোর জন্যে উঠানের দক্ষিণ দিকে পাঁচটা জায়গা আলাদা করা আছে, আমরা ওগুলোকে লোডিং বে বলি। সপ্তা জুড়ে কাজের দিনগুলোয় খুব ব্যস্ত থাকে কাঠফাটা-হরদম ডেলিভারি দিচ্ছি, হরদম ডেলিভারি নিচ্ছি। আমাদের আছে সরকারি সাইনবোর্ড তৈরির ফ্যাক্টরি আর বিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল লন্ড্রি। যেখানে যত জেলখানা আছে, সবগুলোর কাপড়চোপড়ও আমরা ধুই। আমরা একটা হাসপাতালও চালাই, শুধু কয়েদিদের চিকিৎসা করা হয়। এমনকি ছোটখাট একটা মেন্টাল ক্লিনিকও আছে আমাদের। আমরা যারা এখানে জেল খাটতে আসি তারা যদি পাগল না হয় তাহলে আর কাকে আপনি পাগল বলবেন বলুন? আমাদের এখানে বড় একটা গাড়ি মেরামতের কারখানা আছে, কয়েদিরাই মেকানিক, বেশিরভাগ সরকারি গাড়ি সারানো হয়।

পূর্বদিকে খুব পুরা পাথরের পাঁচিল, তার গায়ে সরু সরু অনেক জানালা বসানো। সেলব্লক পাঁচ ওই পাঁচিলের উল্টোদিকে। পশ্চিমে প্রশাসনিক ভবন আর হাসপাতাল। বাকি সব জেলখানার মতো কাঠফাটায় কখনও উপচে পড়া কয়েদি দেখা যায় না, আমি কখনও দুই তৃতীয়াংশের বেশি ভরতে দেখিনি। উঠানে সাধারণত আশি কি একশ বিশজন কয়েদিকে একসঙ্গে দেখা যায়। তারা ফুটবল কিংবা হাডুডু খেলে, মারপিট করে, আবার পুরনো বিবাদ মিটিয়ে কোলাকুলিও করে। ভিড় বেড়ে যায় শুক্রবারে। তবে সেটা জুম্মার পর।

এরকম এক শুক্রবারেই আমার কাছে প্রথমবার এসেছিল উদ্যম হাসান। আমি তখন খাল্লা মুস্তাকের সঙ্গে একটা রেডিও নিয়ে আলাপ করছিলাম, লোকটা আমার অনেক কাজে লাগে, এই সময় উদ্যম হাসানকে আমার দিকে হেঁটে আসতে দেখলাম। অবশ্যই আমার জানা ছিল কে সে; নাকটু, দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না, ঠাণ্ডা বরফ, ততদিনে এরকম সব সুখ্যাতি অর্জন করে ফেলেছে। লোকজন বলাবলি করছিল ইতিমধ্যেই তাকে বিপদে ফেলার জন্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরকম কথা যারা বলছে তাদের একজন বোগাস হীরা, আপনার কেসে নাক গলালে খুব খারাপ লোক। উদ্যমের কোনো সেলমেট নেই, এবং আমি

শুনেছি কেউ না থাকাটাই তার পছন্দ, যদিও মাত্র একজনের থাকার উপযোগী সেল খাটের চেয়ে একটু হয়তো বড় হতে পারে, যে খাটে শুইয়ে আমাদেরকে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে আমি একজন মানুষ সম্পর্কে কোনো গুজবে কেন কান দিতে যাব, যেখানে আমি নিজেই তার ব্যাপারটা যাচাই করতে পারি।

‘হ্যালো,’ বলল সে। ‘আমি উদ্যম হাসান।’ হাত বাড়াল, ধরে একটু ঝাঁকি দিলাম। সামাজিকতা রক্ষা করতে গিয়ে সময় নষ্ট করবে, এমন লোক নয় সে। ‘যতটুকু বুঝেছি, তুমি জানো কিভাবে জিনিস-পত্র যোগাড় করতে হয়।’

স্বীকার করলাম মাঝেমধ্যে এটা-সেটা যোগাড় করতে পারি আর কি।

‘কাজটা কিভাবে তুমি করো?’ উদ্যম জিজ্ঞেস করল।

‘কখনও দেখা যায় জিনিস-পত্র শ্রেফ আমার দিকে চলে আসছে,’ বললাম আমি। এটা আমার পক্ষে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়—আমি রয়্যাল ডিস্ট্রিক্টের লোক, এটা যদি কিছু না বোঝায় আর কি।’

আমার কথা শুনে একটু হাসল সে। ‘ভাবছি তুমি আমাকে একটা পাখুরে হাতুড়ি এনে দিতে পারবে কিনা।’

‘পাখুরে হাতুড়ি কি জিনিস? আর সেটা তোমার দরকারই বা হলো কেন?’

উদ্যমকে বিস্মিত দেখাল। ‘একটা জিনিস কেন দরকার হবে, সেটা জানাও তোমার ব্যবসার একটা বৈশিষ্ট্য নাকি?’

তার প্রশ্নের ধরন দেখেই বুঝতে পারলাম কেন মানুষ তাকে দেমাকি মনে করছে। ‘শোনো তাহলে,’ বললাম তাকে। ‘তুমি যদি একটা টুথব্রাশ চাও আমি কিছু জিজ্ঞেস করব না। আমি শুধু দামটা জানাব তোমাকে। কারণ, তুমি জানো, টুথব্রাশ মারাত্মক অস্ত্রের মধ্যে পড়ে না।’

‘মারাত্মক অস্ত্র সম্পর্কে তোমার মনোভাব খুব কঠোর মনে হচ্ছে?’

‘হ্যাঁ, খুব।’

আমাদের দিকে একটা ফুটবল ছুটে এল, ঘুরল উদ্যম, বিড়ালের ক্ষিপ্ততা নিয়ে চার কি পাঁচ পা এগোল, তারপর শূন্য থাকতেই লাথি মারল বলটা যেন তার লাথি খেতেই অনেকটা আকাশপথ পার হয়ে ছুটে এসেছে। খুব যে জোরে মারল উদ্যম, তা নয়, অথচ বল অনেক ওপরে উঠে গেল, যতটা উঁচু পথ ধরে এসেছিল ঠিক তত উঁচুতে, তারপর ফিরে গেল ঠিক যেখান থেকে এসেছিল। উদ্যমের ছুটে যাওয়া, অনায়াস ভঙ্গিতে বল কিক করা, উপস্থিত সবাই চাক্ষুষ করল, এবং আমার মতো উঠানে উপস্থিত বাকি সবাইও তাজ্জব না হয়ে পারল না। তার প্রমাণ, লক্ষ্য করলাম, যারা ওখানে ফুটবল খেলছিল তারা

সবাই একটা চোখ রেখেছে উদ্যমের ওপর। এমনকি টাওয়ারের গার্ডরাও বার বার আমাদের দিকে তাকাচ্ছে।

সব জেলেই কিছু পুরনো কয়েদি থাকে যারা পুলিশকে ভয় পায় না, বরং পুলিশই তাদের ভয় পায়; তাদের গুগুমি-মাস্তানির কারণে সাধারণ কয়েদিরা কেঁচোর জীবন নিয়ে বেঁচে থাকে। আবার কিছু কয়েদি আছে যারা গুগুমি-মাস্তানি না করা সত্ত্বেও যথেষ্ট ওজনদার। আমি সেরকম একজন। কাজেই উদ্যম হাসান সম্পর্কে আমি কি ভাবি তার ওপর অনেকটাই নির্ভর করবে এখানে তার সময়টা কিভাবে কাটবে। কথাটা সম্ভবত তারও জানা আছে। অথচ তারপরও তার মধ্যে আমি দৃঢ়তার কোনো অভাব দেখলাম না, দেখলাম না হাত কচলাতে; এর জন্যে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা এসে গেল।

‘ঠিক আছে, বুঝেছি। জিনিসটা কি বলছি, কেন দরকার তাও বলছি। রক’ হামার দেখতে পিকএক্স-এর মতো, যেটা দিয়ে পাথর ভাঙা হয়-এরকম লম্বা।’ হাত দিয়ে মাপ দেখাল, এক ফুট হবে। তখনই আমি খেয়াল করলাম তার নখ কি রকম পরিষ্কার। ‘ওটার এক ধার ধারাল; আরেক দিক ভোঁতা, হাতুড়ির মাথা। আমার ওটা দরকার, কারণ আমি পাথর ভালোবাসি।’

‘পাথর,’ বললাম আমি।’

‘হাঁটু ভাঁজ করে এখানে একটু বসো,’ বলল সে।

আমি তার সম্মান রাখলাম। হাঁটু ভাঁজ করে, পায়ের ওপর ভর দিয়ে বসলাম আমরা। উঠান থেকে এক মুঠো ধুলো তুলল উদ্যম, এক হাত থেকে আরেক হাতে চালান করার সময় মিহি মেঘ তৈরি হতে দেখছি, উড়ে যাচ্ছে বাতাসে, তার হাতে রয়ে যাচ্ছে শুধু কিছু খুদে নুড়ি, তার মধ্যে দু’একটা একটু বেশি উজ্জ্বল, আলো লাগলে চকচক করছে, বাকিগুলো স্লান আর সাধারণ। ভোঁতাগুলোর একটা কোয়ার্টজ বা সিলিকন ডাইওক্সাইড, তবে আপনি ঘষে পরিষ্কার না করা পর্যন্ত ওটা স্লানই থাকবে। ঘষলে ভারি সুন্দর দুধের মতো সাদা আভা ছড়ায়। পরিষ্কার করে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল উদ্যম। ধরে আমি ওটার নাম বললাম।

‘হ্যাঁ, কোয়ার্টজ,’ বলল সে। ‘কিন্তু দেখো। মাইকা, শেল, সিলিটেড গ্র্যানিট। এখানে এক টুকরো গ্রেডেড লাইমস্টোন-এটা এসেছে কিভাবে? আসেনি, ছিল, পাহাড়ের গা কেটে এই জায়গাটা যখন বের করা হয়।’ সব ফেলে দিয়ে হাত ঝাড়ল সে। ‘আমাকে তুমি পাথরপাগল বলতে পারো। অন্তত... পাথরপাগল ছিলাম আমি। আমার পুরনো জীবনে। আবার ওরকম হতে চাই আমি, সীমিত পরিসরে।’

‘শরীরচর্চার মাঠে জুম্মাবাদ বিজ্ঞান বিষয়ক অভিযান?’ দাঁড়ানোর সময় জিজ্ঞেস করলাম।

‘নেই আমার চেয়ে কানা মামা ভালো,’ সংক্ষেপে জবাব দিল সে।

‘ওই রক হ্যামার দিয়ে তুমি খুব সহজেই কারও মাথা ফাটাতে পারো,’ মন্তব্য করলাম আমি।

‘এখানে আমার কোনো শত্রু নেই,’ বলল সে।

‘নেই?’ আমি হাসলাম। ‘একটু অপেক্ষা করো।’

‘যদি কোনো সংকট তৈরি হয়, রক হ্যামার ছাড়াই সেটা আমি সামলাতে পারব।’

‘কি করে বুঝব তুমি এখান থেকে পালানোর ফন্দি আঁটছ না? পাঁচিলের তলা দিয়ে নাকি? তা যদি পালাও...’

ভব্যতা দেখিয়ে সামান্য একটু হাসল সে। তিন সপ্তা পর আমি যখন ওর হ্যামারটা দেখলাম, তার ওই হাসির অর্থ বুঝতে পারলাম।

‘কি জানো,’ তাকে আমি বললাম, ‘ওটা তোমার কাছে কেউ দেখলে ঠিক নিয়ে যাবে। কেউ যদি তোমার কাছে একটা চামচ দেখে, ওরা নিয়ে যাবে সেটা। তুমি ঠিক কি করতে চাইছ বলো তো? উঠানে বসে কুচি করবে পাথর?’

‘কুচি কেন, তারচেয়ে অনেক ভালো কিছু করতে পারি আমি।’

মাথা ঝাঁকালাম। ওই অংশটা আমার কোনো বিষয় নয়।

‘এরকম একটা জিনিসের কি রকম দাম হতে পারে?’ জানতে চাইলাম আমি।

‘হার্ডঅয়্যারের দোকানে যদি পাওয়া যায়, হাজার টাকা দাম চাইবে। পাথর আর টাইলস বিক্রি হয় যেখানে সেখানে সাতশ টাকায় কেনা যেতে পারে। তবে এখানে তুমি আরও বেশি চাইবে, জানা কথা...’

‘দামের ওপর দশ পার্সেন্ট ধরি আমি। তবে বিপজ্জনক জিনিস হলে দাম বেড়ে যায়। এই ধরো বারোশ টাকা।’

‘বারোশই তাহলে।’

তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলাম। ‘তোমার কাছে বারোশ টাকা আছে?’

‘আছে,’ শান্ত সুরে বলল সে।

দীর্ঘ একটা সময় পর আমি জানতে পেরেছি, তার কাছে পঁচিশ হাজারেরও বেশি ছিল। টাকাটা বাইরে থেকে সঙ্গে করে জেলখানায় নিয়ে এসেছিল সে। এখানে যখন কাউকে ঢোকানো হয়, কুঁজো করে এমনকি তার মলদ্বারও পরীক্ষা করা হয়, লুকিয়ে কিছু আনা হয়েছে কিনা দেখার জন্যে। যে লোকটা তল্লাশি



চালায় তার মনে যদি সন্দেহ জাগে তাহলে সে রাবরের গ্লাভ পরে আপনার ভেতরটাও যতদূর পারা যায় নেড়েচেড়ে দেখার চেষ্টা করবে। কাজেই কেউ যদি এই তল্লাশিকে ফাঁকি দিয়ে কিছু আনতে পারে, তাকে সম্মান না করে উপায় নেই।

‘বেশ। তোমার নিশ্চয় জানা আছে এটা নিয়ে ধরা পড়লে ওদেরকে কি বলতে হবে?’

মাথা ঝাঁকাল উদ্যম। ‘জানি। বলব এটা আমি কুড়িয়ে পেয়েছি।’

‘তারপরও তোমাকে ওরা তিন কি চার সপ্তার জন্যে সলিটারিতে পাঠাবে। খেলনাটা তো হারাবেই, আর তোমার রেকর্ডে কালো একটা দাগ পড়বে। ওদেরকে তুমি যদি আমার নাম বলো, তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো ব্যবসা হবে না, এবং তোমাকে খানিকটা পেটানোর জন্যে দুজন হোঁৎকা চেহারার লোককে পাঠাব। আমি ভায়োলেস পছন্দ করি না, কিন্তু তোমাকে আমার পজিশনটা বুঝতে হবে। পরিস্থিতি আমার নিয়ন্ত্রণে নেই, লোকজনকে এটা ভাবতে দিতে পারি না। তা ভাবলে আমি শেষ হয়ে যাব।’

‘হ্যাঁ, সেটা বুঝতে পারি। তুমি কোনো দুশ্চিন্তা করো না।’

‘আমি কখনও দুশ্চিন্তা করি না, কারণ ওটায় কোনো পারসেন্টেজ নেই।’

‘ঠিক আছে, তাহলে,’ বলে চলে যাবার জন্যে ঘুরতে গেল সে। আমি ওকে বাধা দিলাম।

‘এক মিনিট।’

একটু অবাক হয়েছে বলে মনে হলো, চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল আমার দিকে।

‘আমাদের মধ্যে যে আলাপ হলো, দূর থেকে অনেকেই সেটা লক্ষ্য করেছে,’ বললাম ওকে। ‘এখন থেকে তুমি আর আমি এক হই কিনা তারা সেটা খেয়াল করবে।’

চারদিকে চোখ বুলাতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল উদ্যম। ‘তাহলে?’

‘ভয় পাবার কিছু নেই। তোমাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবে বলবে আমাদের মধ্যে কেনাকাটা নিয়ে কোনো আলাপ হয়নি। আর, দুই দিন আমার ধারেকাছে ঘেঁষো না। ব্যস।’

‘ঠিক আছে,’ বলে মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল। এক সপ্তাহ পর শরীরচর্চার উঠানে, লব্ধিতে সকালের বিরতি শুরু হতে, দেখা গেল আমার পাশে হাঁটছে সে। কথা বলল না, এমনকি আমার দিকে তাকালও না, এবং একজন জাদুকর যেমন তাস নিয়ে চালাকি করে, সেরকম দক্ষতার সঙ্গে আমার হাতে একটা কিছু গুঁজে

দিল। এই লোক দ্রুত সব শিখে নিতে পারে। সে তার রক হ্যামার পেয়ে গেছে। এক রাত ওটাকে আমি নিজের সেলে রেখেছিলাম, জিনিসটা তার বর্ণনার সঙ্গে পুরো মিলে গেছে। না, ওটা পালানোর কোনো কাজে লাগবে না। ওই রক হ্যামারের সাহায্যে পাঁচিলের তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করতে যেকোনো লোকের কমপক্ষে একশ বছর লাগবে। তবে, তারপরও, মন একটু খুঁতখুঁত করতে লাগল। ওই হ্যামারের চোখা দিকটা উদ্যম যদি কারও মাথায় ঢোকাতে চায় তাহলে তার পরিণতি অবশ্যই ভালো হবে না। এবং উদ্যম ইতিমধ্যেই সখিদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছে বলে শুনতে পাচ্ছি।

জিনিসটা লোক মারফত ডেলিভারি দিয়েছিলাম তাকে, খুব পুরনো দুজন কয়েদি তারা। এরপর ওই রক হ্যামার এগারো বছর আমি আর দেখিনি।

পরের শুক্রবার আবার আমার সঙ্গে উঠানে দেখা করল উদ্যম। সেদিন তার দিকে তাকানো যাচ্ছিল না, শুধু এটাই আপনাকে বলতে পারি আমি। তার নিচের ঠোঁট ফুলে পটল হয়ে গেছে। ফুলে আধবোঁজা হয়ে আছে ডান চোখও। একদিকের গালে কুৎসিত একটা আঁচড়ের দাগ, বেশ গভীর। বুঝলাম সখিদের সঙ্গে তার ঝামেলা শুরু হয়েছে। যদিও তার মুখ থেকে কিছুই আমি শুনতে পাচ্ছি না।

‘যন্ত্রটার জন্যে ধন্যবাদ জানাতে এসেছিলাম,’ বলে হেঁটে চলে গেল।

চোখে কৌতূহল নিয়ে তাকে আমি দেখছি। কয়েক পা হেঁটে গেল, তারপর থেমে ঝুঁকল, কি যেন তুলল। ছোট একটা পাথর ওটা। প্রিজন ফেটিগে পকেট থাকে না, তারপরও ব্যবস্থা করা যায়। পাথরটা উদ্যমের আস্তিনে ঢুকে গেল, কিভাবে সম্ভব বলা মুশকিল খসে পড়ছে না। কাজটা এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে করল, ভালো লাগল আমার; ভালো লাগল মানুষটাকেও। সমস্যার ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে ওকে, কিন্তু তারপরও নিজের জীবনটাকে চালিয়ে নিচ্ছে চেষ্টা করছে। হাজার হাজার মানুষ আছে যারা করে না, করবে না, পারবে না, এবং তাদের মধ্যে অনেকে জেলখানাতে নেই। আমি আরও লক্ষ্য করলাম, বেদম মার খেয়ে তার মুখ যতই রক্তাক্ত আর ক্ষতবিক্ষত দেখাবে আজও তার নখের ভেতর কোনো ময়লা জমে থাকতে দেখলাম না।

পরবর্তী ছ’মাস তার সঙ্গে খুব একটা দেখা হয়নি আমার। উদ্যমকে ওই সময়ের বেশির ভাগটাই সলিটারি-নির্জন সেলে কাটাতে হয়েছে।

তিন.

কাঠফাটায় প্রায়ই এমন সব বিচিত্র ঘটনা ঘটে, সিনেমার অতি নাটকীয় কাহিনিকেও মাঝেমধ্যে স্লান করে দেয়। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সী চাঁন মিয়া সহজ-সরল নিরীহদর্শন একজন মানুষ, পেশায় সড়ক নির্মাণ বিভাগের ঠিকাদার ছিল, দু'বছরের বেশি হলো কাটফাটায় আছে। এই দু'বছর তার মধ্যে কোনো রকম হিংস্রতা বা উন্মত্ততা দেখিনি আমরা, অথচ পাড়ার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশীর মধ্যে বেঁধে যাওয়া ঝগড়া-মারামারি থামাতে গিয়ে তার হাতে দু'পক্ষের দুজন মাঝবয়সী লোক মারা গেছে। মহামান্য আদালত সেটাকে খুন বা অপরাধ বলে মনে করায় জেল খাটতে হচ্ছে তাকে।

প্রথমে পুলিশের কাছে, পরে আদালাতে স্বীকার গেছে সে, তার হাতে হকিস্টিক ছিল, এবং আত্মরক্ষা করতে গিয়ে অর্থাৎ হামলা ঠেকাতে গিয়ে দু'পক্ষের দুজনের মাথায় দু'মিনিটের ব্যবধানে ওই হকিস্টিক দিয়ে বাড়ি মেরেছে সে।

উকিল কিংবা মহামান্য বিচারক, কেউ একজন তার ওপর খেপে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, 'ভালো করেছ বাড়ি মেরেছ, এখন যাও চৌদ্দ বছর জেল খাটোগে।'

চাঁন মিয়ার উকিল এই জোড়া খুনকে প্রথমে আত্মরক্ষার জন্যে পাল্টা আঘাত, এবং পরে দুর্ঘটনাবশত হত্যাকাণ্ড বলে চালানোর চেষ্টা করলেও, তাঁর বক্তব্য ধোপে টেকেনি বা যুক্তিগ্রাহ্য হয়নি।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে চাঁন মিয়া বলেছে, 'ওদেরকে আমি খুন করার জন্যেই মেরেছি, কারণ দুই পরিবারের এই দুই সদস্য প্রকাশ্যে চিৎকার করে বলছিল বাইরে থেকে এসে নাক গলানোর অপরাধে আমাকে তারা খুন করতে আসছে। কাজেই প্রবল উত্তেজনার মধ্যে আমার মনে হলো নিজেকে বাঁচাতেই ওদের দুজনকে আমার মেরে ফেলতে হবে। আরও একটা ব্যাপার, আমি এও বুঝতে পারছিলাম যে ওরা বেঁচে থাকলে এই ঝগড়া-মারামারি কয়েক দিন থামবে না। তারা চাইছিল দ্বন্দ্বটা যাতে কোনো কালে না মেটে।'

এরকম বক্তব্য শোনার পর সবাই বুঝতে পারল, তাকে কম সাজা দেয়ার কোনো উপায় নেই মহামান্য আদালতের। আপিল করার পর হাইকোর্ট যাবজ্জীবন রায় বহাল রাখলেন। তবে সুপ্রিম কোর্ট থেকে বলা হলো, প্রতিটি

হত্যার জন্যে সাত বছর করে জেল খাটতে হবে চাঁন মিয়াকে, তবে দুটো সাজা একসঙ্গে শুরু হবে। অর্থাৎ তার সাজা কমিয়ে দেয়া হয়েছে।

নিরীহদর্শন সহজ-সরল চাঁন মিয়া আসলে কতটুকু নিরীহ বা সরল সেটা বোঝার চেষ্টা করতেই এই গল্পের অবতারণা করা হয়েছে। তার জেল খাটার প্রথম বছর বেশ শান্ত ভাবেই কাটল। চাঁন মিয়ার বউ মলি লেখাপড়া না জানা অপরিশীলিত একটা মেয়ে। প্রতিমাসে রুজ-লিপস্টিক মেখে স্বামীকে একবার দেখতে আসে সে, প্রতিবার সঙ্গে থাকে চার বছর বয়সী ওদের ছোট কন্যাসন্তানটি। স্ত্রীকে নিয়ে ভারি গর্ব চাঁন মিয়ার, সবাইকে বলে বেড়ায় মলি আমার সতী-সাক্ষী বউ, স্বামীঅন্তপ্রাণ, ঘরে নিজের পুরুষ না থাকা সত্ত্বেও পরপুরুষের দিকে ভুলেও ফিরে তাকায় না।

ঠিকাদার হিসেবে বেশ ভালো রোজগার ছিল চাঁন মিয়ার। ব্যাঙ্কে নিয়মিত টাকা জমিয়েছে সে, বেশ ভালো একটা অঙ্ক-পনের লাখ। তাকে জেলে থাকতে হচ্ছে বলে তার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে না, ম্যানেজার সলিম বাবু তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটে, ওদিকটা সে ভালোমতোই দেখে শুনে রাখবে। সব মিলিয়ে তাকে সাত বছর জেল খাটতে হবে, কিন্তু তারপরও তার স্ত্রী আর মেয়ে আগের মতো স্বচ্ছলভাবেই এই সাত বছর কাটিয়ে দিতে পারবে।

কাঠফাটায় চাঁন মিয়ার দ্বিতীয় বছরও শান্তি আর স্বস্তিতে কাটল। দুঃসংবাদ আসতে লাগল দ্বিতীয় বছরের শেষদিক থেকে।

চাঁন মিয়ার কোনো এক বন্ধু, নাম ঠিকানা পুরোপুরি গোপন রেখে, প্রতি মাসে একটা করে চিঠি পাঠাতে লাগল তার নামে জেলখানায়। প্রতিটি চিঠি একটা করে বোমা ছাড়া কিছু নয়। চাঁন মিয়ার এই গোপন বন্ধু প্রথমে অভিযোগ করল, ‘ভাই রে, দুঃখজনক হলেও কথাটা সত্যি বলে জানবে, তোমার বউ মলি তোমাকে আর ভালোবাসে না। সে তোমার ম্যানেজার তথা ঘনিষ্ঠ বন্ধু সলিম বাবুর ফাঁদে পা দিয়েছে। প্রমাণ চাও? কটা ফটো পাঠালাম, দেখলেই আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারবে। তোমাকে না জানিয়ে মলি ভাবী আর সলিম কল্লবাজার বেড়াতে গিয়েছিল, ওখানে তারা তিন রাত একটা হোটেলের একই কামরায় শুয়েছে। ফটোগুলো ওদেরই তোলা, সেলফি। এখন আমি কিভাবে পেলাম সে-কথা না হয় গোপনই থাক। আমি জানি না এখনও তোমার সতর্ক হবার সময় আছে কিনা, বা জেলে বসে পরিস্থিতি শিথিল করার ক্ষমতা তুমি রাখো কিনা। শুধু জানি কথাগুলো তোমাকে আমার জানানো উচিত। ইতি, তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু।’

চিঠি তো এল না, চাঁন মিয়ার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যাবান লোকটা বাচ্চা ছেলের মতো হাউ হাউ করে এমন ভাবে কাঁদতে আরম্ভ করল, সেখানে উপস্থিত সবাই তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল, তাকে সাহুনা দিতে লাগল। কিন্তু সাহুনায কোনো কাজ হলো না, চাঁন মিয়া একটানা তিনদিন প্রায় বিরতিহীন কান্নাকাটি করল। চতুর্থ দিন মলি জেলখানায় তার সঙ্গে দেখা করতে এল।

একা শুধু চাঁন মিয়া নয়, সাধারণ কয়েদি আর গার্ডরাও উত্তেজিত। খিল আর কাচের দুদিকে যখন পরস্পরের মুখোমুখি হলো তারা দুজন, স্বামী এবং স্ত্রী, জেলখানার ওই অংশে তখন পিন-পতন নীরবতা নেমে এসেছে। তিন দিন একনাগাড়ে কান্নাকাটি করায় ফুলে গেছে চাঁন মিয়ার বড়সড় মুখ, তার চেহারা বলে দিচ্ছে যেকোনো মুহূর্তে আবার কেঁদে ফেলতে পারে। ওদিকে স্বামীর থমথমে চেহারা আর করুণ ভাব দেখে স্ত্রীর অবস্থাও কাহিল হয়ে উঠল। রীতিমতো আঁতকে উঠল সে, চিৎকার করে বলল, ‘কি অইছে গো তুমার? কি অইছে? কি অইছে? অ পলির বাপ...’

‘এগুলো কি?’ বলে স্ত্রীর সামনে অজ্ঞাত বন্ধুর পাঠানো ফটো গুলো মেলে ধরল চাঁন মিয়া। ‘তুমিই বলো, মলি, এই ছবিগুলো আমাকে কি বলছে?’

হতচকিত একটা ভাব নিয়ে ফটোগুলো দেখল মলি। ধীরে ধীরে ভয় আর আতঙ্ক জমা হচ্ছে তার চেহায়ায়। তবে খানিক পর মুখের রেখা আর ভাব বদলে যেতে লাগল, সে যেন কিছু একটা উপলব্ধি করতে পারছে। স্বামী, গার্ড, দু’চারজন কয়েদির চোখের সামনে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল সে। বোবা হয়ে গেছে, কথা বলতে পারছে না, শুধু মাথা নাড়ছে।

‘কাঁদলে আর মাথা নাড়লে হবে না,’ স্ত্রীকে বলল চাঁন মিয়া। ‘আমাকে তোমার বলতে হবে, এই ফটোগুলো কিভাবে তুমি তুললে? এত সাহস তোমার হলো কি করে? জানালা দিয়ে সাগর দেখা যাচ্ছে, পরপুরুষের গায়ে হেলান দিয়ে বিছানায় বসে সেদিকে তাকিয়ে আছ তুমি—এই দৃশ্য দেখার আগে আমার মরণ হলো না কেন? সবচেয়ে অবাক হচ্ছি তোমার দুঃসাহস দেখে। তুমি জেলখানায় আমি দু’দুটো খুন করেছি, তারপরও এই ফটো তোলার সাহস হলো তোমার?’

মলি ফুপিয়ে কেঁদে উঠল, আগের মতোই নাথা নাড়ছে, কথা বলার সময় তৌতলাতে লাগল। ‘পলির বাপ, তুমি কেমনে ভাবতে পারলা এই ফুটুগুলান আমি তুলছি? উপরে আসমান, নিচে জমিন, আমি বিখ্যাকতা কইলে আল্লায় আমারে দোজখে নিবো। এউগো সওয়ালের জবাব দাও, তুমি আমার স্বামী, তোমার লগে আমার কুনো ফুটু আছে, গায়ে গা ঠেকাইনা ফুটু? নাই। তা যদি না

থাহে, তাইলে তুমি কেমনে বিশ্বাস করতে পারলা আমি বেগানা পুরুষের গায়ে শুইয়া ফুটু তুলুম?’

একটু বিমূঢ় দেখাল চাঁন মিয়াকে। ফটোগুলো আবার দেখাল সে। ‘এগুলো তাহলে কি?’

‘হেরে জিগাও, যে তুমারে ফুটুগুলান দিছে।’

‘এগুলো তোমার ফটো, কাজেই তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে কেন তুমি তুলিয়েছ, কাকে দিয়ে তুলিয়েছ, এরকম ফটো তোলার পেছনে তোমার উদ্দেশ্য কি ছিল।’

‘জানালা দিয়ে সমুন্দর দেহা যায়, এমুন কুথাও যাই নাই আমি,’ বলল মলি। ‘আমি কোনো বেগানা পুরুষের লগে এক ঘরে থাহি নাই বা জিন্দেগিতেও কারও লগে কোনো ফুট তুলি নাই।’

‘এগুলো তাহলে কি?’

‘এগুলান নকল ফুটু। একিন যাও, পলির বাপ, আমারে কেউ ফাঁসাইবার মতলব করতাছে। ফুটু নকল করা খুব সহজ, বুজলা। শুধু তোমার একখান ভালো ফুটু দিতে অইবো, তারপর ইমুন জাদু করবো, দেহা যাইব সুচিত্রার কোলে তুমি শুইয়া রইছো।’

‘কেন কেউ তোমাকে ফাঁসাতে চেষ্টা করবে? তাতে কার কি লাভ? তুমি যতই অস্বীকার করো, সলিমের সঙ্গে কক্সবাজারে গেছো তুমি, তার সঙ্গে রাত কাটিয়েছ, ফটো তুলেছ...’

‘এসব কথা হুনাও পাপ...’

‘তুমি তাহলে অস্বীকার করছ যে সলিমের সঙ্গে কক্সবাজারে বেড়াতে যাওনি? তার সঙ্গে হোটеле ওঠোনি, এক কামরায় রাত কাটাওনি?’

মলি বলল, ‘আল্লাহ, পলির বাবার সব গুনা তুমি মাফ কইরা দিয়ো...’

‘তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছ না।’

‘সলিমের মায়ের পেটের বাই মানছি আমি, তারপরও হের সমাজে আমি ঘুমটা দিয়া থাহি, চক্ষুর দিকে তাকাই না। তুমি এত বড় পাষণ্ড কথা কইতে পারলা, পলির বাপ?’ এখনও ফোঁপাচ্ছে মলি, কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে।

মলি যতই কাঁদুক বা কিরে-কসম খাক, চাঁন মিয়া তার স্ত্রীকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মলিকে সে যতই বিশ্বাস করুক বা সতী নরী বলে জানুক, এই কাঁচা এয়সে কোনো মেয়ে যদি বছরের পর বছর স্বামীকে কাছে না পায়, তার পা পিছলানো খুব স্বাভাবিক। কিন্তু তার অকাট্য প্রমাণ দরকার, তা না হলে এর

কোনো বিহিত করতে পারবে না সে। কি বিহিত করবে, সেটা অবশ্য তার জানা নেই। জেলখানায় থেকে এই সমস্যার সমাধান অদৌ কি করতে পারবে সে?

স্ত্রী মলিকে ছেড়ে এবার একমাত্র মেয়ে পলিকে ধরল সে। পলির বয়স মাত্র চার। বাপের থমথমে চেহারা দেখে আর মায়ের কান্না শুনে ভয়ে সিটকে আছে বেচারি।

চাঁন মিয়া তাকে জিজ্ঞেস করল, ‘পলি মা, আমি তোমাকে যা যা জিজ্ঞেস করব, তুমি প্রতিটি প্রশ্নের সত্যি জবাব দেবে আমাকে, ঠিক আছে?’

প্রশ্ন শোনার আগেই পলি কাতর গলায় বলল, ‘বাবা, আমারে কিছু জিগায়ো না, আমি কিছু জানি না।’

‘তুমি ভয় পাচ্ছ কেন, মা? আমি তো তোমাকে বকাঝকাও করব না, মারধরও করব না। আমি শুধু জানতে চাইব, তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে কল্পবাজারে গিয়েছিলে কিনা।’

পলি মায়ের দিকে তাকাল, বলল, ‘মা, আমরা কল্পবাজারে গেছিলাম?’

‘হ, গেছিলাম। তর বাপের লগে। তুই তহন আমার পেটে আছিলি।’

‘হুনলা, বাবা? কল্পবাজারে গেছি আমরা। তহন আমি মার প্যাডে।’

‘আমি জানতে চেয়েছি কিছুদিন আগে গেছো কিনা,’ বলল চাঁন মিয়া।

‘তুমি, তোমার মা, আর তোমার সলিম কাকু?’

‘গেছিনি, মা?’ আবার মাকে জিজ্ঞেস করল পলি। ‘কিছুদিন আগে?’

‘তুমি তোমার মাকে কেন জিজ্ঞেস করছ?’ রাগে চোঁচিয়ে উঠল চাঁন মিয়া।

‘গেছো কিনা তুমি নিজে জানো না?’

‘জানি, বাবা। কিন্তু মা আমারে বইলা দিছে কারও কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওনের আগে জবাবটা মার কাছ থন জাইনা লইতে অইবো।’

‘তারমানে, মলি, মেয়েকে তুমি সত্যি কথা বলতে মানা করে দিয়েছ,’ বলল চাঁন মিয়া।

‘হ, করছি মানা। ক্যান করুম না, তুমিই কও? বাপ হিসাবে তুমি কি দায়িত্ব পালন করলা? পরের ঝগড়া মিটাইতে গিয়া দুইডা আদম সন্তানমেরে মাইরাইলা! স্বামী জেলে, অহন তো আমারে নয়-ছয় কইরা চলতে লাগর, কি?’

‘তাহলে তুমি স্বীকার করছ...’

সেদিন নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় চোপ মুহুর্তে মুহুর্তে জেলখানা থেকে বেরিয়ে গেল মলি।

তারপর গুজব শোনা গেল, গেট উপক্কে জেলখানা থেকে বেরিয়ে যাবার সময় চার বছরের মেয়ে পলি নাকি তার মাকে জিজ্ঞেস করেছে, ‘মা, আমি কি তাইলে বাবারে বাবা কমু, আবার সলিম কাকুরেও অহন থে বাবা কমু?’

উত্তর মলি কি বলেছে তা অবশ্য জানা যায়নি।

যাই হোক, গুজবটা সাত কান ঘুরে চাঁন মিয়ার কানেও পৌঁছাল। জেলখানায় বসে তার তো কিছু করার ক্ষমতা নেই, সে শুধু ভয়ে-ভাবনায় কখনও কাতর হলো, কখনও প্রচণ্ড রাগে ফুঁসতে লাগল।

তার সেই রহস্যময় বন্ধু এবার নিজের পরিচয় প্রকাশ করল, এবং আবার কিছু তথ্যসহ একটা চিঠিও পাঠাল। এই চিঠিকেও মাথায় বাজ পড়ার মতো গুরুতর হিসেবে গণ্য করতে হবে, যে-সব তথ্য ভরে দেয়া হয়েছে সেগুলোর কথা মনে রাখলে।

চাঁন মিয়ার বন্ধু জানিয়েছে, স্বামী খুনী, জোড়া খুন করে জেল খাটছে, এই অভিযোগ এনে চাঁন মিয়াকে তালাক দিয়েছে মলি বেগম। তার তালাকের আবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গ্রহণও করেছে। এবং শুধু তালাক দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি মলি, স্বামীর পুরো ঠিকাদারি ব্যবসা যেহেতু তার নামে, সেটা সে গুডউইল সহ বিক্রি করে দিয়েছে—এক কোটি বাহাত্তর লাখ টাকায়। ব্যাঙ্কে জমানো চাঁন মিয়ার পনেরো লাখ টাকা স্বামীর সরলতার সুযোগ নিয়ে আগেই তুলে ফেলেছে সে, জমা করেছে নিজের অ্যাকাউন্টে।

জেলখানায় বসে কোটিপতি ব্যবসায়ী চাঁন মিয়া রাস্তার ফকির হয়ে গেল। নিজের হাত কামড়ানো ছাড়া তার আর কিছু করার নেই। জেলখানায় আমরা যারা আছি তাদের চোখের সামনে এসব ঘটছে, স্বভাবতই অসহায় বোধ করছি সবাই, যেহেতু এত বড় একটা অন্যায় ঘটতে দেখেও কেউ আমরা যেখানে কিছু করতে পারছি না।

মুশকিল হলো, চাঁন মিয়াকে সাহায্য দেয়ার বা সহানুভূতি জানানোর উপায় নেই। যে ব্যক্তি যাবতীয় সবকিছু হারিয়ে নিঃশ্ব হয়ে গেছে, তাকে আপনি কি বলবেন?

তারপর জানা গেল মলি আর সলিম বাবু বিয়ে করেছে।

শান্তশিষ্ট নিরীহদর্শন চাঁন মিয়ার ভেতর যে একজন খুনি বসবাস করে, আমরা যেন সেটার প্রমাণ পেতে লাগলাম। খুব দ্রুত শুনে প্রথমে অসহায় আক্রোশে সেলের গরাদে মাথা ঠুকল সে। ক্রিপাল আনুর মতো ফুলে উঠল—দুঃজায়গায়। গার্ডরা থামাল তাকে। তারপর একের পর এক তেলপোকা



আর ইঁদুর মারতে লাগল চাঁন মিয়া। জেলখানায় এই দুটো জিনিসের কোনো অভাব নেই, আর ওগুলোকে মারতে চাঁন মিয়ার নেই কোনো ক্লান্তি।

তার এই হত্যাযজ্ঞ থামল কাটফাটায় খোকা বাবু আসতে।

দেশের খুন-খারাবির ব্যবসায় খোকা বাবু নিজেই একটা ইতিহাস। বলা হয় মনের মতো টাকা দেয়া হলে সে তার মাকেও খুন করতে ইতস্তত করবে না। কিছু মানুষ উকুন মেরে মজা পায় না, কিংবা ঘামাচি মেরে? খোকা বাবু আশ্চর্যিক অর্থেই মানুষ মেরে মজা পায়। বলতে চাইছি, এটা শুধু তার পেশা নয়, এটা তার মারাত্মক নেশা। সে নেশা যে অসম্ভব জটিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

খোকা বাবু কাটফাটায় তখনও পৌঁছায়নি, তার আগেই আমরা তার ইতিহাস জেনে ফেললাম। প্রথমে ফাইল আসে, তারপর আসে মানুষটা, অর্থাৎ কয়েদি।

সব মিলিয়ে একশ বছরেরও বেশি সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে খোকা বাবুকে। ইতিমধ্যে ন'বার জেল ভেঙে পালিয়েছে এবং প্রতিবার ধরা পড়েছে সে। ঘোষণা দিয়েছে, বাংলাদেশের কোনো জেল তাকে ধরে রাখতে পারবে না, যতই কড়া পাহারা দেয়া হোক, ঠিকই বেরিয়ে আসতে পারবে।

আদালতে দাঁড়িয়ে একবার নয়, বেশ কবার অকপটে স্বীকার করেছে খোকা বাবু, 'আমি খুনি পরিবারের ছেলে। আমার বাপ-চাচার সবাই খুনি। তারা কুকুর-বিড়াল খুন করত, আমি মানুষ খুন করি, এটুকুই যা পার্থক্য। কিংবা, না, এখানে আসলে হয়তো কোনো পার্থক্য নেই। আমার সন্দেহ বাবা-চাচারাও মানুষ খুন করত, তবে সেটা গোপনে, কাউকে কিছু টের পেতে না দিয়ে। আর আমি মানুষ খুন করি আগাম ঘোষণা দিয়ে। পার্থক্য যদি কোথাও থাকে তো এখানে।'

কোনো এক মহামান্য বিচারক রায় ঘোষণার আগে খোকা বাবুকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি মানুষ খুন করেন কেন?'

'আপনি মশা-মাছি মারেন কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করেছে খোকা বাবু। তারপর নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিয়েছে, 'ওগুলো আপনাকে খুব বিরক্ত করে, তাই; আপনার ক্ষতি করতে পারে, তাই। মানুষও খুব বিরক্ত করে, ক্ষতি করতে পারে। প্রমাণ চাইলে তাও দিতে পারি।'

'কি প্রমাণ?' মহামান্য বিচারক জানতে চেয়েছেন।

'এই যেমন আপনি। খুব বিরক্তিকর। জানতে চান কেন?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে নিজের কথা বলে যাচ্ছে খোকা বাবু। 'আপনি খুব বিরক্তিকর, কারণ আমি খুনি এবং মানুষ হিসেবে অতি নিকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও

আপনি আমাকে সম্মান দেখিয়ে সম্বোধন করছেন “আপনি” বলে। আপনার মুখে এক, মনে আরেক। একদিকে পাওনা না হওয়া সত্ত্বেও সম্মান দেখাচ্ছেন, আরেক দিকে কঠিন শাস্তি দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাই আপনাকে খুন করতে পারলে আমার খুব ভালো লাগত।’

আদালতে উপস্থিত সবাই প্রতিবাদে ফেটে পড়ল, খোকা বাবুর নিন্দায় মুখর হয়ে উঠল তারা। মহামান্য বিচারক আদালত মূলতবী ঘোষণা করে নিজের খাস কামরায় ফিরে গেলেন।

এরকম একজন স্টার কয়েদি কাঠফাটায় আসছে শুনে আমাদের মধ্যে অনেকেই সমীহভরা ভয়ের সঙ্গে অপেক্ষায় থাকলাম। তবে দাগাবাজ আর দাঙ্গাবাজদের মধ্যে তেমন কোনো প্রভাব পড়তে দেখা গেল না। এসব লোক সেই দলে পড়ে যারা সামনে খোদ শয়তান এসে দাঁড়ালেও গ্রাহ্য করবে না। জেল কর্তৃপক্ষ সবাইকে সাবধান করে দিয়ে জানাল, খোকা বাবুকে বিচ্ছিন্ন একটা সেলে, বাকি সব সেলের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা হবে। প্রতিদিন নয়, একদিন পর পর ব্যায়ামের উঠানে বেরোতে দেয়া হবে তাকে, তখন তার সঙ্গে অতিরিক্ত দুজন গার্ড থাকবে—সে যাতে কারও ক্ষতি করতে না পারে, অন্যেরাও যাতে তার কোনো ক্ষতি করতে না পারে। সবশেষে গার্ড এবং কয়েদিদের সাবধান করে দিয়ে বলা হলো, খোকা বাবু জেলের ভেতরও অত্যন্ত বিপজ্জনক। এর আগে অন্তত চারটে জেলে কয়েদি খুন করেছে সে, দুটো জেলে খুন করেছে গার্ডদের।

রাতের অন্ধকারে কাটফাটায় নিয়ে আসা হলো খোকা বাবুকে। দুদিন পর উঠানে তাকে আমরা প্রথমবার দেখার সুযোগ পেলাম। বিরাট কোনো ফিগার নয়। মাঝারি আকৃতির রোগাটে মানুষ, মাঝবয়েসী, শুধু জুলফি আর গৌফের দুই প্রান্তে পাক ধরেছে। বুকের রক্ত পানি হয়ে যাবে যদি সরাসরি আপনার দিকে তাকায়, এমনই বিপজ্জনক দৃষ্টি তার। বুঝতে পারবেন মন আর মাথায় তল্লাশি চালিয়ে জেনে নিচ্ছে সব।

হাঁটাচলার মধ্যে ক্ষিপ্ত একটা ভাব আছে, ঠোঁটের কোনে ক্ষীণ হাসির যে রেখা ফুটে থাকে সেটা যেন আপনাকে ভুল ধারণা দেয়ার জন্মেই। দেখা গেল সঙ্গে থাকা গার্ড তিনজনের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করছে সে, একজনের কাঁধে একটা হাত তুলে দিয়ে হাঁটছে। লক্ষ করলাম উঠানে কয়েকজন কয়েদি থাকলেও তাদের কারও সম্পর্কে তার মধ্যে কোনো কৌতূহল নেই।

এক সপ্তাহ পর।

তৃতীয় বারের মতো উঠানে বের হতে দেয়া হয়েছে খোকা বাবুকে। সেদিনও যথারীতি তার সঙ্গে অতিরিক্ত তিনজন গার্ড থাকতে দেখা গেল। হাঁটাইটি করার এক পর্যায়ে অনেকেই আমরা দেখলাম একজন গার্ড হাত লম্বা করে কি যেন দেখাচ্ছে তাকে। পরে বুঝলাম, অন্য কিছু নয়, একজন কয়েদিকে দেখাচ্ছে গার্ড। তারপর আমরা সেই কয়েদিকে চিনতে পারলাম-চাঁন মিয়া। বুঝলাম চাঁন মিয়ার দুঃখের গল্প খোকা বাবুর কানে গেছে। আজ তাকে দেখানো হলো চাঁন মিয়া লোকটা কে।

খোকা বাবুকে তার দিকে হেঁটে আসতে দেখে পাথরের মূর্তি হয়ে গেল চাঁন মিয়া।

চাঁন মিয়ার দিকে সোজা এগোল খোকা বাবু, সামনে থেমে তার কাঁধে একটা হাত তুলে দিল, তারপর তাকে পাশে নিয়ে ধীর পায়ে হাঁটা শুরু করল, গার্ড তিনজন ওদেরকে অনুসরণ করছে।

চাঁন মিয়া আর খোকা বাবু প্রায় আট-দশ মিনিট নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে আলাপ করল। তারপর সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে বিদায় নেয়ার সময় কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে হ্যাডশেক করল দুজন।

পরদিন শোনা গেল, খোকা বাবুর সঙ্গে চাঁন মিয়ার একটা মৌখিক চুক্তি হয়েছে, সেই চুক্তি অনুসারে মলির সাবেক প্রেমিক এবং বর্তমান স্বামী সলিম বাবুকে খুন করবে খোকা। দুজন একমত হয়েছে, চাঁন মিয়া যাতে নিজের জমানো টাকা আর হারানো ব্যবসা ফিরে পায় সেজন্যে আপাতত মলিকে বাঁচিয়ে রাখা হবে। পরে তাকেও সরিয়ে দেয়া হবে দুনিয়া থেকে। চুক্তি অনুসারে কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে খোকা বাবুকে দশ লাখ টাকা নগদ পুরস্কার দেবে চাঁন মিয়া।

জানা গেল, খুনটা খোকা বাবু নিজে করবে না। জেলে আটক থাকা অবস্থায় সেটা সম্ভবও নয়। খোকা বাবুর জানা আছে কাঠফাটায় নির্দয় খুনি কারা, এবং তাদের মধ্যে কার সময় হয়েছে ছাড়া পাওয়ার। যে ছাড়া পেতে যাচ্ছে তাকেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সলিমকে খুন করার। ওই পেশাদার খুনি নাম মুনির হোসেন, তার ছাড়া পাবার কথা আরও দেড় মাস পর। আমাদের কাছে খবর এল, ছাড়া পাবার পনেরো দিনের মধ্যে সলিম বাবুর ব্যবস্থা করবে সে।

এই গোপন চুক্তি বা আয়োজন সম্পর্কে কয়েদি এবং গার্ডদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ দেখা গেল। সবাই আসলে চাইছিল চাঁন মিয়ার সঙ্গে যে অন্যায় করা হয়েছে তার একটা ন্যায্য বিহিত করা হোক।

তারপর সবাইকে সত্যি সত্যি শোক সাগরে ভাসিয়ে দিল একটা খবর। মুনির হোসেন ছাড়া পেয়ে জেল থেকে বেরোয়নি, তার আগেই মর্মান্তিক একটা ঘটনা ঘটে গেল।

চাঁন মিয়ার একমাত্র মেয়ে পলিকে কে বা কারা যেন গলা টিপে মেরে রেখে গেছে বিছানায়। শোকে আর দুঃখে কাতর হয়ে পড়ল কাঠফাটার মানুষ।

থানায় গিয়ে পুলিশকে মলি বলেছে, দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে পলিকে নিয়ে প্রায়ই তার ঝগড়া-ঝাটি হচ্ছিল। পলি অন্য লোকের মেয়ে, তাই তাকে নিজেদের সংসারে রাখতে রাজি হচ্ছিল না সলিম বাবু। মলিকে সে চাপ দিচ্ছিল, পলিকে যেন কোনো এতিমখানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু মলি তাতে রাজি হয়নি, স্বামীকে সে বলেছে, এ সংসারে যদি পলির জায়গা না হয়, তাহলে তারও এখানে থাকা হবে না। এটা নিয়ে সেদিন দিনের বেলা স্বামী-স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া হয়েছে। তারপর রাতে পাশের ঘরে ঢুকে খুন করা হয়েছে ঘুমন্ত পলিকে গলা টিপে। এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে সরাসরি নিজের দ্বিতীয় স্বামী সলিম বাবুকে দায়ী করেছে মলি।

কিন্তু সলিম বাবুকে পুলিশ থানায় ধরে নিয়ে গেলেও, কয়েক ঘণ্টা আটকে রাখার পর ছেড়ে দিয়েছে। পুলিশের তরফ থেকে বলা হয়েছে সলিম বাবু সেদিন রাতে বাড়িতে ছিল না, সে ছিল কোলকাতাগামী একটা প্লেনে। কাজেই তার পক্ষে পলিকে খুন করা সম্ভব ছিল না। পুলিশ আশ্বাস দিয়ে বলেছে, সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের হোতাকে অবশ্যই গ্রেফতার করতে সক্ষম হবে তারা।

উঠানে আবার আমরা চাঁন মিয়ার কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে দেখলাম খোকা বাবুকে। তবে এবার তাদের হাঁটার গতি মন্তর, গলার স্বরও আগের চেয়ে নিচু।

দুজনের মধ্যে কি আলাপ হলো সেটা আমরা সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারিনি, জানতে পারলাম পরদিন। প্রথমে একমাত্র সন্তান হারানোর জন্যে চাঁন মিয়াকে সান্ত্বনা দিয়েছে খোকা বাবু, তারপর জানতে চেয়েছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চুক্তি থেকে সে সরে আসতে চায় কিনা। উত্তরে চাঁন মিয়া বলেছে, মেয়ে খুন হবার পর সলিম বাবু আর মলির প্রতি তার আক্রোশ আরও অনেক বেড়েছে, কাজেই চুক্তি থেকে সরে আসার প্রশ্ন ওঠে না। পুলিশকে বিচ্ছিন্ন ভাষায় একদফা গালিগালাজ করেছে সে, বলেছে টাকা বন্ধে সলিম বাবুকে একটা নিশ্চিদ্র অ্যালিবাই যোগাড় করে দিয়েছে তার দৃঢ়বিশ্বাস পলিকে ওই সলিমই খুন করেছে।

চাঁন মিয়ার বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে খোকা বাবু বলেছে, প্রোগ্রাম তাহলে সেই একই থাকল-জেল থেকে বেরোবার পর পনেরো দিনের মধ্যে সলিম বাবুকে ফেলে দেবে মুনির হোসেন।

মুনির হোসেন যথা সময়ে ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে গেল কাঠফাটা থেকে। গুরু হলো আমাদের স্বাসরুদ্ধকর অপেক্ষার পালা। একটা করে দিন যায়, আর আমাদের উত্তেজনা আরও বাড়তে থাকে। মুনির হোসেন মুক্তি পাবার সপ্তম দিনে খবর রটল, অজ্ঞাত আততায়ীর ছোঁড়া গুলিতে আহত হয়েছে সলিম বাবু, চিটাগাং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পুলিশ পাহারায় ভর্তি করা হয়েছে তাকে, তার অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়।

এটা যে একটা সাজানো নাটক, ওই সময় আমরা কেউ তা বুঝতে পারিনি। মুনির হোসেন ঠিকই গুলি করেছিল সলিম বাবুকে, তবে খুন করার জন্যে নয়, সামান্য আহত করার জন্যে। আহত সলিমকে নিজের পরিচিত ডেরায় তুলে নিয়ে গেছে মুনির, তারপর তাকে প্রস্তাব দিয়েছে, প্রাণে বাঁচতে হলে, মলির কাছ থেকে পাওয়া প্রায় দু'কোটি টাকা ভোগ করতে হলে, মলিকে হারাতে না চাইলে বিশ লাখ টাকা দাও।

মুনিরের প্রস্তাবে বাধ্য হয়ে রাজি হতে হলো সলিমকে। তবে সে জানতে চাইল, তাকে খুন করার জন্যে কে মুনিরকে পাঠিয়েছে সেটা জানাতে হবে। মুনির তখন খোকা বাবুর নাম না বলে বলেছে চাঁন মিয়ার নাম।

সলিম তখন পাল্টা একটা প্রস্তাব দিয়ে বলেছে, মুনিরকে সে বিশ লাখ নয়, টাকা দেবে পঁচিশ লাখ, তবে জেলখানার ভেতর খুন করতে হবে চাঁন মিয়াকে। তার প্রস্তাবে রাজি হয়েছে মুনির। সলিমকে প্রথমে থানায় পাঠিয়েছে সে, সেখান থেকে পুলিশ তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

অষ্টম দিন। বিকেল। কিভাবে জেলখানায় খবর পৌঁছাল, আমাদের জানার সুযোগ হয়নি। সেদিন উঠানে বেরোবার কথা খোকা বাবুর। কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে তাকে আমরা উঠানে আসতে দেখলাম না। অস্থির চাঁন মিয়াকে দেখলাম, খোকা বাবুর খোঁজে সারাক্ষণ চারদিকে তাকাচ্ছে। স্নান বিধিস্ত লাগছে তাকে। জানা কথা তার মনে হাজারটা প্রশ্ন মাথা কুটে মেরছে। মুনির হোসেন ব্যর্থ হলো কেন? কেন সলিম বাবু এখনও বেঁচে আছে? এরপর কি হবে?

তারপর, একেবারে শেষ সময়ে, খোকা বাবুকে উঠানে ঢুকতে দেখলাম আমরা। তাকে আজ খুব স্নান আর হতাশ দেখাচ্ছে। মাথাটা নিচু, তুলতে পারছে না। মন খারাপ। ধীর, ক্লান্ত পায়ে হাঁটছে সে। প্রথমে নির্দিষ্ট কোনো দিকে নয়,

পা যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে যাচ্ছে। তারপর চাঁন মিয়াকে দেখতে পেল সে। ঘুরে সেদিকে হাঁটছে, আর হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে।

চাঁন মিয়ার সামনে দাঁড়াল খোকা বাবু, অভ্যাসমতো তার কাঁধে একটা হাত তুলে দিল, তারপর তাকে পাশে নিয়ে হাটতে শুরু করল আবার।

পরে শুনেছি চাঁন মিয়ার কাছে একটা সুই ছিল। বড় সুই, যে সুই দিয়ে লেপ-তোষক সেলাই করা হয়। সুইটা নাকি খোকা বাবুই তাকে যোগাড় করতে বলেছিল। এটা-সেটা এনে দেয়ার লোক আমি ছাড়াও দু'একজন আছে কাঠফাটায়, নিশ্চয় তাদের কাউকে দিয়ে আনিয়েছিল চাঁন মিয়া।

যাইহোক, ওই সুই চেয়ে নিয়ে খোকা বাবু সরাসরি চাঁন মিয়ার পাঁজরের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিল। মোটা সুই সরাসরি ভেতরে ঢুকে হার্ট ফুটো করে দিয়েছে। এই ঘটনা ঘটল উঠানে দাঁড়ানো এক কি দেড়শ লোকের চোখের সামনে, তাদের মধ্যে গার্ড রয়েছে অন্তত বিশজন।

খোকা বাবুর সঙ্গে থাকা গার্ডরা ব্যাপারটা যখন টের পেলো তখন সব শেষ হয়ে গেছে। হার্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জমিনে ঢলে পড়ল চাঁন মিয়া, গার্ডরা ছুটে এসে জাপটে ধরল খোকা বাবুকে।

সেই রাতেই তাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো সলিটারিতে। দু'মাস পর ওখান থেকেই তাকে বদলী করা হয় অন্য একটা জেলখানায়। নিরাপত্তার কারণে নামটা আমাদের জানানো হয়নি।

চার.

অনেক জেলে ওদেরকে অন্য অনেক নামে ডাকা হয়, তবে কাঠফাটায় বলা হয় গাখি। কিছু লোক থাকে যারা সেক্স ছাড়া থাকতে পারে না, কোনো না কোনো মর্মে এটা তাদেরকে পেতেই হবে—পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও পার্টনার হিসেবে আরেকজন পুরুষমানুষে তাদের আপত্তি নেই।

জেলে এসে অনেকে “বদলে” যায়; ছিল “স্বাভাবিক”, এখানে আসার পর গাঙ্গনীর অভাবে আর উপস্থিত সখিদের প্ররোচনায় হয়ে উঠল “হোমো”।

পাঁচিলের বাইরে সমাজ ধর্মকদের যে চেখে দেখে পাঁচিলের ভেতরকার সমাজ সখিদেরও সেই একই চোখে দেখে। ওরা বেশিরভাগই দীর্ঘ মেয়াদে সাজা ভোগ করছে, বাইরে থাকতে রোমহর্ষক সব অপরাধে হাত পাকিয়েছে, এখানে ঈশ্বর হবার পরও—কথাতেই তো আছে, স্বভাব যায় না ম'লে।

ওদের শিকার কমবয়েসি, দুর্বল আর অনভিজ্ঞরা...কিংবা, উদ্যম হাসানের বেলায় যেমন, যাদেরকে দেখে দুর্বল বলে মনে হয়। ওরা শিকার ধরে গোসলখানায়। সুড়ঙ্গের মতো দেখতে, প্রায় ফাঁকা একটা জায়গা, লত্মির পেছন দিকটায়। কখনও বা হাসপাতালে। অডিটরিয়ামের পেছন দিকে খুপরি টাইপের কিছু বুদ আছে, ওদিকেও একাধিক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। প্রায়ই দেখা যায় সখিরা যেটা জোর করে আদায় করল, সেটা তারা এমনিতেই পেতে পারত, যদি চাইত। জেলে এসে যারা বদলে যায়, মানে হোমো হয়ে যায়, তারা সখিদের প্রেমে পড়ে, তবে হয়তো নতুন বলে মুখ ফুটে বলতে পারে না। বললেও লাভ নেই, কারণ সখিরা অনায়াসে পাওয়া জিনিস পছন্দ করে না। তাদের ধর্ষণ করাতেই আনন্দ।

ছোটখাট দেখতে বলে, এবং আত্মবিশ্বাসী মনে হওয়াতেও, যেদিন উদ্যম জেলখানায় পা দিয়েছে সেদিন থেকেই সখিদের চোখে পড়ে গেছে। এটা যদি কোনো রূপকথা হতো, আমি তাহলে আপনাকে বলতাম উদ্যম খুব ভালো একটা ফাইট দিয়েছে, সখিরা যতদিন না হার মেনে রেহাই দিয়েছে তাকে। এরকম কিছু বলতে পারলে সত্যি খুশি হতাম আমি, কিন্তু তা বলতে পারছি না। জেলখানায় রূপকথার কোনো জায়গা নেই।

উদ্যমকে প্রথমবার ধরেছিল গোসলখানায়, জেলে ঢোকার তিন দিনের মাথায়। সেবার প্রচুর চড়-থাপ্পড় মেরেছে আর সুড়ঙ্গুড়ি দিয়েছে, যতটুকু বুঝি আর কি আমি। এটা তাদের সাইজ করার ধরন, আসল কাজ করার আগে শিকার কতটুকু দুর্বল বা শক্তিশালী জেনে নেয়া।

বোগাস হীরা নামে এক প্রকাণ্ডেহী সখিকে পাল্টা মার দিয়েছে উদ্যম, তার চোখ আর ঠোঁট প্রায় ফাটিয়ে দিয়ে এসেছে—সেই থেকে এতগুলো বছর কোথায় হারিয়ে গেছে কে জানে। সেদিন একজন গার্ড ছাড়িয়ে দিয়েছিল, তা না হলে পরিণতি আরও অনেক খারাপ হতে পারত। তবে বোগাস হীরা কসম খেয়ে বলেছে উদ্যমকে দেখে নেবে সে। তা সে নিয়েওছিল।

দ্বিতীয়বার লত্মির পেছনে। বহু বছর ধরে ওখানে হামলা হচ্ছে, গার্ডরা জানে, কিন্তু তারা কোনো ব্যবস্থা নেয় না। জায়গাটা প্রায় অন্ধকার, সাবান গোলা পানিতে চারদিক সয়লাব হয়ে থাকে, বাতাসে ব্লিচিং পাউডারের গন্ধ। চারদিকে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে আছে খালি বস্তু, কাঠের বাস্তুশ্রী। গার্ডরা ওদিকে যেতে পছন্দ করে না। এই জায়গার সবচেয়ে খারাপ দিক হলো, নড়াচড়া করার যথেষ্ট সুযোগ নেই, আপনি পিছু হটতে পারবেন না। আর এখানেই আপনাকে ধরবে ওরা।

সেদিন বোগাস হীরা ওখানে ছিল না। তবে ওয়াশরুম ফোরম্যান চোধুরী ছানা আমাকে বলেছে, হীরার চারজন বন্ধু ছিল। উদ্যম ওদের চোখে হেব্রলাইট ছুঁড়ে মারার ভয় দেখিয়ে কিছুক্ষণ ওদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছিল। কিন্তু পিছু হটার জায়গা পায়নি সে, চেষ্টা করতে গিয়ে হোঁচট খেতে থাকে, আর তাতেই তারা সুযোগ পেয়ে যায় ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার।

আমার ধারণা গ্যাঙ-রেপ বা পালা করে ধর্ষণ বলতে যা বোঝানো হয় সেটা প্রজন্ম ভেদে বদলায় না, একই রকম থাকে। তাকে নিয়ে তাই করেছে ওই চার সখি। একটা গিয়ারবক্সের ওপর ঝুঁকতে বাধ্য করেছে তাকে, একজন একটা ক্লড্রাইভার ধরেছে তার কপালে, তারপর তারা এক এক করে কাজ সেরেছে। একটু ছিঁড়বে, ক্ষত তৈরি হবে, তবে মারাত্মক কিছু না—আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি—তারপরও আপনি প্রশ্ন তুলছেন? কিছুক্ষণ রক্তক্ষরণ বন্ধ হবে না। যদি চান আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস না করুক যে আপনার মাসিক গুরু হয়েছে কিনা, তাহলে কিছু টয়লেট পেপার গুঁজে রাখুন নিজের আভাঅয়্যারের পেছনে, যতক্ষণ না রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

উদ্যম একা এ-সবের ভেতর দিয়ে গেছে, সে-সব দিনে প্রতিটি বিষয়ে যেভাবে একা তাকে যেতে হয়েছে। সে নিশ্চয়ই সেই উপসংহারে পৌঁছেছে, তার আগে যারা ওই একই উপসংহারে পৌঁছেছিল: সখিদের সঙ্গে মাত্র দু'ভাবে চলা যায়, লড়াই করে ধরা দাও, তা না হলে শ্রেফ ধরা দাও।

উদ্যম সিদ্ধান্ত নিল লড়াই। লন্ড্রির পেছনের ওই ঘটনার এক সপ্তা পর হীরা আর তার দুজন বন্ধু আবার ধরতে এল তাকে (‘শুনলাম তোমার ফুটো নাকি বড় করা হয়েছে?’ বাঁকা হেসে জিজ্ঞেস করেছে বোগাস হীরা, লোটা বাবুর মুখে শুনেছি আমি)। তিনজনের বিরুদ্ধে একাই নেমে পড়ল সে। বেমক্লা একটা খুসি মেরে চান মিয়া নামে একজনের নাক ফাটিয়ে দিল। চান মিয়া দৈত্যের মতো দেখতে এক চাষা, সৎ মেয়েকে মারতে মারতে মেরেই ফেলেছে। চান মিয়া এই জেলখানাতেই মারা গেছে, বলতে ভালো লাগছে আমার।

ওদের সঙ্গে পারেনি উদ্যম, এক এক করে তিনজনই যা করার করেছে। ধর্ষণের কাজ শেষ হতে তাকে জোর করে মাটিতে হাঁটু গাড়ে বাঁধ করা হলো। এই কাজটা বোধহয় খাটো ছিদ্রিক করল, তবে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই। হেঁটে উদ্যমের সামনে চলে এল হীরা। তার হাতে মুঠো বসানো হাতলসহ একটা ক্ষুর। সেটা খুলল সে, তারপর বলল, ‘আমি একটা প্যান্টের চেইন খুলছি, মিস্টার ভাইস-প্রেসিডেন্ট, এবং তোমাকে আমি সেটা গিলতে দেব তুমি সেটা আদর করে গিলবে। আমারটা গেলার পর তুমি চান মিয়ারটাও গিলবে, ঠিক



আছে? আমার ধারণা তুমি ওর নাক ভেঙে দিয়েছ, তার দাম চুকাতে হবে তোমাকে।’

উদ্যম বলল, ‘আমার মুখে তুমি যে জিনিসই ঢোকাও না কেন, ওটা তোমাকে খোয়াতে হবে।’

উদ্যমের দিকে এমনভাবে তাকাল হীরা, সে যেন একটা পাগল, লোটা বাবুর ভাষ্য।

‘না,’ উদ্যমকে বলল হীরা, কথা বলছে ধীরে ধীরে, উদ্যম যেন বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশু। ‘আমি কি বলেছি তুমি বুঝতে পারোনি। তুমি যদি ওরকম কিছু করো, আমি তাহলে এই আট ইঞ্চি ইস্পাত তোমার কানের ভেতর ঢুকিয়ে দেব। বুঝতে পারছ?’

‘তুমি কি বলেছ আমি বুঝতে পেরেছি। আমার মনে হয় না আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ। আমার মুখে তুমি যাই ঢোকাও, আমি সেটা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলব। ওই ক্ষুর তুমি আমার মগজেও ঢোকাতে পারো, আন্দাজ করি, কিন্তু তোমার জানা উচিত আকস্মিক ব্রেন ইনজুরির শিকার, মানে ভিক্টিম, পেশাব-পায়খানা করে ফেলে, এবং কামড়ও দিয়ে ফেলে...’

মুখ তুলে হীরার দিকে তাকিয়ে আছে উদ্যম, নিজস্ব প্রতীক চিহ্নের মতো অল্প হাসি মুখে (লোটা বাবুর মনে হয়েছে উদ্যম বিপজ্জনক বা অশ্লীল কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলছিল না, সে যেন শেয়ার কেনাবেচা নিয়ে আলাপ করছিল ওদের সঙ্গে)। সে ঝুঁকে আছে, কোমরের প্যান্ট হাঁটুর কাছে নামানো, উরু বেয়ে ক্ষীণ ধারায় রক্ত গড়াচ্ছে, এ-সব যেন তার মনেই নেই।

‘আসলে,’ আবার বলল সে, ‘ওই রিফ্লেক্স, মানে কামড়ানোটা, মাঝে মধ্যে এত জোরালো হয় যে ভিক্টিমের চোয়াল রেঞ্জের সাহায্যে চাড়া দিয়ে খুলতে হয়।’

বহু বছর আগের সেই রাতে উদ্যমের মুখে কিছু ঢোকায়নি হীরা। চান মিয়াও সাহস করেনি কিছু ঢোকাতে। এবং আমি যতদূর জানি, সে চেষ্টা কখনও আর কেউ করেওনি। ওরা তিনজন উদ্যমকে এমন মার মেরেছিল, আর শোধহয় এক ইঞ্চি দূরে ছিল তার মৃত্যু। ওদের চারজনকেই বেশ কিছুদিন সলিটারিতে কাটাতে হয়েছে। তবে তার আগে উদ্যম আর চান মিয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল।

ওই গ্রুপটা আর কতবার ধরেছে তাকে? সেটা আমার জানা নেই। আমার ধারণা, সবার আগে চান মিয়া আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ভাঙা নাক খুব অস্বস্তির মধ্যে রাখে মানুষকে, বিশেষ করে একমাস হাসপাতালে থেকেও পুরোপুরি

জোড়া না লাগায়। আর বোগাস হীরা অচল হয়ে পড়েছিল, একেবারে হঠাৎ করেই বলতে হবে।

তার এই ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। হীরাকে তার সেলে পাওয়া গেছে, প্রচণ্ড মার খেয়ে গোঙাচ্ছে, নড়াচড়া করার শক্তি পর্যন্ত পাচ্ছে না। অথচ, আশ্চর্য, কে বা কারা তাকে মেরেছে বলতে পারছে না সে। তার মার খাবার খবরটা জানাজানি হলো নাস্তা খাবার সময় তাকে দেখতে না পাওয়ায়। শুধু কয়েদিরা নয়, গার্ডরাও তাকে জেরা করতে লাগল, কিন্তু হীরা কিছুক্ষণ বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, সে কিছু জানে না, অন্ধকারে দেখতে পায়নি কে বা কারা তাকে মারছে।

আমি আমার একটা ধারণার কথা বলতে পারি। জেলখানায় পয়সা কথা বলে। বেতন খুব বেশি নয়, কাজেই একমুঠো টাকা পেলে একজন গার্ড করতে পারে না এমন কোনো কাজ নেই, শুধু বোমা আর রিভলভার এনে দেয়া ছাড়া। আর পুরনো কয়েদিরাও পারে, তবে তারা পারে গার্ড তথা পুলিশদের সাহায্য নিয়েই। এখানে আরেকটা কথা মনে রাখা দরকার, আমি যখনকার কথা বলছি তখন ইলেকট্রনিক লকিং সিস্টেম ছিল না, ছিল না ক্লোজ-সার্কিট টিভিও। ওই সময় প্রতিটি সেলরুকের নিজস্ব চাবি ছিল, একজন গার্ড খুব সহজেই ঘুস খেয়ে ভেতরে ঢুকতে দিতে পারত কাউকে। হয়তো একজনকে নয়, দু'তিনজনকে ঢোকানো হয়েছিল, তা না হলে হীরার শরীর ওরকম ক্ষতবিক্ষত হলো কি করে। হীরাকে সবাই ভয় করে, তা ঠিক, কিন্তু ঘুস খেয়ে গার্ড যদি সব আলো কিছুক্ষণ নিভিয়ে রাখে, তাহলে হীরা দেখতে পাবে না কে বা কারা তাকে মেরে গেল। এটাই তো ঘটেছে? কাজেই যারা মেরেছে তারা জানত তাদের ধরা পড়ার ভয় নেই।

জানা কথা এ-ধরনের একটা কাজ করাতে হলে প্রচুর টাকা লাগবে। চাবির জন্যে আলাদা টাকা, আলোর জন্যে আলাদা টাকা, হীরা চিৎকার করলেও কেউ তাকে সাহায্য করতে আসবে না, সেজন্যে আলাদা টাকা, কাজ সেরে নিরাপদে বেরিয়ে যাবার জন্যে...না, আমি কিন্তু একবারও বলছি না যে কার্জটা উদ্যম করিয়েছে। তবে আমি শুধু জানি এই জেলে পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে ঢুকেছে সে। জানি সরল দুনিয়ায় সে একজন ব্যাঙ্কার ছিল। টাকার যে কত ক্ষমতা তা আমাদের সবার চেয়ে বেশি জানার কথা তার।

এবং আমি জানি, মার খাওয়ার পর-পাঁজরের তিনটে হাড় ভেঙেছে, একটা চোখ থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে, জায়গা থেকে সরে গেছে নিতম্বের হাড়-উদ্যমকে আর বিরক্ত করে না বোগাস হীরা, শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে

তাকে। শুধু তাই নয়, হীরার মধ্যে একটা পালিয়ে বেড়ানোর ভাবও লক্ষ্য করলাম আমি। সবাই দেখতে পেল মার খাওয়ার পর হীরা আর আগের মতো তর্জন-গর্জন করছে না, তারা এখন তাকে ‘দুর্বল সখি’ বলছে।

তারপর একদিন আবার আমার কাছে এসে উদ্যম জিজ্ঞেস করল আমি তাকে আধডজন রক ব্ল্যাক্‌স্ট এনে দিতে পারব কিনা।

‘সেটা আবার কি জিনিস?’ জানতে চাইলাম আমি।

উত্তরে উদ্যম বলল, সে একজন রকবাউন্ড, এবং রকবাউন্ডরা জিনিসটাকে ওই নামেই ডাকে—ডিশটাওয়েল সাইজের কাপড়, যে কাপড় দিয়ে পালিশের কাজ করা যায়। খুব মোটা প্যাড লাগানো থাকে, একটা দিক মসৃণ, একটা দিক স্যাণ্ডপেপারের মতো কর্কশ। মসৃণ দিকটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টিল উলের মতো (উদ্যমের সেলে একবার আছে, যদিও সেটা আমার কাছ থেকে সংগ্রহ করেনি সে, সম্ভবত জেলখানার লড্ডি থেকে পেয়েছে)।

তাকে বললাম, ব্যবসা হবে বলে মনে করি। যেখান থেকে রক হ্যামার আনিবে ছিলাম, রক ব্ল্যাক্‌স্টও সেখানে পাওয়া গেল। প্যাড লাগানো কাপড়, মোটেও বিপজ্জনক কিছু নয়, কাজেই এবার আমার দশ পার্সেন্ট কমিশন ছাড়া এক পয়সাও বেশি নিইনি তার কাছ থেকে।

এর প্রায় পাঁচ মাস পর উদ্যম আমাকে জিজ্ঞেস করল আমি তার জন্যে মধুবালাকে এনে দিতে পারব কিনা। তার সঙ্গে আমার এই আলাপটা হচ্ছিল অডিটরিয়ামে, সিনেমা দেখার সময়। হাতে গোনা কয়েকটা ছবি প্রতি মাসে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বারবার দেখানো হয়। আমি কিং কং দেখেছি আট কি ন’বার। সেদিন আমরা দিলীপ কুমারের অভিনয় দেখছিলাম, ছবির নামটা এখন আর মনে পড়ছে না...না, মনে পড়েছে—ইনসানিয়াত। ছবি শুরু হবার বেশ কিছুক্ষণ পর আমার পাশে এসে বসল উদ্যম। ছবি শেষ হতে চলেছে, এই সময় আমার দিকে ঝুঁকে জানতে চাইল আমি তাকে মধুবালা যোগাড় করে দিতে পারব কিনা। আমি আপনাকে সত্যিকথা বলি, ব্যাপারটা আমার বেশ মজা লাগছিল। উদ্যম সাধারণত শান্ত, ঠাণ্ডা, আর চুপচাপ, কিন্তু সেই রাতে তাকে অস্থির লাগছিল আমার, এবং খুব বিব্রত মনে হচ্ছিল।

‘হ্যাঁ, পারব, মধুবালা যোগাড় করা যাবে,’ আশ্বস্ত করলাম তাকে। ‘এটা কঠিন কিছু নয়, কাজেই তোমার ঘাবড়াবার কিছু নেই। কেমন চাও, ছোট না বড় সাইজে?’ ওই সময় মধুবালা আমারও প্রিয় অভিনেত্রী। ফুটপাতে তাঁর দু’রকমের

পোস্টার বিক্রি হয়, একটা ছোট, একটা বড়। ছোট পোস্টারের দাম বিশ টাকা, বড় পোস্টারের দাম পঞ্চাশ টাকা। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে আপনি বড়সড় মধুবালা পাবেন, চার ফুট লম্বা, পুরোটা নারী।

‘আমার বড় সাইজ চাই,’ বলল সে, আমার দিকে তাকাচ্ছে না। বিশ্বাস করুন, ঘামছিল উদ্যম। ‘পারবে তো?’

‘তুমি শান্ত হও, অবশ্যই পারব, কেন পারব না।’

‘কতদিনে?’

‘এক সপ্তা ধরে রাখো। তার আগেও পেয়ে যেতে পারো।’

‘ঠিক আছে।’ কিন্তু তার গলার সুর বলছে সে হতাশ হয়েছে, সে যেন ভেবেছিল চাওয়া মাত্র পোস্টারটা আমি তার হাতে ধরিয়ে দেব। ‘কত?’

‘পঞ্চাশ টাকা।’

লোটা বাবুর সঙ্গে কথা বলতে হলো আমাকে। কদিন পর লন্ড্রির এক ড্রাইভার আমার জন্যে ষাটটা পোস্টার নিয়ে এল, বেশিরভাগই মধুবালা।

জেল কর্তৃপক্ষ এই চোরাচালান সম্পর্কে জানে। আমার ব্যবসা সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি, তারাও সম্ভবত ততটুকু জানে। এতে তাদের নাক না গলাবার কারণ হলো তারা জানে জেলখানা আসলে বড়সড় একটা প্রেশার কুকার, কাজেই গরম বাষ্প বেরোনোর জন্যে কিছু ফাঁক-ফোঁকর থাকতে দিতে হবে। মাঝে মধ্যে তল্লাশি চালায় তারা, ধর-পাকড় শুরু হয়, আমাকে তখন দিন কয়েক সলিটারিতে কাটাতে হয়। এটা বছরে দুই কি তিনবার ঘটে, তার বেশি না। তবে জিনিসটা যদি পোস্টার হয়, তারা চোখ মটকায়। বাঁচো আর বাঁচতে দাও।

মধুবালা পোস্টার আমার সেল নং ৬ থেকে রওনা হলো, বয়ে নিয়ে যাচ্ছে লোটা বাবু, সে ডেলিভারি দিল ১৪ নং সেলে ঢুকে সরাসরি উদ্যমের হাতে। লোটা বাবু ফিরে এল উদ্যমের একটা চিরকুট নিয়ে, তাতে মাত্র একটা শব্দ লেখা হয়েছে: ‘ধন্যবাদ।’

এর খানিক পর, সকালের নাস্তা খেতে লাইন দিয়ে বেরোচ্ছি সবাই, উদ্যমের সেলে উঁকি দিতে মধুবালাকে দেখতে পেলাম, মাথার পেছনে হাত দিয়ে শুয়ে আছেন বিছানায়, মুখে মিষ্টি মায়াবি হাসি। ছবিটা এমন জায়গায় রাখা হয়েছে, ইচ্ছে করলে রাতে তাঁকে দেখতে পারি উদ্যম, শুয়েও, সেল বা করিডরের আলো নিভিয়ে দিলেও—কারণ উঠানের আলো কিছুটা হলেও তার সেলে সরাসরি ঢোকে।

পাঁচ.

কাঠফাটা থেকে দূরে, প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে, সাততলা একটা নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে। সেই বাড়ির চিলেকোঠায় আছে ছোট্ট একটা জানালা। ওই জানালার কাচ কখনও খোলা হয় না। জানালার ভেতর কি আছে বা কে আছে তা আমাদের কখনও জানা হতো না, যদি না তুষার আবদুল্লাহ আমাদের জানাত।

স্বভাবতই আপনি প্রশ্ন করছেন, কে এই তুষার আবদুল্লাহ?

তাহলে খুলেই বলি।

হিংস্রতায় ভরা কাঠফাটার গা ছমছমে জগতে হঠাৎ কিভাবে যেন একটা জমজমাট প্রেমকাহিনি ঢুকে পড়ল। সেটাকে আসলে রজাক্তই বলতে হবে। গল্পটা কাঠফাটা থেকে নয়, শুরু করতে হবে চিটাগাং শহর থেকে, সুদর্শন এক অসমসাহসী তরুণ যেখানে পরমাসুন্দরী এক তরুণীর প্রেমে পড়ে দিওয়ানা হয়েছিল।

এটা একটা ত্রিভুজ প্রেম, আমরা সকল পক্ষ থেকেই টুকরো-টাকরা যা পেরেছি যোগাড় করে দাঁড় করিয়েছি গল্পটা, ভুল করার বা অতিরঞ্জনের আশঙ্কা প্রায় নেই বললেই চলে।

তুষার আবদুল্লাহ আর প্রধান অর্জন সেই পঞ্চম শ্রেণি থেকে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একজন অপরজনকে ছাড়া বাঁচে না। একে অন্যের প্রতিটি বিষয় শেয়ার করে তারা। শিক্ষার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে শুরু থেকে তারা দুজন একই রকম রেজাল্ট করে আসছে। একজন প্রথম হয় তো অপরজন হয় দ্বিতীয়। বিজ্ঞান নিয়ে মাধ্যমিক পাস করল দুই বন্ধু, তারপর তারা ভর্তি হলো প্লাইভেট এক মেডিকেল কলেজে। দুজনেই ধনী লোকের ছেলে।

ওদের মধ্যে প্রথম এবং শেষ সমস্যা দেখা দিল এখানেই, মর্জান মেডিকেল কলেজে। এই প্রথম বন্ধুত্বে একটু চিড় ধরল। ওদের এই বিশ্বের উৎস হলো, স্বভাবতই, এক তরুণী। তার নাম তরঙ্গিনী পদ্মা। সেও ক্রীড়াপতির সন্তান, তার ওপর আবার একমাত্র, বাবা জাহাজ ভাঙার ব্যবসা করতেন। ওদের দুই বন্ধুর ক্লাস শুরু হবার দু'সপ্তাহ পর ওই একই কলেজে ভর্তি হলো পদ্মা।

পদ্মাকে দেখামাত্র দুই বন্ধু একযোগে তার প্রেমে পড়ল।

এতদিন নিজেদের মধ্যে তাদের আলাপ ছিল এরকম: কোনো অবস্থাতেই মেয়েদের খপ্পরে পড়া চলবে না। কারণ আজকাল মেয়েরা একসঙ্গে চার-পাঁচটা ছেলের সঙ্গে প্রেম করে, কাজেই ওদেরকে বিশ্বাস করা যায় না। বেশিরভাগ মেয়ে ধনী পরিবারের ছেলেদের পকেট খালি করার তালে থাকে, তাদের কাছে প্রেম হলো ঘুরে ঘুরে শহরের নামী-দামী রেস্টোরাঁয় পেট ভরানো।

কিন্তু দেখা গেল আর দশজন সাধারণ মেয়ের কাতারে পদ্মাকে ফেলা যাচ্ছে না। প্রথমত, একবার তার দিকে তাকালে কোনো পুরুষমানুষের সাধ্য নেই চোখ ফিরিয়ে নেয়, এতই তার রূপ। তারপর দেখা গেল বাইরের কোনো খাবারে একেবারেই রুচি নেই তার। গাড়ি করে বাড়ি থেকে তার খাবার পাঠানো হয়, টিফিনের সময় গাড়িতে বসে খায়। সে-সব পাঠানো হয় প্রচুর, তিন-চারজন বান্ধবীকে নিয়ে খাওয়া চলে। তাই খায় পদ্মা। তারপর দেখা গেল, পদ্মারা এত ধনী, আবদুল্লাহ এবং অর্জনের পরিবারকে ব্যবসা সহ দশবার কিনে নিতে পারবে। পদ্মার গুণেরও কোনো শেষ নেই। যেমন চঞ্চল সে, তেমনি ভদ্র এবং বিনয়ী। কণ্ঠস্বর? একেবারে যাকে বলা মধুঝরা।

মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় হবার এক সপ্তাহ পরই পরস্পরকে দুই বন্ধু জানাল, দুজনে তারা একসঙ্গে পদ্মার প্রেমে পড়ে গেছে। এটা উচিত না, একমত হলো তারা। কিন্তু কিভাবে এর সমাধান করা যাবে দুজনের কেউ তা জানে না। একজন বলল, এতদিন আমরা সব কিছু নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছি। কিন্তু একটা মেয়েকে তো ভাগ করা সম্ভব নয়। মাঝখান থেকে কাটলে পদ্মা বাঁচবে না, যেটা ওদের কারুরই কাম্য নয়। সিদ্ধান্ত হলো, জানার চেষ্টা করা হোক পদ্মা ওদের কাউকে ভালোবাসে কিনা। সে যদি দুজনের একজনকে পছন্দ করে, অপরজনকে স্বভাবতই এক পাশে সরে দাঁড়াতে হবে।

পদ্মা সত্যবাদী মেয়ে, সে বলল ওদের দুজনকেই তার ভালো লাগে। দুজনের মধ্যে একজনকে বিশেষভাবে পছন্দ করে সে, এরকম কিছু চিন্তা করতে নিষেধ করল। বলে দিল, তা যদি কেউ ভাবে, সেটা তার মস্ত ভুল হবে।

পদ্মার উত্তর শুনে সংকট থেকে বোরোবার কোনো পথ দেখতে পেল না আবদুল্লাহ বা অর্জন। কটা দিন মাথা ঘামানোর পর তারা সিদ্ধান্তে পৌঁছাল, পদ্মাকেই তারা ধরবে, তাকে বলবে তুমি এর একটা বিধি করে দাও।

ওদের প্রস্তাব শুনে অসন্তুষ্ট হলো পদ্মা। দুজনকেই নীরস গলায় পরিষ্কার জানিয়ে দিল, ভবিষ্যতে এরকম কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ করার জন্যে তারা যেন তার কাছে আসার সাহস না করে।

বলা যায় এক ধরনের অপমান করে ভাগিয়ে দেয়া হলো ওদেরকে। কিন্তু তারপরও দুই বন্ধু পরস্পরকে না জানিয়ে একা একা পদ্মার সঙ্গে এখানে সেখানে দেখা করল, নিজেদের ভালো লাগার কথা জানাল তাকে, বলল ওকে ছাড়া তারা বাঁচবে না।

পদ্মা মেয়েটি ওদেরকে নিয়ে সত্যি বিপদে পড়ল। ওদের দুজনকে সেরকম ভালো লাগে না তার, কাউকে পছন্দ করার কথা ভাবতে পর্যন্ত রাজি নয় সে, অথচ ওরা দুজন জেদ ধরছে, তাকে বলতে হবে দুজনের মধ্যে একটু হলেও কাকে তার বেশি পছন্দ।

কোনো পথ দেখতে না পেয়ে মৌনব্রত অবলম্বন করল পদ্মা। দুজনকেই অল্পস্বল্প সময় দেয়, মন দিয়ে শোনে প্রত্যেকের বক্তব্য, কার কি স্বভাব আর প্রবণতা লক্ষ করে, আর তার সব নিজের ডায়ারিতে লিখে রাখে।

এভাবে এক বছর কাটল। কাটল আরও এক বছর। তুষার আবদুল্লাহ্ আর প্রধান অর্জনের বন্ধুত্ব একরকম নষ্টই হয়ে গেছে, পদ্মাকে নিয়ে এখনও তারা প্রবল ঘন্থে ভুগছে। পরস্পরকে এখন আর তারা আগের মতো বিশ্বাস করে না। শেয়ার করে না নিজেদের চিন্তা-ভাবনা বা ভালো লাগা মন্দ লাগা। আগে কখনও যা ঘটতে দেখা যায়নি, পরস্পরের খুঁত খুঁজে বের করে তারা, চেষ্টা করে নিজেকে বড় করে দেখানোর, প্রতিপক্ষকে খাটো করে দেখানোর। ওদের কথাবার্তায় আজকাল মাঝেমাঝে হুমকির সুরও থাকছে। ভয় দেখানোর ব্যাপারটা প্রথমে ধরা পড়েছে প্রধান অর্জনের কথায়। তুষার আবদুল্লাহ্কে প্রায়ই মনে করিয়ে দেয় সে, পদ্মাকে তার পেতেই হবে; ওকে হয় সে পাবে, তা না হলে কেউ পাবে না।

উত্তরে আবদুল্লাহ্ তাকে একদিন বলল, ‘আমিও তোর মতো এরকমই ভাবি, তবে একটা পর্যায়ে নিজের লাগাম টেনে ধরি। বুঝতে পারি, যা খুশি তাই করার ইচ্ছে বা সাধ্য আমার ভেতর নেই। পদ্মা যদি আমার না হয়, আমি ওকে খুন করতে পারব? না, তা আমি কক্ষনো পারব না।’

‘আমি পারব, বিলিভ মি।’

‘এ তো হিংস্রতা, প্রধান, আক্রোশ চরিতার্থ করা: এর মধ্যে প্রেম কোথায়?’

‘আমাকে জিততে হবে, তুষার। ওকে পাবার ক্ষমতাই আমার প্রেমের পরিপূর্ণতা এবং সার্থকতা। জেতাটা বড় কথা, একটা ট্রাস্ট; কিভাবে জিতলাম সেটা গৌণ ব্যাপার।’

‘পদ্মা কিভাবে নেবে, সেটার কোনো গুরুত্ব নেই?’

‘এমনভাবে কথা বলছিস, তুই যেন মেয়েদের চিনিস না। মেয়েরা যার ঘরে যায়, সে ডাকাত হলেও, তাকে ভালোবাসে। আমি তাকে দখল করতে পারলে, সে আমাকে ঠিকই পছন্দ করবে। মেয়েদের শক্ত পুরুষ পছন্দ।’

‘শক্ত পুরুষ আর ডাকাত কিন্তু এক জিনিস নয়। শক্ত পুরুষ আর অপরাধীও এক জিনিস নয়। ছলে-বলে-কৌশলে পদ্মাকে তুই দখল করবি বলছিস, দেশের আইন তো তোকে সে অধিকার দেয়নি।’

গলা ছেড়ে হেসে উঠল ব্যায়ামপুষ্ট শরীরের অধিকারী অর্জন। ‘প্রেম কোনো আইন বা নৈতিকতা মানে না, তুষার।’

‘তোকে তাহলে সরাসরি স্পষ্ট একটা প্রশ্ন করি। পদ্মা যদি আমাকে ভালোবাসে, তাহলে কি হবে?’

‘কি করে তোকে ভালোবাসবে? আমি তো ওকে অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছি, হয় আমাকে ভালোবাসতে হবে, তা না হলে কাউকে ভালোবাসতে হবে না। আমার এই আদেশ যদি অমান্য করা হয় আমি তাহলে যেকোনো প্রতিশোধ নিতে পারব।’

‘জোর যার মুল্লুক তার?’

‘জোর যার মুল্লুক তার।’

‘কিন্তু ধর, প্রেমে আমি জিতেছি, আর আমার সেই বিজয় তুই কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করছিস, আমি কি তখন হাত-পা গুটানো নীরব দর্শক হয়ে থাকব?’

‘না। জানি তুই তোর বিজয় ধরে রাখার চেষ্টা করবি। কিন্তু আমি তো নাছোড়বান্দা, হার মানতে জানি না। পদ্মাকে আমি তোর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেব। পারলে তুই ঠেকাবি।’

‘চ্যালেঞ্জ?’

‘অবকোর্স চ্যালেঞ্জ।’

আরও এক বছর কাটল।

দুই বন্ধু অর্জন আর আবদুল্লাহর নিয়তি দুটো আলাদা পথ ধরে এগোচ্ছে।

পদ্মার মন জয় করার জন্যে ভারি সুন্দর একটা কৌশল নিয়েছে তুষার আবদুল্লাহ। সবাইকে গোপন করে প্রেমের রূপকথা অনুবাদ করে পাঠাচ্ছে।

ওর প্রথম রূপকথার নাম ‘অচেনা দ্বীপ’। হোসে স্যারামাগো-র লেখা। এটা আধুনিক একটা ল্যাটিন রূপকথা, এবং ভারি সুন্দর। গল্পটা আপনারও পড়া উচিত। গল্পের নামই অচেনা দ্বীপ:



এক লোক রাজার দরজায় টাকা মেরে বলল, আমাকে একটা জাহাজ দিন। ব্যাপারটা মজার বলে মনে হতে পারে, কিন্তু লোকটা মজা করার জন্যে কথাটা বলেনি। সে মজা করার লোকও নয়। কাউকে জিজ্ঞেস করলে কেউ বলতে পারবে না ওই লোক কে, কোথায় থাকে, কি করে বা কি করে না। সে সুন্দর নয়, আবার তাকে অসুন্দরও বলা যাবে না। তাকে তরুণ বলতে হবে, তবে অপরিণত বলা যাবে না। লোকটা এক সময় ফরসা ছিল, আবার কথাটা এভাবে ঘুরিয়েও বলা যায় যে লোকটা এক সময় কালো ছিল।

তা সে যাই হোক, ওই লোক রাজার দরজায় টাকা দিয়ে বলল তার একটা জাহাজ চাই।

রাজপ্রাসাদে আরও অনেক দরজা আছে, তবে এই দরজাটা শুধু আর্জি পেশ করার জন্যে আলাদা করা। যেহেতু রাজা তাঁর পুরোটা সময় প্রাপ্য নামে দরজায় কাটান (যা কিছু সব রাজারই প্রাপ্য, আপনাকে বুঝতে হবে), যখনই আর্জির দরজায় কেউ টাকা মারে তিনি শুনতে না পাবার ভান করেন। কিন্তু রাজার ভান করাটা বোকামি হয়ে দাঁড়ায়, কারণ ওই দরজায় যারা আসে তারা সহজে হতাশ হবার লোক নয়, চরম নাছোড়, তারা বোঝে রাজা শুনতে না পাবার ভান করে বসে আছেন।

দরজায় লাগানো ব্রোঞ্জের কড়া নাড়ার শব্দ যখন কানের পরদা ফাটানোর হুমকি দেয়, হয়ে ওঠে নিখাদ কেলেক্সারীর সমতুল্য, প্রতিবেশীদের শান্তি হরণ করে (লোকজন ফিসফাস শুরু করবে-সে রাজা কেমন রাজা কড়া নাড়লেও যিনি সাড়া দেন না), শুধুমাত্র তখনই তিনি তাঁর প্রধানমন্ত্রীকে ডেকে বলবেন-যেহেতু চুপ করানো যাচ্ছে না, দেখুন তো লোকটা কি চাইছে।

প্রধানমন্ত্রী অচেনা আগন্তুককে খানিক গালিগালাজ করবেন, মিছিমিছি গল্প বানিয়ে বললেন, ‘রাজা মহান! হুজুর, আমার যেন মনে হচ্ছে ওই ব্যাটা একজন বখাটে। তার কাজ মেয়েদের উত্যক্ত করা। কিন্তু ওই কাজ এখন তার একঘেয়ে লাগছে। জানে সে কখনো রাজা বা মন্ত্রী হতে পারবে না, তাই যারা রাজা আর মন্ত্রী হয়েছেন এভাবে তাদেরকে উত্যক্ত করে একঘেয়েমি দর করছে। ওকে আমাদের সময় দেয়া কি উচিত হবে, হুজুর? রাজা মহান!’

প্রধানমন্ত্রীর কথা রাজা শুনেও না শোনার ভান করছেন (রাজ্য চালাতে তাঁর এই গুণটাই সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে)। তিনি বাস্তব আরেক পাশে বসা শ্যালিকার রূপে মুগ্ধ হয়ে আছেন, একই সঙ্গে নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছেন-ওকেই আমার বিয়ে করা উচিত ছিল, তা না করার অপরাধে এখন আমার অপঘাতে

মরে যাওয়া উচিত, এবং মরার পর ঠাঁই পাওয়া উচিত নরকে।... তবে সাহস করে যদি রানিকে বিষ খাওয়াতে পারি তাহলে আলাদা কথা!

প্রধানমন্ত্রী তাঁর একঘেয়ে বক্তব্য তিন বার পেশ করবেন।

এবার রাজা সাড়া দেবেন, তবে তাঁর শুনতে না পাবার ভান বহাল থাকল। তিনি বলবেন, ‘এত কিছু ভাবতে যাচ্ছেন কেন! প্রাসাদে তো শক্ত ঘাড়ের অভাব নেই, কাজটা যে কোনো একটা ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই তো পারেন!’

‘জি, হুজুর! রাজা মহান!’

এরপর প্রধানমন্ত্রী গুরুত্ব অনুসারে দ্বিতীয় মন্ত্রীকে বলবেন, দ্বিতীয় মন্ত্রী বলবেন তৃতীয় মন্ত্রীকে, তৃতীয় মন্ত্রী হুকুম করবেন তাঁর প্রথম সহকারীকে, প্রথম সহকারী নির্দেশ দেবেন দ্বিতীয় সহকারীকে, এভাবে রাজার আদেশ ক্রমশ নীচে নামতে নামতে গিয়ে পৌঁছুবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বে থাকা এক তরুণীর কাছে, যাকে সবাই পরিপাটি নারী হিসেবে চেনে। কাউকে হুকুম করবে, এমন কেউ নেই তরুণীর, অগত্যা দরজা সামান্য ফাঁক করে তাকেই জিজ্ঞেস করতে হলো: কি চাই?

আগন্তুক তখন তার আর্জি পেশ করে। ওখানেই, দরজার পাশে, অপেক্ষা করতে বলা হয় তাকে—তার আবেদন এক মুখ থেকে আরেক মুখ হয়ে, অবশেষে রাজার কানে পৌঁছায়। রাজা যেহেতু তাঁর প্রিয় দরজায় উপস্থিত হয়ে খাজনা এবং হাজার রকমের উপহার গ্রহণে সব সময় ব্যস্ত থাকেন, তাই উত্তর দিতে অনেক লম্বা সময় লেগে যায় তাঁর। উত্তর দেয়ার সময় ও সুযোগ যখন পান, যেহেতু রাজা তাঁর প্রজাদের মঙ্গল চান এবং তাদেরকে সুখী দেখতে চান, ব্যাপারটাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নেন তিনি—আর্জি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর লিখিত বক্তব্য চেয়ে বসেন। বলাই বাহুল্য যে প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় মন্ত্রীর কাছে এই একই জিনিস চান, লিখিত বক্তব্য। দ্বিতীয় মন্ত্রীও তাই চাইলেন তৃতীয় মন্ত্রীর কাছে। এভাবে শেষ পর্যন্ত আদেশটা পৌঁছাল কাপড় ও ঘরদোর পরিষ্কার করার দায়িত্বে থাকা সেই তরুণীর কানে। আর্জির জবাবে সে কিছু একটা বকিয়ে, তবে জবাবটা কেমন হবে সেটা নির্ভর করবে তার ওই সময়কার মন আর মেজাজের ওপর।

যাই হোক, যে লোক জাহাজ চাইতে এসেছে, দেখা মেল তার বেলায় ঠিক তা ঘটল না। পরিচ্ছন্ন নারী যখন জিজ্ঞেস করল কি চাই গো তোমার, সে কিন্তু আর সবার মতো টাকা-পয়সা, পদ, পদক বা সম্মতি চাইল না; বলল, আমি রাজার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

তরুণী জবাব দিলো: তুমি খুব ভালো করে জানো যে রাজা আসতে পারবেন না। কারণ তিনি তাঁর প্রিয় দরজা প্রাপ্যতে দাঁড়িয়ে উপহার আর খাজনা গ্রহণে ব্যস্ত।

ঠিক আছে, রাজাকে গিয়ে বলো যে তিনি এখানে না আসা পর্যন্ত আমি কোথাও যাচ্ছি না। আমি কি চাই, সেটা জানতে হলে সশরীরে এখানে তাঁকে আসতে হবে।

নিজের কথা বলে আর্জির দোরগোড়ায় গুয়ে পড়ল লোকটা। ঠাণ্ডা লাগছে দেখে একটা চাদর টেনে নিয়ে গায়ে দিলো। এখন যে-ই আর্জির দরজা দিয়ে আসা-যাওয়া করতে চাইবে, ওই লোককে ডিঙিয়ে যেতে হবে তার। সেটা বেশ বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কারণ নিয়ম অনুসারে প্রতিবার মাত্র একজন ওই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের আর্জি পেশ করতে পারবে। এর মানে দাঁড়াল, ওই লোক যতক্ষণ ওখানে গুয়ে থাকবে ততক্ষণ আর কেউ রাজার কাছে কিছু চাইতে বা নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা জানাতে পারবে না।

প্রথমে মনে হতে পারে এই সমস্যা থেকে রাজা লাভবান হবেন, কারণ তুলনায় অনেক কম লোকের চাহিদা মেটাতে হবে তাঁকে—এমনকি কারও কোনও চাহিদাই হয়তো মেটাতে হবে না। ওই দরজায় এমন অনেকে আসে যারা তাঁকে দেখে ভেঁউ ভেঁউ করে কেঁদে ফেলে, ইনিয়ে বিনিয়ে নিজেদের কাঁদুনি গাইতে থাকে—অপ্রীতিকর এ-ধরনের পরিস্থিতি থেকেও বাঁচবেন তিনি। কিন্তু দ্বিতীয় বিবেচনায় দেখা যাবে, লোকসান গুনতে হবে রাজাকেই। উত্তর পেতে অসম্ভব দেরি হচ্ছে দেখলে মানুষ প্রতিবাদ জানাবে, তাতে সামাজিক অসন্তোষ ছড়াবে, গ্রাপ্য নামে দরজা দিয়ে খাজনা আর উপহারের যে শ্রোত রাজপ্রাসাদে ঢোকে সেটার ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

তিন দিন পর অগত্যা বাধ্য হয়ে আর্জির দরজায় হাজির হলেন রাজা, শুনতে চান লোকটা কি চাইছে। দরজা খোলো, পরিচ্ছন্ন নারীকে বললেন তিনি। সে বলল, একটু, নাকি পুরো দরজা?

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন রাজা। ভেবে দেখলেন সামান্য একটু শ্রম দিয়ে নিজের প্রজার সঙ্গে কথা বললে রটে যাবে রাজা বোধহয় ভয় পোচ্ছে। পরিচ্ছন্ন নারী ওঁদের কথাবার্তা শুনবে, এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র সেটা রাজ্যে ছড়িয়ে দেবে সব। সবটুকু খোলো, হুকুম করলেন তিনি।

দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে জাহাজ চাইতে আসা লোকটা লাফ দিয়ে ধাপের ওপর সিঁধে হলো, চাদরটা ভাঁজ করে কাঁধে ফেলল, তারপর অপেক্ষায় থাকল। ইতিমধ্যে তার পেছনে ও দু'পাশে আহুতী লোকজনের বেশ বড়সড় ভিড়

জমে গেছে। প্রজারা দেখতে এসেছে রাজা কেমন দয়া আর উদারতার পরিচয় দেন। হঠাৎ চাঞ্চল্য শুরু হওয়ায় আশপাশের বাড়ি-ঘরের জানালা খুলে গেল, মানুষজন অবাক হয়ে ঝুঁকে পড়ল, কি ঘটছে দেখতে চায়। যে ব্যক্তি রাজার কাছে জাহাজ চাইতে এসেছে, একা সেই শুধু অবাক হয়নি। সে হিসেবী, এবং তার ধারণা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে—তিন দিন পর হলেও সশরীরে আর্জির দরজায় হাজির হতে হয়েছে রাজাকে, এটা জানতে যে তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য এত দৃঢ়তা দেখাতে পারে কোন সে লোক।

যতই কৌতূহলী হন, এত লোকের ভিড় দেখে বিরক্ত বোধ করলেন রাজা, মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে লোকটাকে একের পর এক তিনটে প্রশ্ন করলেন তিনি: কি চাও? যেটা দরকার সেটার কথা সোজাসাপটা বলোনি কেন? তোমার কি ধারণা আমার আর কিছু করার নেই?

লোকটা শুধু তাঁর প্রথম প্রশ্নের জবাব দিলো, আমাকে একটা জাহাজ দিন।

কথাটা শুনে রাজা এতটাই হকচকিয়ে গেলেন যে পরিচ্ছন্ন নারী তাড়াতাড়ি নিজের ব্যবহার করা পুরোনো চেয়ারটা টেনে এনে বসতে দিলো তাঁকে। এই চেয়ারে বসে সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ করে সে, প্রাসাদের আরও অনেক বাড়তি কাজের মতো এটাও করতে হয় তাকে।

চেয়ারে বসে একটু আড়ষ্ট বোধ করছেন রাজা, কারণ তাঁর সিংহাসনের চেয়ে অনেক ছোট এটা। পা দুটোকে নিয়েই বেশি সমস্যা হলো, কোথায় রাখবেন। প্রথমে সামনে লম্বা করে দিলেন, কিন্তু সেটা দেখতে খারাপ লাগছে, শেষমেশ হাঁটু দুটো যতটুকু পারা যায় দু'পাশে মেলে দিলেন।

ওদিকে, যে লোক জাহাজ চাইতে এসেছে, রাজা কখন আবার প্রশ্ন করবেন তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

বসে আরাম পাবার পর রাজা প্রশ্ন করলেন, এই জাহাজ তুমি কেন চাইছ, হে?

লোকটা উত্তর দিলো, জাহাজ চাইছি অচেনা দ্বীপ খুঁজতে বেরুব বলে।  
কিসের অচেনা দ্বীপ! হাসি চেপে জিজ্ঞেস করলেন রাজা।

অচেনা দ্বীপ, আবার বলল লোকটা।

আরে, বোকা নাকি! তুমি জানো না, আর তো কোনও দ্বীপ অচেনা নেই! যেখানে যত দ্বীপ আছে, সব তুমি মানচিত্রে পাবে। জাহাজ নিয়ে যে দ্বীপেই তুমি যাও না কেন, এই আমি তোমাকে বলছি, সেটা অচেনা থাকবে না।

আমি অচেনা দ্বীপই খুঁজতে বেরুব।

রাজা এবার সিরিয়াস হয়ে উঠলেন, জানতে চাইলেন, তুমি কি এই দ্বীপের কথা কাউকে বলতে শুনেছ?

না, কেউ আমাকে কিছু বলেনি।

তাহলে তো বোঝা যাচ্ছে না কেন তুমি জেদ ধরছ যে অচেনা দ্বীপের অস্তিত্ব আছে। যে জিনিস নেই, তুমি সেটা খুঁজতে যাবে বলে আমার কাছে জাহাজ চাইতে এসেছ।

হ্যাঁ, আমি আপনার কাছে জাহাজ চাইতে এসেছি।

তুমি কে হে যে আমি তোমাকে একটা জাহাজ দেবো।

আপনিই বা কে যে আমাকে একটা জাহাজ দিতে অস্বীকার করবেন?

আমি এই রাজত্বের মালিক, সবাই জানে আমি এখানকার রাজা, এবং এই দেশের সব নৌকা আর জাহাজ আমার।

ওগুলো আপনার, ঠিক আছে, কিন্তু তারচেয়ে বেশি আপনিও ওগুলোর।

কী বলতে চাও তুমি? চিন্তিত রাজা প্রশ্ন করলেন।

আমি বলতে চাইছি, ওগুলো ছাড়া আপনি কিছু না, অথচ আপনাকে ছাড়া ওগুলো সাগর পাড়ি দিতে পারবে।

সেটা পারবে আমার হুকুমে, আমার নাবিক আর মাঝি-মাল্লাদের নিয়ে।

কিন্তু আমি আপনার কাছে নাবিক বা মাঝি-মাল্লা চাইনি, আমি শুধু আপনার কাছে একটা জাহাজ চেয়েছি।

আর এই অচেনা দ্বীপের ব্যাপারটা কি হবে, ওটা যদি তুমি খুঁজে পাওই? ওটা কি আমার হবে?

আপনি, হুজুর, শুধু ইতিমধ্যে পরিচিত দ্বীপ সম্পর্কে আগ্রহী।

না, আমি অচেনা দ্বীপ সম্পর্কেও আগ্রহী, একবার সেটা চেনা হয়ে গেলে।

হতে পারে এটা নিজেকে চেনা দ্বীপ বলে স্বীকার করবে না।

তাহলে আমি তোমাকে কোনও জাহাজ দেবো না।

হ্যাঁ, আপনি দেবেন।

ভিড় করা প্রজারা যখন লোকটার এরকম বলিষ্ঠ বক্তব্য শান্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হতে শুনল, উজ্জীবিত এবং অনুপ্রাণিত বেশ ক'রল তারা, তাত্ক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ওই লোকের সমর্থনে নাক গলাবে, যতটা না একাত্ম অনুভব করার, তারচেয়ে বেশি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠবে—দরজা থেকে তাকে সরাতে পারলে তারা নিজেরা রাজার সামনে দাঁড়াতে পারবে, পেশ করতে পারবে যার যার আর্জি। তারা সবাই একযোগে চৈত্যাতে লাগল: ওকে জাহাজ দিন! ওকে জাহাজ দিন!

রাজা মুখ খুলে পরিচ্ছন্ন নারীকে বললেন, প্রাসাদ গ্রহরীদের ডাকো, তারা শৃংখলা আর শান্তি ফিরিয়ে আনুক।

কিন্তু আশপাশের বাড়ি থেকে পিল পিল করে বেরিয়ে এল লোকজন, যোগ দিলো কোরাসে: ওকে জাহাজ দিন! ওকে জাহাজ দিন!

রাজা ভাবলেন এখানে যত বেশিক্ষণ থাকবেন তিনি, ততই ক্ষতি, কারণ তাঁর অনুপস্থিতিতে ওদিকে খাজনা আর উপহারের শ্রোত বন্ধ হয়ে আছে।

হাত তুলে সবাইকে চুপ করার নির্দেশ দিলেন তিনি, তারপর বললেন, ঠিক আছে, আমি তোমাকে একটা জাহাজ দেবো, কিন্তু মাঝি-মাল্লা দিতে পারব না, কারণ চেনা দ্বীপের জন্যে ওদের সবাইকে আমার দরকার হবে।

রাজাকে ধন্যবাদ জানাল লোকটা, যদিও উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের উল্লসিত চিৎকার-চোঁচামেচিতে সেটা চাপা পড়ে গেল। তবে এরপর রাজা যা বললেন সবাই সেটা শুনতে পেলো: জেটিতে চলে যাও, কথা বলো বন্দর প্রধানের সঙ্গে। বলবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি, তোমাকে একটা জাহাজ দিতে বলেছি—এই নাও আমার চিরকুট।

যে ব্যক্তিকে জাহাজ দেয়া হবে চিরকুটটা পড়ল সে। পরিচ্ছন্ন নারীর কাঁধে কাগজ রেখে দু'তিনটে লাইন লিখে তার নীচে সই করেছেন রাজা: এই চিরকুটের বাহককে একটা জাহাজ দেবে। তবে সেটা খুব বড় জাহাজ না হলেও চলবে। দেখবে সেটা যেন নিরাপদ হয়, এবং সাগরে অভিযান চালানোর উপযোগীও হওয়া চাই। আমি চাই না তার কপালে খারাপ কিছু ঘটলে আমার নামকে হানা দিক সে।

উপহার পাওয়ার বিনিময়ে দ্বিতীয়বার ধন্যবাদ দেয়ার জন্য লোকটা যখন মুখ তুলল, রাজা তখন তার কথা শোনার জন্য সেখানে অপেক্ষায় নেই। সে দেখল একা শুধু পরিচ্ছন্ন নারী দাঁড়িয়ে আছে ওখানে—কেন কে জানে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে।

দোরগোড়া থেকে সরে দাঁড়াল লোকটা, বাকি লোকজন যাতে সেখানে পৌঁছতে পারে। সে সরে যেতে লোকজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল, কে আগে যাবে। কিন্তু হয়, ইতিমধ্যে আবার রাজপ্রাসাদের ওই দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। ব্রোঞ্জের কড়া ধরে ঝাঁকাতে লাগল ওরা, ভাবছে পরিচ্ছন্ন নারী দরজা খুলে দেবে। কিন্তু ওখানে নেই সেই তরুণী, নিজের বালতি আর ঝাড়ু নিয়ে চলে গেছে আরেক দিকে।

পরিচ্ছন্ন নারী আরেক দরজা দিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়েছে, যেটার নাম সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত নামের এই দরজা খোলা একটা বিরল ঘটনাই বলতে

হবে। সহজে খোলে না, কিন্তু যখন খোলে তখন ধরে নিতে হবে কেউ একজন খুব কঠিন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পরিচ্ছন্ন নারীর চেহারা চিত্তিত ভাব ছিল, এখন সেটার কারণ পরিষ্কার হচ্ছে। ওই মুহূর্তে প্রাসাদের চাকরি ছেড়ে ওই রহস্যময় লোকের সঙ্গে সাগরে যাবার সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল সে। লোকটা যাচ্ছে জেটিতে, রাজার দেয়া উপহার বুঝে নিতে, তার সঙ্গে সেও যাচ্ছে। সেলাই করে আর কাপড় ধুয়ে, ঘর মুছে আর ঝুল ঝেড়ে জীবনের অনেকটাই দেখা হয়ে গেছে তার। এবার একবার নাহয় কাজ বদল করে দেখুক না। পরিষ্কারের কাজই করবে, তবে এবার কাপড়চোপড় বা ঘরদোর নয়—জাহাজ। আর যাই হোক, সাগরে তাকে অন্তত পানির অভাবে ভুগতে হবে না।

লোকটার কিন্তু কোনও ধারণা নেই ইতিমধ্যে তার কাজ করে দেয়ার অন্তত একজন মানুষ যোগাড় হয়ে গেছে, তার পিছু নিয়ে আসছে সে, জাহাজের ডেক ধোবে, অন্যান্য সমস্ত ধোয়াধুয়ের কাজও করবে, অথচ এখনও সে কাউকে চাকরি দিতে শুরু করেনি। আসলে এভাবেই সাধারণত ভাগ্য আমাদের সঙ্গে খেলে, আমাদের ঠিক পেছনেই থাকে আনন্দ বা সহায়তা, দেখা যাবে আগেই কাঁধ ছোঁয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, নিজেরা তখনও বিড়বিড় করে খেদ প্রকাশ করছি।

খানিক দূর হেঁটে বন্দরে পৌঁছল লোকটা, প্রশ্ন করে জেনে নিলো কোথায় পাওয়া যাবে বন্দর ও জেটি প্রধানকে। অপেক্ষার সময় জেটিতে নোঙর ফেলা ছোটবড় অসংখ্য জাহাজের ওপর চোখ বুলাচ্ছে সে, ভাবছে কে জানে তার কপালে কি রকম জাহাজ জুটবে। রাজা বলে দিয়েছেন জাহাজটা হতে হবে নিরাপদ, এবং সাগরে অভিযান চালানোর উপযোগী।

অল্প একটু দূরে, কিছু ড্রামের আড়াল থেকে পরিচ্ছন্ন নারীও জাহাজগুলোর ওপর চোখ বুলাচ্ছে। আমার ওই বোটটা পছন্দ, একটাকে পছন্দ করল সে, যদিও জানে তার পছন্দ বা অপছন্দে কিছু আসে যায় না। তাকে তো এমনকি কাজ করানোর জন্য রাখাও হয়নি। তবে, সে ভাবল, প্রথমে বন্দর প্রধান কি বলেন শোনা দরকার।

খবর পেয়ে বন্দরপ্রধান পৌঁছালেন, রাজার পাঠানো চিরকুট পড়লেন, লোকটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলালেন, তারপর এমন একটা প্রশ্ন করলেন যেটা তাকে গাফলতি করে রাজা জিজ্ঞেস করেছেন: তোমার কি সাগরে জাহাজ চালানোর অভিজ্ঞতা আছে? নাবিক হবার জন্যে ট্রেনিং নিয়েছ?

লোকটা জবাব দিলো, আমি সাগরে গিয়ে শিখে নেবো।

জেটি প্রধান বললেন, আমি এটা সমর্থন বা সুপারিশ করি না। আমি একজন ক্যাপটেন, কাজেই পুরোনো একটা জাহাজ নিয়ে কক্ষনো সাগরে যাব না।

তাহলে দেখেগুনে ভালো একটা জাহাজ...না, সেরকম না; আপনি আমাকে এমন একটা জাহাজ দিন যেটাকে আমি সমীহ করতে পারব, সেটাও আমাকে সমীহ করবে।

এই তো নাবিকের মতো কথা হলো, অথচ তুমি বাপু মোটেও নাবিক নও।

আমি যদি নাবিকের মতো কথা বলে থাকি, তাহলে নিশ্চয়ই আমি একজন নাবিক।

জেটি প্রধান রাজার চিরকুটটা আবার পড়লেন। তারপর জানতে চাইলেন, তুমি আমাকে জানাতে পারো কি কারণে একটা জাহাজ দরকার তোমার?

জাহাজ নিয়ে আমি অচেনা দ্বীপ খুঁজতে যাবো।

অচেনা দ্বীপ বলে আর কিছু নেই।

রাজাও আমাকে তাই বলেছেন।

দ্বীপ সম্পর্কে তিনি সব কিছু আমার কাছ থেকে শুনে বলেন।

এটা খুব অদ্ভুত যে আপনি সাগরের একজন মানুষ হয়ে আমাকে শোনাচ্ছেন অচেনা দ্বীপ বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আমি ডাঙার একজন মানুষ, অথচ আমিও জানি যে এমনকি চেনা দ্বীপও অচেনা থেকে যায় যদি না সেখানে আমরা পা না ফেলি।

কিন্তু, আমার যদি বুঝতে ভুল না হয়ে থাকে, কারও পা পড়েনি এমন দ্বীপ খুঁজতে যাচ্ছ তুমি।

হ্যাঁ, ওখানে পৌঁছালে সেটা আমি বুঝতে পারব।

যদি ওখানে পৌঁছাও।

কেন, যাবার পথে জাহাজডুবির ঘটনা ঘটে না? আমার বেলা সেরকম যদি কিছু ঘটে, আপনি বন্দরের প্রধান হিসেবে রেকর্ড রাখবেন—অমুক সাগরের অমুন জায়গা পর্যন্ত পৌঁছুতে পেরেছিলাম আমি।

বলতে চাইছ তুমি সব সময় কোথাও না কোথাও পৌঁছাও?

এটা যদি আপনি না জানেন তাহলে এই মানুষটা আপনি নিশ্চয়ই।

বন্দরপ্রধান বললেন, যেমনটি দরকার সেরকম একটা জাহাজ তুমি পাবে। ওই বোট অনেক কাল আগের, সবাই যখন অচেনা দ্বীপ খুঁজতে বেরিয়ে পড়ত, তাই ওটার অভিজ্ঞতাও অনেক বেশি। এমনকি কিছু অচেনা দ্বীপ ওটা খুঁজেও দিয়েছিল। ওই যে, ওটা।



বন্দরপ্রধান হাত তুলে একটা জাহাজ দেখালেন। তারপর আবার বললেন, ওটা একটা ক্যারাভেল-হালকা, ছোট, কিন্তু ছোটো খুব জোরে।

কাকতালীয়ই বটে, এই জাহাজটাই পছন্দ করেছে পরিচ্ছন্ন নারী। বন্দরপ্রধান হাত তুলে কোন জাহাজটাকে দেখাচ্ছেন, আড়াল থেকে লক্ষ করল সে। ড্রামের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে, ‘ওটা আমার জাহাজ! ওটা আমার জাহাজ!’ বলে চোঁচাচ্ছে।

তার এই মালিকানা দাবি যতই অস্বাভাবিক আর অহেতুক হোক, সেটা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতেই দেখতে হবে, কারণ সত্যি সত্যি ওটার মালিকানা সে চাইছে না।

লোকটা বলল, জাহাজটা বেশ পুরোনো।

তাই মেরামতও করা হয়েছে অনেক বার, এবং প্রতিবার মেরামত করার পর দেখা গেছে ওটা আগের মতো নেই, বদলে গেছে। ওটার মাস্তুল আর পাল খুব ভালো। অচেনা দ্বীপ খুঁজতে গেলে ওগুলো ছাড়া তোমার চলবে না।

এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না পরিচ্ছন্ন নারী। সে বলল, আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো, ওটা আমার খুব পছন্দের জাহাজ।

লোকটা বলল, কিন্তু তুমি কে?

কি আশ্চর্য, আমাকে তোমার মনে নেই?

না, নেই।

আমি সব কিছু পরিচ্ছন্ন রাখি, তাই আমার নাম পরিচ্ছন্ন নারী।

তুমি কি কি পরিচ্ছন্ন রাখো?

রাজার প্রাসাদ। রাজকীয় পোশাক-আশাক। যে মেয়েটা আর্জির দরজা খুলে দেয়, আমি সেই মেয়ে।

তাহলে তুমি তোমার কাজে ফিরে যাওনি কেন? ওখানে ধোয়ামোছা আর দরজা খোলাই তো তোমার কাজ।

কারণ যে দরজা সত্যি আমি খোলা দেখতে চেয়েছিলাম সেগুলো সব ইতিমধ্যে খুলে গেছে, আর তাই এখন থেকে আমি শুধু জাহাজ পরিচ্ছন্ন করব।

তারমানে তুমি আমার সঙ্গে অচেনা দ্বীপ খুঁজতে যেতে চাও? আমি সিদ্ধান্ত নামের দরজা দিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসেছি।

সেক্ষেত্রে, যাও, জাহাজটা একবার ঘুরেফিরে দেখো একতদিন ব্যবহার করা হয় না, নিশ্চয়ই অনেক ধুলোবালি জমেছে, তুমি একটা ধোলাই হওয়া দরকার। তবে গাংচিল সম্পর্কে সাবধান, ওদেরকে বিশ্বাস করা যায় না।

তুমি আমার সঙ্গে এসে দেখতে চাও না তোমার জাহাজের ভেতরটা কেমন?

তুমি না তখন বললে ওটা তোমার জাহাজ।

কি বলে ফেলেছি, সেজন্যে দুঃখিত। কথাটা আমি বলেছিলাম ওটা আমার পছন্দ হয়েছে বলে।

মালিকানার সবচেয়ে ভালো ধরন সম্ভবত পছন্দ, আর পছন্দের সবচেয়ে বাজে ধরন মালিকানা।

ওদের আলাপে বাধা দিলেন বন্দর প্রধান। বললেন, মালিকের হাতে জাহাজের চাবি তুলে দিতে চাই আমি। সেটা কে, নির্ভর করে তোমাদের ওপর। দুজনের যেই মালিক হও, আমার খারাপ বা ভালো লাগার কোনও ব্যাপার নেই।

জাহাজেরও তাহলে চাবি আছে? জিজ্ঞেস করল লোকটা।

জাহাজে চড়তে চাবি লাগে না, না; তবে জাহাজের ভেতরে কিছু আলমারি, দেরাজ, লকার ইত্যাদি আছে, আরও আছে লগবুক সহ ক্যাপটেনের ডেস্ক।

সব এই মেয়েটার দায়িত্বে থাকল, আমাকে এখন মাঝি-মাল্লার খোঁজে যেতে হচ্ছে। কথা শেষ করে চলে গেল লোকটা।

চাবি নিয়ে জাহাজে চড়ল পরিচ্ছন্ন নারী। ওখানে দুটো জিনিস তার খুব উপকারে লাগল—একটা রাজপ্রাসাদ থেকে নিয়ে আসা ঝাড়ু, আরেকটা গাংচিল সম্পর্কে সতর্ক থাকার পরামর্শ। জাহাজের গায়ে সেঁটে থাকা গ্যাঙপ্ল্যাক্স ধরে মাত্র অর্ধেকটা উঠেছে, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কুৎসিত পাখিগুলো, তাদের কর্কশ চৈতানিতে কান পাতা দায়, ঠোঁট এমনভাবে খুলে রেখেছে যেন ওখানেই খেয়ে ফেলবে মেয়েটাকে। কিন্তু ওগুলোর কোনও ধারণা ছিল না কার সঙ্গে লাগতে গেছে। পরিচ্ছন্ন নারী হাতের বালতি নামিয়ে রাখল, চাবির গোছা গুঁজল বুকের ভাঁজে, গ্যাঙপ্ল্যাক্সে শক্ত হয়ে দাঁড়াল, তারপর বন বন করে চারদিকে ঘোরাল ঝাড়ুটা। চিল বাহিনী পালাতে দিশে পেলো না।

জাহাজে ওঠার পর গাংচিলদের ওরকম খেপে থাকার কারণ দেখতে পেলো মেয়েটা। অনেক দিন খালি পড়ে থাকায় জাহাজের সবখানে বাসা তৈরি করা হয়েছে, সেগুলোর বেশিরভাগ পরিত্যক্ত হলেও, অনেক বাসায় বাসার ঝুটেছে, আবার কিছু বাসায় ডিমে তা দেয়া চলছে। সদ্য ফোটা বাচ্চাগুলো হাঁ করে আছে—জানা কথা, খাবারের আশায়।

এসব নاهয় ঠিক আছে, কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি তেজস্বরকম থাকলে চলবে না। তোমাদের বাসা তোমরা অন্য কোথাও সরিয়ে দিয়ে যাও। জাহাজকে তো রওনা হতে হবে। শোনো তাহলে, আমরা অচেনা ঝাঁপ খুঁজতে বেরোচ্ছি, বুঝলে! এটাকে মুরগির খাঁচা মনে হলে তো চলবে না।

খালি বাসাগুলো পানিতে ফেলে দিলো মেয়েটা, বাকিগুলো আপাতত থাকল। তারপর কোমরে কাপড় পেঁচিয়ে ডেক পরিষ্কার করতে লেগে গেল সে। নোংরা কাজটা শেষ করার পর লকার খুলে সতর্কতার সঙ্গে পালগুলো পরীক্ষা করল। অনেক দিন ব্যবহার না করায় পালগুলোর কিনারা ভাঁজ খেয়ে গেছে, কোথাও কোথাও সুতো উঠে গেছে-সেলাই করতে হবে। পাল হলো একটা জাহাজের পেশি। আমরা শুধু ওগুলোকে বাতাসে ফুলতে আর টান টান হতে দেখি, কিন্তু সব পেশির মতো নিয়মিত ব্যবহার করা না হলে ওগুলোও দুর্বল হয়, নেতিয়ে পড়ে। যাক, সেলাইয়ের কাজ জানা থাকায় সব ঠিক করে নিতে তার কোনও সমস্যা হবে না।

কিন্তু বাকি লকার পরীক্ষা করে হতাশ হতে হলো পরিচ্ছন্ন নারীকে। গানপাউডারের লকারে গানপাউডার নেই। কালো কিছু ধুলো চোখে পড়ল, ইঁদুরের শুকনো বিষ্ঠা বলে সন্দেহ হলো তার। সবচেয়ে যেটা চিন্তার বিষয়, খাদ্যবস্তু রাখার লকারে খাবার কোনও জিনিসই নেই। চিন্তাটা নিজের জন্য না, কারণ রাজার প্রাসাদে এঁটোটাই খেতে দেয়া হতো তাকে, তাও পরিমাণে খুব কম। চিন্তা ওই লোককে নিয়ে, এই জাহাজ যাকে দেয়া হয়েছে।

একটু পরই সূর্য নেমে যাবে। পেটে প্রচণ্ড খিদে নিয়ে ফিরে আসবে লোকটা-সব পুরুষই যেমন ঘরে ফেরে খিদে নিয়ে, যেন একা শুধু তাদেরই পেট আছে, আর সেটা নিয়মিত ভরারও প্রয়োজন। তার ওপর সে যদি আবার মাঝি-মাল্লা যোগাড় করে আনে, তাহলে তো কথাই নেই। এ-ধরনের লোকজন সব সময় অসহ্য খিদেতে ভোগে। অথচ, মেয়েটা ভাবল, আমি জানি না তাদেরকে কি খেতে দেবো।

তার এত চিন্তা না করলেও চলত। সাগরে সূর্য মাত্র ডুবছে, জেটির শেষ মাথায় জাহাজ উপহার পাওয়া লোকটাকে দেখা গেল। সে একা, মনমরা, তবে তার হাতে একটা প্যাকেট রয়েছে।

গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক ধরে নিচে নেমে এসে তার জন্য অপেক্ষায় থাকল মেয়েটা। তবে সারাটা দিন কেমন গেছে, এ-কথা বলার জন্য মুখ খোলার আগেই লোকটা তাকে বলল, চিন্তা করো না, আমি দুজনের জন্যেই প্রচুর খাবার এনেছি।

কিন্তু মাঝি-মাল্লা? জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

সেটা তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ, কেউ আসেনি।

কিন্তু তাদের দু'একজন অন্তত এ-কথা তো বলেছে যে তারা আসবে?

তারা বলেছে অচেনা দ্বীপ বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আর যদি থাকেও, বাড়ির আরাম আর স্বস্তি ছেড়ে কোথাও যাবার ইচ্ছে নেই তাদের। কাজ করতে

হলে যাত্রীবাহী যে জাহাজটা সমুদ্র পাড়ি দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে সেখানে কাজ করবে। অন্ধকার সাগরে ঝুঁকি নিতে রাজি নয়।

তুমি তাদের বলোনি সাগর চিরকালই অন্ধকার? অচেনা দ্বীপের কথাও বুঝিয়ে বলোনি?

অচেনা দ্বীপের কথা আমি কি করে তাদের বোঝাব, বলো? যেখানে আমি নিজেই জানি না সেটা কোথায় আছে।

কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই জানো যে ওটার অস্তিত্ব আছে।

যেমন আমি নিশ্চিত সাগর কালো। এই মুহূর্তে, এই উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে পানির বিস্তারকে মনে হচ্ছে রত্নের মতো নীলচে-সবুজ, আকাশে যেন আগুন লেগেছে, আমার কাছে তো একেবারেই কালো মনে হয় না। স্রোত চোখের ভুল, মায়া। দ্বীপ কখনও কখনও পানির গায়ের ওপর ভাসে, কিন্তু তা সত্যি নয়।

মাঝি-মাল্লা না থাকলে কি করে সব সামলাবে তুমি?

তা এখনও আমি জানি না।

আমরা এখানে বসবাস করতে পারি, বন্দরে বন্দরে নোঙর ফেললে ধোয়ার মতো অনেক জাহাজ পেয়ে যাবো। আর তুমি...

আমি...

তুমি নিশ্চয় কিছু জানো, কাজটাজ শিখেছ, তোমারও তো পেশা আছে...

‘তা আছে, ছিল, যদি প্রয়োজন হয় থাকবে, কিন্তু আমি চাই অচেনা দ্বীপ খুঁজে বের করি। ওই দ্বীপে পৌঁছানোর পর জানতে চেষ্টা করব আমি কে।

তুমি সেটা জানো না?

নিজের ভেতর থেকে যতক্ষণ না তুমি বেরুতে পারছ, ততক্ষণ আবিষ্কার করতে পারবে না কে তুমি।

রাজার দার্শনিক, তাঁর যখন কিছু করার থাকত না, আমার কাছে এসে বসতেন, আমাকে সেলাইয়ের কাজ করতে দেখতেন। মাঝে সাজে দর্শনও আওড়াতেন। প্রায়ই তাঁকে বলতে শুনতাম, প্রতিটি মানুষ একটা দ্বীপের মতো। কিন্তু আমি একটা মেয়েমানুষ, তাঁর এসব কথা বুঝতামও না। ভালো করে শুনতামও না। তুমি কি ভাবো? দ্বীপ দেখতে যেতে হলে দ্বীপ ছেড়ে যেতে হবে? আমরা নিজেদেরকে দেখতে পাবো না, যতক্ষণ না নিজেদের কাছ থেকে মুক্ত হতে পারছি?

তুমি বলতে চাইছ নিজেদের কাছ থেকে যতক্ষণ পালাতে না পারছ।

না, দুটো এক জিনিস হলো না।

আকাশের আগুন দ্রুতই নিভে আসছে, পানি হঠাৎ করে বেগুনি চেহারা পেয়েছে, এখন এমনকি পরিচ্ছন্ন নারীরও সন্দেহ হবে সাগর সত্যি হয়তো কালো, অন্তত দিনের নির্দিষ্ট একটা সময়ে তো বটেই।

লোকটা বলল, দর্শন রাজার দার্শনিকের কাছেই থাক, এই কাজের জন্যেই তাঁকে বেতন দেয়া হয়। এসো, আমরা খেতে বসি।

কিন্তু মেয়েটা তাতে রাজি হলো না। সে বলল, না, প্রথমে তোমাকে নিজের জাহাজ ঘুরে দেখতে হবে। তুমি শুধু বাইরে থেকে দেখেছ।

ওটাকে তুমি কি অবস্থায় পেলো?

কিছু পাল মেরামত করতে হয়েছে।

খোলে নেমেছিলে, জাহাজে কি খুব বেশি পানি আছে?

খোলের তলায় কিছু পানি আছে, কলকল ছলছল করতে শুনেছি। তবে সেটা স্বাভাবিক।

এসব তুমি শিখেছ কোথায়?

এমনি শিখে ফেলেছি।

কিন্তু কিভাবে?

তুমি যেমন বন্দর প্রধানকে বললে, সাগরে বেরিয়ে জাহাজ চালানো শিখে ফেলবে-ওভাবে।

আমরা তো এখনও সাগরে বেরোইনি।

তা বেরোইনি, তবে পানিতে আছি।

আমার বিশ্বাস, সাগরে চলাচলের ক্ষেত্রে সত্যিকার শিক্ষক আছে দুজন-একটা সাগর, আরেকটা জলযান।

তুমি আকাশের কথা ভুলে যাচ্ছ।

হ্যাঁ, অবশ্যই, আকাশও। বাতাস। মেঘ। আকাশ। হ্যাঁ, আকাশ।

গোটা জাহাজ, একটা ক্যারাভেল, ঘুরে দেখতে পনেরো মিনিটও লাগল না ওদের। খুব বেশি হাঁটার সুযোগ নেই।

ভারি সুন্দর, মন্তব্য করল লোকটা। কিন্তু এটা চালানোর মতো যথেষ্ট লোকজন আমি যদি যোগাড় করতে না পারি, বাধ্য হয়ে আমাদের আবার রাজার কাছে ফিরে যেতে হবে, বলতে হবে এটা আর আমার দরকার নেই।

একটা সত্যি কথা বলি তোমাকে। এই তুমি প্রথম অধার সামনে পড়েছ, আর তাতেই হাল ছেড়ে দিতে চাইছ।

প্রথম বাধা ছিল রাজার জন্যে তিনদিন অপেক্ষা করা, কিন্তু তখন আমি হাল ছাড়িনি।

আমাদের সঙ্গে যেতে আত্মহ আছেন এমন মাঝি-মাল্লা যদি নাই পাই, সেক্ষেত্রে আমরা নিজেরাই ম্যানেজ করে নেবো।

তুমি পাগল, মাত্র দুজন মানুষ এরকম একটা জাহাজ চালাতে পারে না, তা সে যতই ছোট হোক। আমাকে তো সব সময় জাহাজের হুইল ধরে থাকতে হবে। আর তুমি...তুমি... আমি এমনকি ব্যাখ্যাটা শুরুই করতে পারছি না...

ঠিক আছে, পরে দেখা যাবে। এখন চলো খেতে বসি।

কোয়ার্টার ডেকে উঠল ওরা। লোকটা এখনও প্রতিবাদ করছে, বলছে মাত্র দুজন মানুষ একটা জাহাজ চালাবার কথা ভাবা পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। তার সঙ্গিনী খাবারের প্যাকেটটা খুলল। তা থেকে বের হলো রুটি, ছাগলের দুধ দিয়ে তৈরি পনির, কিছু পাকা জলপাই আর এক বোতল ওয়াইন। চাঁদ এখন সাগর থেকে মাত্র এক হাত ওপরে। আশপাশের জাহাজ আর মূল মাস্তুলের ছায়া এসে পৌঁছেছে ওদের পায়ে কাছের কাছে।

আমাদের ক্যারাভেল সত্যি খুব সুন্দর, মেয়েটা বলল। তারপরই শুধরে নিলো নিজেকে: আমি বলতে চাইছি তোমার ক্যারাভেল। অনেক দিন পর্যন্ত এটা আমার ক্যারাভেল হবে না। এরকম চিন্তা করা আমার উচিত নয়। তুমি চালাও আর নাই চালাও, এটা তোমার, রাজা এটা তোমাকে দিয়েছেন।

হ্যাঁ, কিন্তু এটা আমি তাঁর কাছে এজন্যে চেয়েছি যাতে অচেনা দ্বীপের খোঁজে রওনা হতে পারি।

কিন্তু এসব কাজ মুহূর্তের মধ্যে হয় না, শুরু করতেও সময় লাগে। আমার দাদু সবসময় বলতেন কেউ যদি সাগরে যেতে চায় তাকে আগে ডাঙায় বসে প্রস্তুতি নিতে হবে, তিনি নিজে এমনকি নাবিকও ছিলেন না।

মাঝি-মাল্লা না থাকলে আমরা রওনা হতে পারব না।

তাই বলেছ তুমি।

এ-ধরনের একটা অভিযানে বেরোতে চাইলে এক হাজার একটা জিনিসের দরকার হবে তোমার, যেহেতু আমরা জানি না এই যাত্রা কোথায় নিয়ে ফেলবে আমাদের।

অবশ্যই। আর তারপর সঠিক মরশুমের অপেক্ষায় থাকতে হবে, অপেক্ষায় থাকতে হবে মনের মতো জোয়ারের জন্যে, তারপর এক সমুদ্র জেটিতে ভিড় করবে লোকজন, সবাই তারা আমাদের যাত্রা শুভ হোক বলে প্রার্থনা করবে...

তুমি আমাকে নিয়ে কৌতুক করছ।

মোটেও না। যে মানুষ আমাকে সিদ্ধান্ত নেয়ার দরজা দিয়ে রাজপ্রাসাদ থেকে বের করে এনেছে আমি তাকে নিয়ে কৌতুক করতে পারি না।

আমাকে মাফ করো।

যাই ঘটুক না কেন, আমি আর কোনও দিন ওখানে ফিরে যাব না।

চাঁদের আলো এখন সরাসরি পরিচ্ছন্ন নারীর মুখে এসে পড়ছে।

সুন্দর, সত্যি সুন্দর, ভাবল লোকটা, এবং এই মুহূর্তে সে উপহার পাওয়া ক্যারাভেলের কথা ভাবছে না।

আর মেয়েটা...সে কিছুই ভাবছে না। তার যত ভাবনা ছিল সব ভেবে নিয়েছে ওই তিনদিনে: বার বার, খানিক পরপর, আর্জির দরজা খুলে যখন দেখেছে লোকটা এখনও ওখানে অপেক্ষা করছে কিনা।

ঝুটি বা পনিরের একটা কণাও পড়ে থাকল না, না পড়ে থাকল ওয়াইনের একটা ফোঁটা। জলপাইয়ের বিচিগুলো তারা সাগরে ফেলে দিলো। আবার ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে উঠল ডেক। এই সময় ওদেরকে চমকে দিয়ে কাছাকাছি কোনও স্টিমশিপ থেকে সাইরেন বেজে উঠল। এর মানে হলো, ওটা রওনা হচ্ছে।

মেয়েটা বলল, আমাদের যখন সময় হবে, আমরা এত শব্দ করব না।

ওরা বন্দরের ভেতর দিকে রয়েছে, তারপরও স্টিমশিপ পাশ কাটানোর সময় ছোট ছোট ঢেউ সামান্য দুলিয়ে দিয়ে গেল ওদের ক্যারাভেলকে।

লোকটা বলল, তবে আমরা অবশ্যই এরচেয়ে বেশি দোলা দিয়ে যাব।

দুজনেই হেসে উঠল। তারপর আর কেউ কিছু বলছে না।

খানিক পর, দুজনের একজন, শুতে যাবার প্রসঙ্গটা তুলল—এবার শুতে গেলে হয়, তবে বলছি না যে আমার ঘুম পেয়েছে।

অপরজন রাজি হলো। তবে স্বীকার করল, তারও ঘুম পায়নি।

তারপর আবার চুপ করে থাকল দুজন।

চাঁদ আরও ওপরে উঠছে। এক সময় মেয়েটা বলল, নিচে বান্ধ আছে, শুতে হলে ওখানে যেতে হবে।

লোকটা বলল, হ্যাঁ।

তখনই উঠল ওরা, ধাপ বেয়ে ডেকের নিচে নামল।

নিচে নামার পর মেয়েটা বলল, কাল আবার দেখা হবে, আমি ওদিকে যাচ্ছি।

লোকটাও উত্তরে বলল, ঠিক আছে, আমি ওদিকে যাচ্ছি, কাল আবার দেখা হবে।

তারা পোর্ট বা স্টারবোর্ড বলল না, কারণ প্রকৃত এই যে কৌশলটা তাদের দুজনেরই জানা আছে।

মেয়েটা ঘুরে ফিরে এল, বলল, আরে, আমার একদম মনে নেই। সে তার অ্যাগ্ননের পকেট থেকে দুটো আধপোড়া মোমবাতি বের করল। বলল, ঝাড়মোছ করার সময় এগুলো আমি পেয়েছি। কিন্তু আমার কাছে দেশলাই নেই।

আমার কাছে আছে, লোকটা বলল।

দু'হাতে ধরা দুটো মোম বাড়িয়ে ধরল মেয়েটা। দেশলাই জ্বালল তার সঙ্গী, সাবধানে এক এক করে মোমের সুতো ধরালো। জোড়া মোমের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মেয়ের মুখ। লোকটা কি ভাবছে, তা আর বলার প্রয়োজন নেই—ও অসম্ভব সুন্দর।

তবে মেয়েটা এরকম ভাবছে: এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে নিজের চোখ দিয়ে সে শুধু অচেনা দ্বীপই দেখতে পাবে।

এটা শুধু একটা উদাহরণ যে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের চোখের দৃষ্টি কতটুকু ভুল অনুবাদ করতে পারে, বিশেষ করে তাদের যখন সবমাত্র পরিচয় হয়।

মেয়েটা ওর হাতে একটা মোম ধরিয়ে দিলো, বলল, তাহলে কাল আবার দেখা হচ্ছে, ভালো একটা ঘুম দাও।

লোকটাও তাকে এই একই কথা বলতে চাইল, তবে অন্যভাবে: তুমি ঘুমের মধ্যে মিষ্টি স্বপ্ন দেখো।

পরে, নিচের ব্যাঙ্কে শুয়ে, লোকটার মনে হলো আরও মজার এবং অর্থবহ কিছু বলা উচিত ছিল তার। যেমনটি হওয়া উচিত কোনও লোক যখন একটা মেয়ের সঙ্গে একা থাকে। সে ভাবল, ও কি এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে? ওর হয়তো ঘুম আসতে দেরি হয়। দেরি হয় ধরে নিয়ে কল্পনায় আমি তাকে খুঁজতে বেরোলাম। ওকে খুঁজছি কিন্তু কোথাও পাচ্ছি না। আমরা দুজনেই তাহলে বিরাট একটা জাহাজের ভেতর হারিয়ে গেছি।

ঘুম ভারি দম্প জাদুকর। জিনিসের আকার-আকৃতি আর ধরন-ধারণ বদলে দেয়, বদলে দেয় একটার সঙ্গে আরেকটার দূরত্ব। মানুষকে আলাদা করে ফেলে। আবার উল্টোটাও কি সত্যি নয়? ওরা একজনের পাশে আরেকজন শুয়ে আছে। এই সময়, এই রাত আর এই চাঁদ কিভাবে যেন এক এক করে ফেলেছে ওদেরকে। যদিও পরস্পরকে কোনও রকমে দেখতে পাচ্ছে ওরা। মেয়েটা শুয়ে আছে তার কাছ থেকে মাত্র ক'ফুট দূরে, কিন্তু সে ওর দৃশ্য পাচ্ছে না, অথচ পোর্ট থেকে স্টারবোর্ডে যাওয়াটা কত সহজ।

লোকটা কামনা করেছিল মেয়েটা স্বপ্ন দেখুক, কিন্তু স্বপ্ন যা দেখার সে নিজেই দেখছে। সে দেখছে তার ক্যারাভেল খোলা সাগর ধরে সবেগে ছুটছে।



প্রবল বাতাসে ফুলে আছে তিনটে পালই। জাহাজের নাক উঁচু উঁচু টেউ কেটে এগোচ্ছে। সে-ই চালাচ্ছে জাহাজ, মাঝি-মাল্লারা সব ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। এই মাঝি-মাল্লারা এখানে কেন এসেছে তার কোনও ধারণা নেই। এরাই তো তারা, যাদেরকে তার সঙ্গে অচেনা দ্বীপ খুঁজতে যেতে রাজি করানো যায়নি। সম্ভবত তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার পর অনুশোচনা জেগেছে তাদের মনে।

লোকটা আরও দেখল, ডেকে কিছু পশু-পাখি চরে বেড়াচ্ছে-হাঁস, খরগোস, মুরগি, ছাগল, গোরু। কবে বা কখন ওগুলোকে জাহাজে তোলা হয়েছে মনে করতে পারছে না সে। কিন্তু ঘটনা যে ঘটেছে সেটা তো পরিষ্কারই দেখতে পাচ্ছে। ওগুলো যে এখানে থাকবে, এটাই যেন স্বাভাবিক, কারণ অচেনা দ্বীপটা মরণভূমিও তো হতে পারে, যেমনটি অতীতে বেশ কয়েকবার ঘটতে দেখা গেছে।

খোলের গভীর গর্ত থেকে ঘোড়াদের চিহ্নি-চিহ্নিহি কোরাস ভেসে আসতে শুনেছে সে। বাঁড় হুঙ্কার ছাড়ছে। গাধা ব্যা ব্যা করছে। ওরা ভার বহন করতে ওস্তাদ। কিন্তু ওগুলো সব এল কখন। ছোট একটা ক্যারাভেলে ওগুলোর জায়গাই বা হচ্ছে কিভাবে, যেখানে মাঝি-মাল্লাদেরই জায়গা দেয়া দুষ্কর। তারপর সে দেখল জাহাজে বেশ কিছু মহিলাও আছে, প্রত্যেকে তারা কোনও-না-কোনও কাজে ব্যস্ত।

এটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। কারণ বাস্তব জীবনে এভাবে কেউ ভ্রমণ করে না। জাহাজের হুইল ধরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা পরিচ্ছন্ন নারীর খোঁজে চারদিকে তাকাল, কিন্তু তাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না।

হতে পারে সে হয়তো ডেস্ক ধোয়া-মোছার শক্ত কাজটা করার পর স্টারবোর্ডের ওদিকে একটা বান্ধে বিশ্রাম নিচ্ছে। উঁহু, না, ভাবল সে। আমি আসলে নিজেকে বোকা বানাতে চেষ্টা করছি। আমার মন জানে, কিভাবে জানল বলতে পারব না, একেবারে শেষ মুহূর্তে আমার এদিকে না আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। তারপর জাহাজ থেকে লাফ দিয়ে জেটিতে নেমেছে, চিৎকার করে বলেছে, শুভ বিদায়! আমি চলে যাচ্ছি! কারণ শুধু অচেনা দ্বীপ ছাড়া আর কিছু দেখতে রাজি নয় তোমার চোখ।

কিন্তু ওগো মেয়ে, কথাটা সত্যি নয়। এই দেখো তোমার চোখ এখন শুধু তোমাকেই খুঁজছে, কিন্তু কোথাও পাচ্ছে না।

ঠিক এই সময় আকাশে প্রচুর মেঘ চলে এল, এবং তখনই এল ঝামঝাম বৃষ্টি। আর বৃষ্টি পেয়ে ডেকের একধারে মাটিভর্তি সারি সারি বস্তা থেকে চারা গজাতে শুরু করল। অচেনা দ্বীপে কি পাওয়া যায় না যায় ভেবে বস্তায় ভরে তারা সব

ধরনের বীজই নিয়ে এসেছে-সেখানে তারা গোলাপ-জুঁই-চামেলি যেমন ফোটাতে পারবে, তেমনি ফলাতে পারবে গম, চাল, ভুট্টা থেকে শুরু করে সব ধরনের ফল, তরকারি, শাক-সবজিও।

হুইলে দাঁড়ানো লোকটা ডেকে বিশ্রামরত মাঝি-মাল্লাদের জিজ্ঞেস করল, মানুষের বসতি নেই এমন কোনও দ্বীপ এখন পর্যন্ত তাদের চোখে পড়েছে কিনা।

জবাবে তারা জানাল, কোনও দ্বীপই তাদের চোখে পড়েনি। তবে যেকোনও দ্বীপ পেলেই হলো, সেখানে নোঙর ফেলার সুযোগ থাকলে, নেমে পড়বে তারা। সেখানে অবশ্য সরাইখানা থাকতে হবে, যেখানে তারা গলা ভেজাতে পারবে, শুতে পারবে-এখানে সে সুযোগ নেই তাদের। এখানে এক জায়গায় এত লোক জড়ো হয়ে থাকায় তাদের খুব কষ্ট হচ্ছে।

হুইলে থাকা লোকটা জিজ্ঞেস করল, তাহলে অচেনা দ্বীপের কি হবে?

অচেনা দ্বীপের অস্তিত্ব নেই। ওটা শুধু তোমার মাথায় একটা আইডিয়া হয়ে আছে।

আমার যাত্রায় বিঘ্ন সৃষ্টি না করে তোমাদের উচিত ছিল শহরে পড়ে থাকা।

কিভাবে ভালো থাকা যায় তার সন্ধানে ছিলাম আমরা, তোমার লোক লাগবে শুনে সুযোগ নিতে চলে এসেছি।

তোমরা মাঝি-মাল্লা নও।

কোনও দিন ছিলাম না।

কিন্তু মাঝি-মাল্লা ছাড়া এই জাহাজ আমি একা চালাতে পারব না।

এটা তোমার ভাবা উচিত ছিল রাজার কাছে জাহাজ চাইতে যাবার আগে।  
কিভাবে জাহাজ চালাতে হয়, এটা তোমাকে সাগর শেখাবে না।

এই সময় হুইলে দাঁড়ানো লোকটা কাছাকাছি দূরত্বে জমিন দেখতে পেলো। সে ওটাকে দেখতে না পাবার ভান করে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করছে, মনে মনে ভাবছে-আমি ভুল দেখছি! কোথায় ডাঙা!

কিন্তু ডেকে বসা লোকগুলো, যারা মাঝি-মাল্লা নয়, তারা প্রতিবাদ করল। চিৎকার করে বলল, আরে, এই দ্বীপ তো মানচিত্রে নেই! তুমি যদি ওখানে আমাদের না নামতে দাও, তোমাকে আমরা খুন করব।

তারপর, ক্যারাভেল নিজে থেকেই, ওই ডাঙার দিকে ঘুরে গেল, প্রবেশ করল বন্দরে, থামল জেটির পাশে। তোমরা এখন নামতে পারো, হুইলে দাঁড়ানো লোকটা বলল।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই তারা জাহাজ থেকে নেমে গেল। প্রথমে মেয়েরা, তাদের ৭৬ নিয়ে পুরুষরা। কিন্তু তারা শুধু একা গেল না, যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে

গেল হাঁস-মুরগি, খরগোস, গোরু-ছাগল, গাধা, ঘোড়া ইত্যাদি সবই। এমনকি গাংচিলরাও থাকল না, তারা ঠোঁটে করে বয়ে নিয়ে গেল তাদের বাসা-এরকম দৃশ্য আগে কেউ কখনও দেখেনি, তবে প্রথমবার বলে কথাটা সব ক্ষেত্রেই খাটে।

হুইলের লোকটা চুপচাপ এই প্রস্থানপর্ব চাক্ষুষ করল। যারা তাকে ছেড়ে যাচ্ছে তাদেরকে থামানোর কোনও চেষ্টাই করল না সে। হাতের কাছে যা পেয়েছে সব নিয়ে গেলেও, কিছু জিনিস নেয়নি তারা, যেমন-গাছপালা, চারা আর বীজ। হুড়োহুড়ি করায় মাটিভর্তি বস্তার মুখ খুলে গেছে, ফলে ডেকে ছড়ানো মাটি দেখে মনে হচ্ছে ওটা একটা ক্ষেত, ইতিমধ্যে হাল দেয়া হয়েছে, আর সামান্য বৃষ্টি হলেই খুব ভালো ফসল ফলবে।

যখন থেকে অচেনা দ্বীপের সন্ধানে এই অভিযান শুরু হয়েছে তখন থেকে হুইলের দায়িত্বে থাকা লোকটাকে আমরা একবারও খেতে বসতে দেখিনি, এর কারণ নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছিল সে, শুধুই স্বপ্ন দেখছিল, আর স্বপ্নের ভেতর যদি সে এক টুকরো আপেল কিংবা এক টুকরো রুটি খেয়ে থাকে সেটা হবে নিখাদ বানানো গল্প, তার বেশি কিছু না।

গাছপালার শিকড় এখন জাহাজের কাঠামো ভেদ করছে। আর বেশি দেরি নেই যখন টাঙানো পালগুলোর প্রয়োজন ফুরাবে। বাতাস তখন শুধু গাছের মগডালে লাগলেই হবে, ক্যারাভেল রওনা হয়ে যাবে নিজ গন্তব্যে।

ওটা একটা জঙ্গল, যেটা ঢেউয়ের সঙ্গে পানির ওপর উঁচু-নিচু হচ্ছে। এমন একটা জঙ্গল, কেউ জানে না কিভাবে সম্ভব, যেখানে গাছে গাছে বসে পাখিরা গান গাইতে শুরু করেছে। ওগুলো নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে ছিল, হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে বেরিয়ে এসেছে আলোয় জগতে। এর কারণ সম্ভবত এই যে ক্ষেতে গম পাকতে শুরু করেছে, এবার ওগুলো কাটতে হবে।

কাজেই হুইলে তালা দিলো লোকটা, কাস্তে হাতে নেমে পড়ল ক্ষেতে। মাত্র কয়েক গোছা ফসল কাটা হয়েছে, নিজের ছায়ার পাশে আরেকটা ছায়া দেখতে পেলো সে। তার ঘুম ভাঙল বাহর ওপর পরিচ্ছন্ন নারীকে নিয়ে, ওই মেয়ের হাতও দেখা গেল তার গায়ের ওপর পড়ে আছে। ওদের শরীর স্পর্শ ওদের বান্ধ এক হয়ে গেছে, যে কারণে কেউ বলতে পারছে না এটা পোর্ট আর এটা স্টারবোর্ড। তারপর, সূর্য উঠতে, ওই লোক আর মেয়ে ক্যারাভেলের নাকের দু'পাশে সাদা রং দিয়ে কিছু হরফ আঁকতে শুরু করল। জাহাজটার নাম লিখছে ওরা। অবশেষে সাগরের পথে যাত্রা শুরু করল অচেনা দ্বীপ, খুঁজে বেড়াচ্ছে নিজেকে।

ওদিকে অর্জনও তার রণকৌশল বদলেছে। এটা তাকে বদলাতে হয়েছে পদ্মার মনোভাব লক্ষ করে। তার মনে হয়েছে পদ্মা তাকে যতটা সময় দেয় তারচেয়ে বেশি সময় দিচ্ছে আবদুল্লাহকে। এটা তার মনে ঈর্ষার আগুন জ্বলে দিয়েছে। একটা সন্দেহ তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

মেডিকেল কলেজের সবাই জানে যে পদ্মা নিয়মিত ডায়েরি লেখে। তার ডায়েরি লেখার ধরনটা আর দশজনের মতো নয়। সে তার মাঝারি আকারের ডায়েরি নিজের কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে রাখে, এবং পরিবেশ অনুমতি দিলে যখন খুশি যা লিখতে ইচ্ছে হয় লিখে ফেলে। গোটা ব্যাপারটা একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে, তার ওই ডায়েরির খুব একটা নিরাপত্তা নেই। কেউ যদি সুযোগের সন্ধানে থাকে তার পক্ষে ওই ডায়েরি সরিয়ে ফেলা বা পড়ে ফেলা সম্ভব-সবটা যদি নাও হয়, অন্তত কিছুটা।

অর্জন হিসেব কষে দেখেছে ডায়েরি সরিয়ে ফেলাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। একবার হারালে বা চুরি গেলে, দ্বিতীয় ডায়েরিটা পদ্মা তাহলে বাড়ির বাইরে বের করবে না।

তাহলে তাকে ডায়েরি চুরি করে পড়তে হবে, তারপর আবার ওই ব্যাগে রেখে আসতে হবে। এখানেও সমস্যা। অনেক দিন ধরে ডায়েরি লিখছে পদ্মা, তার সব এন্ট্রি পড়ে শেষ করতে প্রচুর সময় দরকার। ওটা ফিরিয়ে দিতে হলে অত সময় তো পাবে না সে।

চিন্তা করছে অর্জন। কাজটা তাড়াতাড়ি সারতে হবে। মাথাটা উর্বর, সমাধান পেয়ে গেল। ডায়েরি পড়ার দরকার নেই, বাট করে কোথাও থেকে ফটোকপি করে নেবে, কিংবা ডায়েরির প্রতিটি পৃষ্ঠার ফটো তুলে নিলেও চলে, তারপর ডায়েরিটা পদ্মার ব্যাগে আবার ভরে রাখবে। ফটোস্ট্যাট বা ফটো, পড়তে বসবে নিজের বাড়িতে ঘরের দরজা বন্ধ করে। ওদের কলেজ ভবনের ভেতরই ফটোস্ট্যাটের দোকান আছে।

কাজটায় একজন সহযোগী দরকার হলো অর্জনের। ওদের ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক আগেই দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, একাংশের নাম আবদুল্লাহ গ্রুপ, আরেকাংশের নাম অর্জন গ্রুপ। নিজের গ্রুপ থেকে এক ছাত্রী সাহায্য নিলো অর্জন। ক্লাসে পদ্মার পাশেই বসে মেয়েটা, কাজেই পদ্মা যখন স্যারের প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যস্ত তখন চেহারায় নিরীহ একটা ভাব ফুটিয়ে রেখে তার ব্যাগে হাত গলিয়ে ডায়েরিটা বের করে আনল সে, নিজের বাঁ-খাতার ভেতর লুকিয়ে রাখল। তারপর এক সময় সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে আরেক পাশে বসা অর্জনের হাতে তুলে দিল সেটা।

স্যারকে বলে ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে এল অর্জন, ফটোস্ট্যাটের দোকানে পৌছাতে এক মিনিটও লাগল না, ইতিমধ্যে তার ডায়েরিটা নেড়েচেড়ে দেখা হয়ে গেছে, সব মিলিয়ে আশি পৃষ্ঠা ফটোকপি করতে হবে।

চালু অপারেটর, মাত্র বিশ মিনিটে কাজটা করে দিল। ডায়েরিটা কোমরে গুঁজে শার্টচাপা দিল অর্জন, ক্লাসে পৌছে তিস্তাকে ফিরিয়ে দিল ডায়েরি। মেয়েটা এক ফাঁকে আবার পদ্মার ব্যাগে ভরে রাখল সেটা।

সেদিন রাতে ঘরের দরজা বন্ধ করে পদ্মার ডায়েরি পড়তে গিয়ে বিষম একটা ধাক্কা খেলো অর্জন। ডায়েরির কোথাও লেখা নেই যে তুষার আবদুল্লাহকে ভালোবাসে পদ্মা। কিংবা অর্জন সম্পর্কেও পদ্মা কোথাও লেখেনি যে ছেলেটা খারাপ, আমি তাকে পছন্দ করি না। অথচ তারপরও শঙ্কা আর উদ্বেগে কাহিল হয়ে পড়ল অর্জন। তারপর তার রাগ হতে লাগল, মন জুড়ে জমা হতে লাগল অন্ধ আক্রোশ এবং তীব্র ঘৃণা—সবই আবদুল্লাহ আর পদ্মার প্রতি। কেন?

কারণ, পদ্মা প্রতিটি এন্ট্রিতে যদি দশটা বাক্য লিখে থাকে, তার সাতটাই আবদুল্লাহ সম্পর্কে। বাকি একটা নিজের সম্পর্কে, আর শেষ দুটো অর্জন সম্পর্কে।

কারণ সম্পর্কেই স্পষ্ট করে ভালো বা খারাপ কিছু বলা হয়নি। তবে যে-সব তথ্য দেয়া হয়েছে, তা থেকে খারাপ বা ভালো আলাদা করা একদম সহজ।

যেমন, অর্জনের বন্ধুদের সম্পর্কে নাম ধরে ধরে বলা হয়েছে—হায়দার নিয়মিত ড্রাগ নেয়; টিসা মেয়েটা গুনতে পাচ্ছি ছেলেদের সঙ্গে বসে খি এক্স ফিল্ম দেখে; জাহিদুল কবির মা-বাপকে ধরে পেটায়; সানু আজাদ নকল না করে পরীক্ষায় পাস করতে পারে না।

আর আবদুল্লাহর বন্ধুদের সম্পর্কে পদ্মা লিখেছে—নাহিদ ছেলেটা লেখাপড়া ছাড়া আর কিছু বোঝে না; শারমিন এত সরল আর ভীতু, ওর মন চাইলেও আবদুল্লাহকে ভালোবাসতে পারবে না; বা ভালো বাসলেও তা কোনো দিন মুখ ফুটে বলতে পারবে না; আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে মেধাবি ছাত্র শহীদ; গাজিউল হলো আবদুল্লাহর কার্বন কপি, যেমন ভদ্র তেমনি ভালো ছাত্র।

কি দাঁড়াল?

অর্জনের বন্ধু বা বান্ধবীরা সবাই খারাপ, আর আবদুল্লাহর বন্ধু বা বান্ধবীরা সবাই ভালো।

রাগে দিশেহারা হয়ে অর্জন সিদ্ধান্ত নিল, পদ্মার কাছে এর ব্যাখ্যা চাইবে সে। পরক্ষণে ভাবল, পদ্মা তাকে জিজ্ঞেস করবে—ওর ডায়েরিতে কি লেখা আছে না আছে তা সে জানল কিভাবে? তারপর এও ভাবল, পদ্মা যদি পাল্টা প্রশ্ন করে,

ও কি ভুল কিছু লিখেছে, তাহলে কি জবাব দেবে সে? তাকে স্বীকার করতে হবে, পদ্মা ভুল কিছু লেখেনি।

অর্জন বুঝতে পারল, তার চিন্তা-ভাবনা ভুল পথে এগোচ্ছে। পদ্মা আপাতদৃষ্টিতে কারও পক্ষ না নিলেও, যোগ-বিয়োগ করতে বসলে দেখা যাবে আবদুল্লাহর দিকে অনেকটাই ঝুঁকে পড়েছে। আবদুল্লাহকে শান্ত ও ভালো বলছে সে, অর্জনকে বলছে গম্ভীর আর কঠিন।

পদ্মা এক জায়গায় লিখেছে, ‘আবদুল্লাহ শান্ত ছেলে, যেমন ভদ্র তেমনি বিনয়ী; তবে প্রয়োজনে সাহসী হতে পারে সে।’

আর অর্জন সম্পর্কে লিখেছে, ‘অর্জনের শরীরে অসুরের শক্তি। তার ভেতর বীরত্ব আছে। গাম্ভীর্য বজায় রাখে চলে, মানুষ হিসেবে অত্যন্ত দৃঢ়চেতা, কঠিন পাত্র।’

অর্জন পরিষ্কার বুঝতে পারছে, পদ্মা ধীরে ধীরে আবদুল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ছে। কাজেই এখন তাকে পদ্মার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে হবে।

পরদিনই ক্যাম্পাসে পৌঁছে পুকুর পাড়ে বসল অর্জন, জানে বান্ধবীদের নিয়ে এদিক দিয়েই যাবে পদ্মা। খানিক পর আসতে দেখা গেল ওকে। ডাকল অর্জন, ‘এদিকে একবার এসো, পদ্মা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।’

তার দিকে তাকাল পদ্মা, কিন্তু থামল না, যেমন হাঁটছিল তেমনি হাঁটছে, বলল, ‘ক্লাস গুরুর আগে বায়োলজির পড়াটা পারি কিনা কাউকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে, কাজেই সময় নেই—তোমার কথা অন্য এক সময় শোনা যাবে।’

‘না, তোমার বায়োলজির ক্লাসের চেয়ে আমার কথা অনেক বেশি জরুরি,’ বলল অর্জন, দাঁড়িয়ে পড়েছে, দৃঢ় পায়ে এগিয়ে আসছে মেয়েগুলোর দিকে। ‘আমার কিছু প্রশ্ন আছে, ওগুলোর উত্তর এখনই আমি শুনতে চাই।’

পদ্মার পথ আটকে দিল অর্জন, ওর একেবারে মুখের সামনে দাঁড়িয়েছে।

‘এটা তোমার কি ধরনের অভদ্রতা, অর্জন? নিজেকে তুমি কি অধিকারী মনে করো? সেরে দাঁড়াও, আমাকে যেতে দাও।’

‘ধরো, আমি সরলাম না। ধরো, আমি তোমাকে যেতে দিলাম না। কি করবে তুমি? কি করতে পারো তুমি?’

‘মানে? তোমার মাথায় কোনো সমস্যা?’

‘হ্যাঁ, সমস্যা। আর সে সমস্যার নাম পদ্মা। তোমাকে এখন ওই পুকুর পাড়ে আমার সঙ্গে বসতে হবে। মন দিয়ে শুনতে হবে আমি কি বলি। তারপর

আমি শুনব তোমার কি বলার আছে। তার আগে কোথাও তুমি যেতে পারবে না।’

‘অর্জন, তুমি কিন্তু আমাকে দেরি করিয়ে দিচ্ছ।’

‘হ্যাঁ, দিচ্ছি। আরও অনেক দেরি করাব। কি করতে পারবে তুমি আমার?’ হঠাৎ খপ করে পদ্মার একটা হাত ধরল অর্জন। ‘ভালোয় ভালোয় এসো বলছি...’

‘কি করতে পারি, না?’ হিসহিস করে বলল পদ্মা, তারপর এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিল নিজের হাত। ছাড়িয়েই ঠাস করে কষে চড় বসিয়ে দিল অর্জনের গালে। পটকা ফাটার মতো আওয়াজ হলো।

যত না চড়টা, অর্জনের তরচেয়ে বেশি হকচকিয়ে দিল ওই আওয়াজ। দ্রুত নিজের চারদিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে কারা শুনেছে বা কারা শোনেনি।

তার এই ভ্যাবাচ্যাকা দশার সুযোগ নিয়ে পদ্মাকে এক রকম ঘিরে ফেলল ওর বান্ধবীরা, তারপর ওকে নিয়ে ওখান থেকে দ্রুত সরে এল।

‘ওটা একটা হনুমান।’ তাদের একজন মন্তব্য করল।

‘কেন, নেড়ি কুত্তা বলতে ভয় পাচ্ছিস?’ খঁকিয়ে উঠল আরেক জন। ‘আমার তো ইচ্ছে হচ্ছিল সবাই মিলে ধোলই দিই শালাকে!’

হিহি করে হেসে গড়িয়ে পড়ার অবস্থা হলো তাদের। শুধু একটা মেয়ে কিছু বলছে না বা হাসছে না। এই মেয়েটাই পদ্মার ব্যাগ থেকে ডায়েরি নিয়ে অর্জনের দিকে তাকিয়েছিল। তার নাম তিস্তা।

তিস্তা মেয়েটা অত্যন্ত প্রাকটিক্যাল, দুয়ে দুয়ে চার মেলাতে ভারি পটু। তবে সে দেখতে তেমন ভালো না। তার পারিবারিক পরিস্থিতিও সুস্থ বা স্বাভাবিক বলা যায় না। অনেক বড় আশা নিয়ে ডাক্তারি পড়ার জন্যে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিল মেয়েটা, কিন্তু দু’বছর পরই ক্যানসারে মারা গেলেন তার মা। পুরো এক বছর কাটল না, বিনা নোটিশে তিস্তার বয়সী এক মেয়েকে বিয়ে করে বাড়িতে তুললেন বাবা। সেই সৎমা এখন তিস্তার জীবন নরক করে তুলেছে। তার গৎ বাঁধা সংলাপ হলো, ‘কোনো রকম একটা ছেলেকে ধরে ঝুলে পড়ো। তোমার বাবার এত টাকা নেই যে জাঁকজমকের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবে। টাকা থাকলেও তা আমি তোমার বিয়েতে খরচ করতে দিতাম না। আর তোমার ডাক্তারি পড়া চালিয়ে যাওয়া তো সম্ভবই নয়।’

সত্যি কথাটা হলো, দু’চোখে অন্ধকার দেখছে তিস্তা।

অর্জন আর পদ্মার সম্পর্কে চিড় ধরছে, এটা লক্ষ করে উৎফুল্ল হয়ে উঠল সে, ক্ষীণ হলেও আশার একটা আলো দেখতে পেলো। তিস্তা এমন কিছু তথ্য জানে, যেগুলো অর্জনের জানা নেই। যেমন, ডায়েরিতে না লিখলেও, পদ্মা চুপি চুপি প্রায়ই তুমার আবদুল্লাহর সঙ্গে ক্যাম্পাসের বাইরে দেখা করে-ওরা দুজন একসঙ্গে থিয়েটার, সিনেমা, চিত্র প্রদর্শনী, জাদু ইত্যাদি দেখতে যায়। ওদেরকে দামী রেস্টুরাঁয় বসে খেতেও দেখেছে তিস্তা। ওর কাছে আরও বড় একটা খবর আছে, শুনলে শ্রেফ পাগল হয়ে যাবে অর্জন। আবদুল্লাহর মা-বাবা ইতিমধ্যে একদিন পদ্মাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। আবদুল্লাহই তাঁদেরকে পাঠিয়ে ছিল। পদ্মাকে দেখে ছেলের বউ হিসেবে পছন্দ করে এসেছেন তাঁরা, নিয়ম ধরে আংটি পরিয়েছেন, এখন শুধু বাকি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।

তিস্তা জানে ভয়ঙ্কর একটা ধাক্কা খেতে যাচ্ছে প্রধান অর্জন। আর সেই ধাক্কা সামলে উঠতে সাহায্য করার জন্যে সব সময় তার পাশে থাকতে চায় সে। এবং দুঃখ আর শোকের দিনে পাশে থাকার সুবাদে ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র দুলালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করবে। কল্পনার চোখে তিস্তা দেখতে পাচ্ছে অর্জনের চোখের পানি মুছে দিচ্ছে সে...আবেগপ্রবণ মুহূর্তে এমনকি সেই পানি নিজের ঠোঁট দিয়ে শুঁষেও নিচ্ছে। একজন প্রেমিকা তার প্রেমিকের চোখের পানি খেয়ে ফেলে-এরকম অনেক দৃশ্য সিনেমায় দেখেছে, সেরকম পরিবেশ তৈরি হলে সেও না হয় খাবে, লাগলে না হয় লাগুক একটু নোনতা।

ক্লাস শুরু হতে দেখা গেল অর্জন অনুপস্থিত। তাকে যার দরকার তার কানে ঠিকই খবর পৌঁছে গেল অর্জন এখনও পুকুর পাড়ে বসে আছে, তবে একা নয়, সঙ্গে আছে তার ফ্রপের বেশ কজন ছেলেমেয়ে। পদ্মা তাকে অপমান করেছে, এরকম খবর দিয়ে তাদেরকে পুকুর পাড়ে ডেকে নিয়েছে অর্জন।

ক্লাসে বসে অস্থির হয়ে উঠল তিস্তা। তার অনুপস্থিতিতে অন্য কোনো মেয়ে অর্জনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ নিতে পারে, এরকম একটা ভয়ে অসুস্থ বোধ করছে সে। বইখাতা গুছিয়ে ফেলল, ক্লাস শেষ হওয়া মাত্র ছুটবে।

পুকুর পাড়ে পৌঁছে তিস্তা দেখল সান্ত্বনা আর অভয় দিয়ে খুকু-বান্ধবরা ইতিমধ্যে অনেকটাই শান্ত করে ফেলেছে অর্জনকে। ওরা তাকে বোঝাচ্ছে পুকুর পাড়ে অর্জনের সঙ্গে বসতে না চাওয়ার কারণ হিসেবে পদ্মা যা বলেছে তাতে যুক্তি ছিল না এ-কথা বলা যাবে না। নিজের কথা বলায় জন্যে পদ্মার কাছে সময় চাওয়া উচিত অর্জনের। অর্জনও তাদের বক্তব্য একসরকম মেনে নিচ্ছে। তবে সে জানতে চাইল, কিন্তু পদ্মা যদি সময় না দেয়, তখন কি হবে?



জবাবে বলা হলো, যখনকার কথা তখন ভাবা যাবে।

আবহাওয়া ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে দেখে শঙ্কিত বোধ করল তিস্তা। আগুনটাকে নতুন করে উসকে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল সে। সাহস করে দৃঢ় একটা ভূমিকা নিল, ঝুঁকি আছে জানা সত্ত্বেও বলল, ‘অর্জন! তোমার সঙ্গে আমাকে একা কথা বলতে হবে।’ চোখ ঘুরিয়ে বাকি সবার দিকে পালা করে তাকাল। ‘তোমরা কেউ যদি কিছু মনে না করো, আমাদের দুজনকে একটু একা কথা বলতে দাও, প্লিজ।’

‘কিন্তু অর্জনের সঙ্গে তোমাকে একা কথা বলতে হবে কেন?’ ওদের মধ্যে থেকে তসলিমা নামে এক মেয়ে জানতে চাইল।

তাকে সম্ভাব্য একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বলে চিহ্নিত করে রাখল তিস্তা। উত্তরে বলল, ‘অর্জনকে আমি যা বলব তোমরা সবাই তা শুনতে পাবে, তবে সেটা আমার মুখে নয়, অর্জনের মুখে, অর্জনের নির্ধারিত সময়ে।’

‘কিন্তু, তিস্তা, তুমি আমাকে কি এমন বলতে চাও যে ওদের সামনে বলতে চাইছ না?’ জিজ্ঞেস করল অর্জন, তার ভয় গ্রুপে না আবার ভাঙন ধরে।

তিস্তা জবাব দিল, ‘আমার কাছে কিছু গোপন তথ্য আছে, অর্জন, যেগুলো আমি ছাড়া তোমরা কেউ জানো না, পদ্মার ডায়েরিতেও নেই।’

‘তারমানে পদ্মা সম্পর্কে গোপন তথ্য?’ প্রশ্ন করল অর্জন।

‘হ্যাঁ।’

‘প্লিজ, তোমরা তাহলে এসো এখন,’ বলল অর্জন। ‘না, না-চলে যেতে বলছি না, কাছাকাছি থাকতে বলছি, তিস্তার তথ্যগুলো শোনার পর তোমাদের ডেকে যাতে আলোচনা করতে পারি।’

সবাই পুকুরের আরেক পাড়ে গিয়ে বসল, ওদের দিকে মুখ করে, দুজনের ওপর সারাক্ষণ নজর রাখছে।

‘ঠিক আছে, এবার বলো, কি গোপন তথ্য জানো তুমি। সেগুলো যদি গুরুত্বপূর্ণ কিছু না হয়, আমি কিন্তু তোমার ওপর খুব রাগ করব।’ অর্জনের মুখে কাঁপা কাঁপা হাসি।

তিস্তা হাসছে না। তার চোখ-মুখ থমথম করছে। ‘আমাকে তুমি এত হালকা প্রকৃতির মেয়ে বলে মনে করো না। পদ্মা ওরকম আচরণ করার পর তোমার মনের অবস্থা কি আমি তা জানি, সম্ভবত আমার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না। সেজন্যেই তথ্যগুলো আর চেপে রাখতে চাইছি না। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে ভাবছি, তোমার গ্রহণ ক্ষমতা কি যথেষ্ট? তুমি সহ্য করতে পারবে?’

সঙ্গে সঙ্গে জবাব না দিয়ে তিস্তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল অর্জন। তারপর বলল, ‘আমার গ্রহণক্ষমতা অসীম, তিস্তা। তুমি যাই বলো না কেন, আমি সহ্য করতে পারব। বলো।’

‘পদ্মার ডায়েরি শ্রেফ একটা ডাইভারশন,’ বলল তিস্তা। ‘ওটা তুমি কোনো না কোনোভাবে এক সময় পড়ে ফেলবে, এটা সে ধরে নিয়ে ওসব লিখেছে। সে চেয়েইছে যে তুমি পড়ো। তা না হলে ওটা সঙ্গে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াবার কি কারণ?’

‘বেশ, তোমার যুক্তি মেনে নিলাম।’

‘ওরা দুজন, পদ্মা আর আবদুল্লাহ, চুপিচুপি পরস্পরের সঙ্গে দেখা করে। ওরা সিনেমায় যায়, নাটক দেখে, রেস্টোরাঁয় খাওয়াদাওয়া করে, লেকে নৌকা চালায়।

‘গুড গড, তিস্তা! এসব তুমি কোথেকে জানলে? প্রমাণ করতে পারবে?’

পুকুর পাড়ে, ঘাসের ওপর, মুখোমুখি বসে আছে দুজন। অর্জনের একটা হাত ধরল তিস্তা। ‘অর্জন, তুমি উত্তেজিত হয়ে না, প্লিজ। তোমার যদি কিছু হয়ে যায় বা তুমি যদি মারাত্মক কিছু করে বসো, নিজেকে আমি সারাজীবন ক্ষমা করতে পারব না। ওদেরকে আমি বেশ কবার ফলো করেছি। আমার কাছে ওদের এই সব গোপন অভিসারের ফটো আছে, অর্জন। তুমি দেখতে চাও?’

চোখ বুজল অর্জন, তিস্তার মনে হলো সাহস সঞ্চয় করছে। তারপর চোখ খুলে ওর সামনে হাত পাতল, বলল, ‘দাও।’

ব্যাগ থেকে চৌকো খামটা বের করে রেখেছে তিস্তা, এবার শুধু সেটা ঝাঁকিয়ে রঙিন ফটোগুলো নিজের হাতের তালুতে ফেলল, তারপর তুলে দিল অর্জনের বাড়ানো হাতে।

পদ্মা আর আবদুল্লাহ নাটক পাড়ায় হাত ধরাধরি করে হাঁটছে।

রাতের দৃশ্য, নামকরা রেস্টোরাঁ বন্ধুত্ব ঝালাই থেকে বেরিয়ে আসছে আবদুল্লাহ, তার ঠিক পেছনে দেখা যাচ্ছে পদ্মাকে।

কাগুতাই লেকে নৌকা চালাচ্ছে আবদুল্লাহ, ওর গায়ে পানি ছিটানো পদ্মা।

‘এসব ফটো কে তুলেছে? তুমি?’

‘আমি ছাড়া আর কে তুলবে?’ হাসল তিস্তা।

‘কিন্তু কেন? কি মনে করে?’ গলা একটু যেন চড়ল অর্জনের।

‘কেন আবার, তোমার উপকার করার ইচ্ছে থেকে ওদের এসব ফটো তোলার কথা ভেবেছিলাম। আমার একটা গোপন আকাজক্ষাও ছিল...’

‘গোপন আকাজক্ষা? কি গোপন আকাজক্ষা?’

‘তোমার গুড বুকে থাকা। তোমাকে একটা পাজি মেয়ের ফাঁদ থেকে বের করে আনা, তুমি যাতে এক সময় নিজের ভুল বুঝতে পারো, এবং উপলব্ধি করো আমি তোমার একজন উপকারী বন্ধু।’

তিস্তার জবাব শুনে অর্জন খুশি হলো কিনা বোঝা গেল না। তবে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে বলল, ‘কয়েকটা ফটো দেখে আমি আমার প্রেমিকাকে পাবার আশা ত্যাগ করব, তুমি এরকম কিছু ভেবে থাকলে ভুল করছ, তিস্তা। পদ্মাকে আমি ভালোবাসি, পদ্মাকে আমার চাই। ওকে আমি পাব না, এরকম চিন্তা আমার মাথায় কখনো আসে না, আসবেও না। ভালো কথা, ফটোগুলো আমার কাছে থাক?’

তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তিস্তা বলল, ‘আবদুল্লাহর মা-বাবা পদ্মাকে দেখতে গিয়েছিলেন, মেয়ে পছন্দ হওয়ায় আংটি পরিয়ে এসেছেন।’

এবার চোখ গরম করে তিস্তার দিকে তাকাল অর্জন। ‘এটা তুমি বানিয়ে বলছ, একদম মিথ্যে কথা! তিস্তা, তুমি আমার মনকে পদ্মার বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোমার চেষ্টা করছ। এসব করো না, তোমাকে আমি মানা করছি। কারণ এতে তোমার কোনো লাভ হবে না, পদ্মা ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।’

আগ্রহ নেই, সে আমিও জানি, ভাবল তিস্তা। সেটা আশায় আশায় আছো পদ্মাকে পাবে, তাই। কিন্তু পদ্মা যখন আবদুল্লাহর ঘর ঘরতে চলে যাবে, তখন? আমি সেদিনের অপেক্ষায় থাকব, অর্জন। সত্যি কথা বলতে কি, তুমিই আমার সারাজীবনের একমাত্র অবলম্বন হতে যাচ্ছ।

অর্জনের কথার উত্তরে কিছু বলল না তিস্তা। শুধু নিজের ব্যাগ থেকে আরেকটা খাম বের করে ধরিয়ে দিল তার হাতে।

‘কি এটা?’ গলার স্বর ভেঙে গেল অর্জনের। ‘কি আছে এতে?’

‘কি আছে ওতে? জিজ্ঞেস করছ কেন? খুললেই দেখতে পাবে। আমি মিথ্যে কথা বলছি কিনা তার প্রমাণ...’

‘প্রমাণ? কি প্রমাণ?’ ঘামতে শুরু করেছে অর্জন। ‘কি বলতে চাইছ তুমি, তিস্তা?’

অর্জনের হাত থেকে খামটা টেনে নিল তিস্তা, ভেতর থেকে কয়েকটা রঙিন ফটো বের করে তার সামনে ফেলল।

হাত কাঁপছে, ফটোগুলো তুলল অর্জন।

একই দৃশ্যের ফটো কয়েকটা অ্যাঙ্গেল থেকে তোলা হয়েছে। বিষয় পদ্মাকে আংটি পরাচ্ছেন আবদুল্লাহর মা, পদ্মাদের বৈঠকখানায় উপস্থিত রয়েছেন পদ্মার মা-বাবা এবং আবদুল্লাহর মা-বাবা।

‘উঁহু, না,’ বিড়বিড় করল অর্জন, তার সারা শরীর কাঁপছে। ‘এগুলো কারিগরি ফলানো ফটো নয়। তুমি দেখা যাচ্ছে সত্যি কথাই বলছ। রাগ করার জন্যে দুঃখিত।’

‘ছি, ছি, না, তুমি রাগ করায় আমি মোটেও দুঃখ পাইনি। আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝি, অর্জন। আমি শুধু সহানুভূতি জানাতে আসিনি, তোমাকে একথাও বলতে এসেছি যে এই সংকটের সময় আমি তোমার পাশে আছি। প্লিজ, আমাকে তুমি দূরে সরিয়ে দিয়ো না।’

‘ঠিক আছে, বুঝেছি,’ বলল অর্জন, হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠেছে। ‘তুমি আমার যে উপকার করলে, আমি তোমার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকলাম। আর তাই আমি চাই না তোমার কোনো ক্ষতি হোক।’

‘মানে?’ বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকল তিস্তা।

‘আমি চাই, তুমি এখন এখান থেকে চলে যাও, তিস্তা।’

‘আমি চলে যাব... কেন, অর্জন?’

‘আমি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে এ বিষয়ে আলাপ করব। সে আলোচনা তোমার শোনা উচিত হবে না, কারণ আমরা হয়তো এমন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেবো যা আমাদের জন্যে কঠিন বিপদ ডেকে আনবে। আমি চাইছি না একটা মেয়ে হয়ে সে বিপদে তুমি জড়িয়ে পড়ো।’

‘এমন সিদ্ধান্ত নিতে হবে কেন যে কঠিন বিপদ হবার আশঙ্কা থাকে? একবার ভেবে দেখেছ, তোমার বিপদ হলে নিজেকে আমার দায়ী মনে হবে, যেহেতু তথ্যগুলো আমার কাছ থেকে জেনেছ তুমি?’

অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল অর্জন। ‘ছেলেদের অনেক বিষয় তুমি কোনো দিন বুঝবে না, বিশেষ করে আমার মতো ছেলেদের। শোনো, তিস্তা, ওদের বিয়েটা অবশ্যই আমি ঠেকাতে চেষ্টা করব। জানি না সেটা সম্ভব কিনা। যদি সম্ভব হয়, ওয়েল অ্যান্ড গুড। আর যদি সম্ভব না হয়... যদি সম্ভব না হয়,,, তারপর কি ঘটবে একমাত্র আল্লাহই জানেন!’

‘কি ঘটবে? তুমি কি করার কথা ভাবছ, অর্জন?’

‘কি করার কথা ভাবছি? বলব? বললে তোমাকে চলে যেতে বলার দরকার হবে না, তুমি নিজেই দৌড়ে পালাবে। বলব?’

‘হ্যাঁ, বলো। আমার জানা দরকার।’

‘পদ্মাকে আমি যদি না পাই,’ বলল অর্জন, ‘তাহলে দুটোর একটা ঘটনা ঘটবে। এক, পদ্মা কিংবা আবদুল্লাহ খুন হয়ে যেতে পারে, কিংবা দুজনেই মারা

যেতে পারে। দুই, পদ্মাকে রেপ করা হতে পারে- গণধর্ষণের শিকার, তারপর অ্যাসিড মেরে চেহারা পুড়িয়ে দেয়া হতে পারে।’

বিশ্বয়ে আর অবিশ্বাসে হাঁ হয়ে গেল তিস্তা। ‘কি...কি...বললে তু-তুমি?’

‘কি আশ্চর্য, তুমি এখনও চলে যাচ্ছ না?’

‘এ-সব তোমার রাগের কথা, অর্জন। কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ এরকম কিছু করার কথা ভাবতে পারে না...’

‘আমাকে তুমি চিনতে ভুল করেছ। সময় হলেই দেখতে পাবে। সে যাই হোক, এখন তুমি যাও, প্লিজ!’

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল তিস্তা, তারপর দৃঢ়স্বরে বলল, ‘বিপদ যদি হয় তো আমারও হোক, আমিও তোমাদের আলোচনায় থাকতে চাই।’

মাথা নাড়ল অর্জন। ‘তুমি বুঝতে পারছ না। এখানে গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। আলোচনার বিষয়বস্তু ফাঁস হয়ে যাবে, এরকম কোনো ঝুঁকি আমরা নিতে পারব না।’

‘তোমার তাহলে মনে হচ্ছে নিরাপত্তার জন্যে আমি একটা ঝুঁকি? তোমার গোপন বিষয় আমাকে জানানো চলে না? তোমার এত বড় উপকার করার পর এ-কথা তুমি বলতে পারলে?’

‘তিস্তা, তুমি আসলেও বুঝতে পারছ না। আরে বোকা, এখানে আমি আমার নিজের নিরাপত্তার কথা বোঝাতে চাইনি। যাদের সঙ্গে আলাপ করব তারা ব্যাপারটা মানবে না।’

‘কোনটা মানবে না? তোমাদের আলোচনায় আমার উপস্থিতি?’

‘ঘনিষ্ঠ বৃত্তের ভেতর তুমি যেহেতু ছিলে না বা নেই, হঠাৎ তোমাকে তারা অ্যাকসেস্ট করতে রাজি হবে কেন, বলো?’

‘রাজি না হবার কোনো কারণ নেই। আমার সামনে ওদেরকে তুমি বলো আমি কি সব তথ্য দিয়েছি তোমাকে। এমন তো না যে ওরা আমাকে এই প্রথম দেখছে। আর ইনার সার্কেলের কথা যদি বলো, তাতে থাকার যোগ্যতা তো মনে হয় আমারই সবার চেয়ে বেশি। যা কিছু ঘটছে বা ঘটবে, সবই তো আমার তোমাকে তথ্যগুলো সংগ্রহ করে দেয়ার কারণে। কি?’

মাথা চুলকে অর্জন বলল, ‘অস্বীকার করছি না, তোমার কথায় যুক্তি আছে, কিন্তু...’

‘আবার কিন্তু কি?’ হেসে ফেলল তিস্তা। ‘জানি ওদেরকে। পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দাও। তারপর সবাই মিলে এসো সিদ্ধান্ত নিই কি করা যায়।’

সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বসে সিদ্ধান্ত হলো, আবদুল্লাহর মা-বাবা যা করেছেন, অর্জনের মা-বাবাও তাই করতে যাবেন, অর্থাৎ পদ্মাদের বাড়িতে বিনা আমন্ত্রণেই যাবেন তাঁরা, এবং ছেলের বউ হিসেবে পদ্মাকে তাঁদের পছন্দ হয়েছে, এ-কথা বলে মেয়েকে আংটি পরিয়ে আসবেন।

প্রশ্ন উঠল একটু মেয়েকে কোনো পরিবার দুজন পাত্রের তরফ থেকে আংটি পরাতে দিতে রাজি হয় কি করে। জানা কথা পদ্মার মা-বাবা বিনয়ের সঙ্গে অর্জনের মা-বাবাকে বলবেন যে তাঁদের মেয়ের বিয়ে আবদুল্লাহর সঙ্গে আগেই ঠিক হয়ে গেছে।

কারও বাড়িতে গিয়ে কেউ তাদের মেয়ের সঙ্গে নিজেদের ছেলের বিয়ে দেয়ার জন্যে চাপ দিতে পারে না বা জিদ ধরতে পারে না, অর্থাৎ এই আয়োজন শ্রেফ একটা কানাগলিতে পৌঁছে দেবে অর্জনের মা-বাবা, তথা অর্জনকে, কাজের কাজ কিছুই হবে না।

দেখা গেল কোনো যুক্তি মানতে রাজি নয় অর্জন, পদ্মাকে আংটি পরানোর জন্যে সে তার মা-বাবাকে পাঠাবেই, আবদুল্লাহর মা-বাবা যে আগেই কাজটা সেরে ফেলেছে সেটা তাদেরকে না জানিয়ে।

ফল যেহেতু প্রায় নির্ভুল আন্দাজ করা যায়, তাই অর্জনকে জিজ্ঞেস করা হলো, তার মা-বাবা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর কি হবে। অর্জন জানাল, এরপর পদ্মার সঙ্গে দেখা করবে সে, অনুরোধ করবে আবদুল্লাহকে ভুলে গিয়ে সে যেন তাকে বিয়ে করে।

জানা কথা পদ্মা তাতে রাজি হবে না। তখন?

দাঁতে দাঁত পিষে অর্জন বলল, ‘ওকে আমরা তুলে আনব। ওদের পাড়া থেকে বেশি দূরে নয়, আমাদের ডেভলপ কোম্পানি কয়েকটা বহুতল বাড়ি তৈরি করছে, তার একটা ফ্ল্যাটে আটকে রাখা হবে। দুদিন আমার সঙ্গে রাত কাটাল, তৃতীয় দিন কাজি ডেকে বিয়ে পড়িয়ে নিলেই হবে। তারপর দেখব কি করে আবদুল্লাহ। আমার বিয়ে করার বউয়ের দিকে হাত বাড়ালে ওই শালাকে আমি জ্যান্ত কবর দেবো।’

অর্জনকে বোঝানোর চেষ্টা হলো-জোর যার মুল্লুক তার, এটা সবসমানে কাজ করে না। অর্জনরা ধনী বটে, কিন্তু পদ্মারা ওদের চেয়ে কয়েকশ গুণ বড় ধনী। মেয়েকে জোর করে ধরে এনে আটকে রাখা, তারপর মেয়ে রাজি না হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে করা, এসব তারা মেনে নেবেন না। এটা নিশ্চয় খানা-পুলিশ হবে।

যাই হোক, পদ্মাদের বাড়িতে অর্জনের মা-বাবা পৌঁছবেন, এবং যথারীতি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন। সময় নষ্ট না করে আবার একদিন পদ্মার পথরোধ করল অর্জন, বলল পুকুর পাড়ে বসে তার কিছু কথা শুনতে হবে ওকে।

কি ভেবে কে জানে, পদ্মা রাজি হলো।

ঘাসের ওপর মুখোমুখি বসল দুজন। হাসি আর কৌতুক দিয়েই শুরু হলো দুজনের আলাপ। পুকুরের অপর পাড় থেকে অর্জনের গ্রুপ ওদের নড়াচড়া আর আচরণ লক্ষ্য করছে, তাদের সঙ্গে তিস্তাও আছে।

পদ্মা বলল, ‘তোমার মা-বাবা আমাদের বাড়িতে এক ঢোক পানি পর্যন্ত খেলেন না। যেই গুনলেন আবদুল্লাহর মা আমাকে আগেই আংটি পরিয়ে গেছেন, অমনি ঝট করে সিধে হলেন, “অত্যন্ত দুঃখিত, আমরা তাহলে আসি” বলে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে, সোজা উঠে বসলেন নিজেদের গাড়িতে।’

‘তোমরা ওঁদেরকে ডাকোনি,’ অভিযোগ করল অর্জন। ‘তোমার মা-বাবা ওদেরকে ডেকে বসাতে পারতেন, বলতে পারতেন আপনাদের প্রস্তাবও বিবেচনা করা হবে।’

‘বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে কোথাও যাবার আগে মেয়েটার কি স্ট্যাটাস সেটা জেনে নেয়া উচিত, তা না হলে এরকম অপ্রতিভ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। না, কি বলছ, আরেকটা প্রস্তাব কি কারণে আমার মা-বাবা বিবেচনা করতে যাবেন! আবদুল্লাহ আমার পছন্দ করা পাত্র, কাজেই সেটাই চূড়ান্ত।’

‘এরপর তুমি হয়তো বলবে আমি অনেক দেরি করে ফেলেছি, তাই না?’

মাথা নাড়ল পদ্মা, অবাধ হয়ে তাকাল। ‘না, এরকম বিদঘুটে একটা কথা কি কারণে বলতে যাব। আমি পণ্য নই যে ক্রেতার আগের আসলে আগে পাবে। শুধু পদ্মা নয়, কোনো মেয়েই আসলে “বিক্রির জন্যে নয়”। এক্ষেত্রে পছন্দই প্রথম আর শেষ কথা। তাই বলে কিন্তু এক তরফা পছন্দ নয়। একজন পছন্দ করলে, যাকে পছন্দ করল তারও তাতে সম্মতি থাকতে হবে, তবে একটা সম্পর্ক হতে পারে।’

‘তারমানে তুমি বলতে চাইছ তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক হবার কোনো সম্ভাবনা আগেও ছিল না, এখনও নেই?’

পদ্মা সরাসরি উত্তর দিচ্ছে না। ‘তুমি আমাকে পছন্দ করো, এটা আমি জানতাম, এখনও জানি। পছন্দ হওয়া দোষের কিছু না, তবে সেটা দু’তরফেরই হওয়া চাই, তা না হলে সম্পর্ক হবে না। এই যেমন আমি আর আবদুল্লাহ—আমি ওকে পছন্দ করি, ও-ও আমাকে একই রকম পছন্দ করে। যাকে পছন্দ হবে তার সঙ্গেই হবে সম্পর্ক, এটাই স্বাভাবিক, কারণ শুধু এককম একটা সম্পর্কই পরিণতি পেতে পারে।’

‘তোমার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই?’

‘হ্যাঁ, চূড়ান্ত। না।’

‘কিন্তু পদ্মা, আমারও একটা সিদ্ধান্ত আছে,’ বলল অর্জন। ‘সেটাও চূড়ান্ত, এবং অপরিবর্তনীয়। তুমি শুনতে চাও, কি সেটা?’

পদ্মা হাসল। তারপর বলল, ‘হোয়াই শুড আই? আসলে শুধু তোমার কেন, কারও ব্যক্তিগত বিষয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই, কখনও ছিলও না।’

‘তারপরও কথাটা আমি বলছি, আর তোমাকে শুনতেও হচ্ছে।’

কাঁধ ঝাঁকাল পদ্মা, বলল, ‘অগত্যা।’

‘আমি তোমাকে চেয়েছি,’ বলল অর্জন, ‘প্রথম যেদিন দেখেছি সেদিন থেকে। এই যে তোমাকে আমার চাওয়া, এটাকেই আমি আমার ভালোবাসা বলি। এটা অমর, এটা অক্ষয়, এবং এটা নিয়তি।’

‘আমি কি গাছের কোনো ফল যে চাইলে পাবার নিশ্চয়তা আছে? আমি শো কেসে সাজানো অলঙ্কারও নই যে পছন্দ হলে ঘরে আনতে পারবে। আমি রক্তমাংসের একটা মানুষ, যার ভেতর মন বলে একটা জিনিস আছে, সেই মনের নিজস্ব পছন্দ অপছন্দ আছে। তুমি আমাকে চাও? অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু আমার মন তোমাকে চায় না। আমার মন আবদুল্লাহকে চায়।’

এবার অর্জনকে হাসতে দেখা গেল। সেটা খুবই বাঁকা হাসি। ‘কিন্তু আবদুল্লাহকে তুমি যদি না পাও? ধরো তার লাশ পড়ে গেল, তখন তুমি কি করবে?’

ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল পদ্মা। ‘তুমি একটা উৎকট। তুমি একটা বিদ্যুটে। তুমি নোংরা। এখানে, তোমার কাছাকাছি থাকতে আমার রুচিতে বাঁধছে।’ ঘুরে হাঁটতে শুরু করল।

‘হয় আবদুল্লাহ খুন হবে, তা না হলে তুমি খুন হবে,’ গলা চড়িয়ে বলল অর্জন, পুকুরের অপর পাড় থেকে তার গ্রুপের প্রত্যেকে শুনতে পেলো। ‘আমি যদি তোমাকে না পাই, তাহলে আর কেউ যাতে ন পায় সেটা আমি অবশ্যই নিশ্চিত করব।’

পদ্মার শুভাকাঙ্ক্ষী যারা কাছাকাছি ছিল তাদের অনেকেই অর্জনের এই হুমকি শুনতে পেলো। তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সরাসরি কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করল পদ্মা। যা যা ঘটেছে সব লিখে নিয়ে গেছে, সেটা গ্রহণ করলেন প্রিন্সিপ্যাল, এবং পদ্মাকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, ‘অর্জনের আমরা ডেকে পাঠাব, শুনব তার কি বলার আছে। তবে তার আগের প্রস্তাবের মার নেই, থানায় একটা জিডি করে রাখো তোমরা।’



এত কিছু ঘটছে, অথচ আবদুল্লাহকে কিছুই জানায়নি পদ্মা। থানায় ডায়েরি করলেন ওর বাবা। বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর মেয়েকে হত্যা করার হুমকি দেয়া হয়েছে, বিষয়টাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিল পুলিশ।

কলেজ কর্তৃপক্ষ অর্জনের বক্তব্য শোনার জন্যে অপেক্ষায় রয়েছেন, কিন্তু ঘটনার পর থেকে ক্লাসে আসা বন্ধ করে দিয়েছে অর্জন।

অর্জন তার গ্রুপকে নিয়ে নিজেদের খালি একটা ফ্ল্যাটবাড়িতে আড্ডা মারছে আর ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। ওখানে ওরা মদ-গাঁজা ইত্যাদি টানছে আর প্রতি মিনিটে পাঁচ-সাতবার করে খুন করছে আবদুল্লাহকে এবং পদ্মাকে প্রতি নিশ্বাসের সঙ্গে একবার করে ধর্ষণ করছে—সবই মৌখিক।

তবে ব্যাপারটা আর মৌখিক থাকছে না। পদ্মাকে হুমকি দেয়ার পর এক সপ্তাহ কেটে গেছে। লেখাপড়া এক রকম ছেড়েই দিয়েছে অর্জন। বাড়িতে পুলিশ এসেছিল, তাদের অভিযোগ শুনে ছেলের ওপর প্রচণ্ড খেপেছেন বাবা, বলেছেন আবার যদি এধরনের অভিযোগ তাঁর কানে আসে তাহলে অর্জনকে তিনি বাড়ি থেকে বের করে দেবেন।

অর্জন দিনে দিনে চরম হিংস্র হয়ে উঠছে। তার সমস্ত রাগ আর ক্ষোভ পদ্মার ওপর। ওকে সে পাবে না, এটা উপলব্ধি করার পর ঠাণ্ডা মাথায় ওর চরম ক্ষতি করার প্ল্যান করছে। তার মতিগতি সুবিধের নয় বুঝতে পেরে গ্রুপের নারী সদস্যরা একে একে কেটে পড়ল। রয়ে গেল একা শুধু তিস্তা।

তিস্তা রয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু অর্জনের আচরণ তাকে রীতিমতো আতঙ্কিত করে রেখেছে। সে বুঝে ফেলেছে এই ছেলে মানসিক অসুস্থতায় ভুগছে, এর চিন্তাধারা ধ্বংসাত্মক এবং রোমহর্ষক।

সেদিন দু'বোতল মদ খেয়ে নিজের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে বসল অর্জন। তার জানা আছে পদ্মা শহরের প্রতিটি চিত্র প্রদর্শনীতে যায়, এবং পছন্দ হলে ছবি কেনে। তাকে যদি এরকম একটা গল্প শোনানো যায় যে পরিচয় প্রকাশ করতে ইচ্ছুক নন এমন একজন সংগ্রাহক তাঁর সংগ্রহ করা দামী দামী স্টেইন্টিং বিক্রি করে দিচ্ছেন, তাহলে প্রবল আগ্রহ নিয়ে ওই সংগ্রাহকের ঠিকানা জানতে চাইবে সে।

পদ্মাকে এই টোপ গেলানোর দায়িত্ব চাপল তিস্তার কাঁধে। খালি এই ফ্ল্যাটবাড়ির তিনতলায় পদ্মাকে তুলবে সে। সামনের দরজাটাকে বৈঠকখানার মতো করে সাজাতে হবে। পদ্মাকে বসতে বলে কামরায় ছেড়ে, ফ্ল্যাটবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবে তিস্তা, এরপর তার আর কোনো ভূমিকা থাকবে না।

প্রস্তাবটা শুনে বুকের রক্ত পানি হয়ে গেল তিস্তার। একটা মেয়ে হয়ে আরেকটা মেয়ের এই সর্বনাশ কিভাবে সে করবে!

ওদিকে বন্ধুদের প্রশ্নের উত্তরে অর্জন ব্যাখ্যা করছে পদ্মাকে নিয়ে কি করবে সে। চিৎকার-টেঁচামেচি যাতে না হয়, পদ্মার মুখে টেপ স্টেটে দেবে। পদ্মা নিজের সম্ভ্রম রক্ষার জন্যে ধস্তাধস্তি করতে পারে, করবেই, তাই নিজের সঙ্গে অন্তত দুজন বন্ধুকে রাখবে অর্জন। তার আগে তিন বন্ধু মিলে প্রচুর মদ খাবে।

মুখে টেপ, হাত-পায়ে রশির বাঁধন, ডিভানের ওপর অসহায় পড়ে থাকবে পদ্মা। অর্জন তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেবে আবার। তাতে রাজি না হলে তিন বন্ধু মিলে এক এক করে খুলে ফেলবে পদ্মার পরনের সব কাপড়। বিবস্ত্র করার পর আবার একটা সুযোগ দেয়া হবে পদ্মাকে। সে যদি অর্জনকে জীবনসঙ্গী হিসেবে মেনে নিতে রাজি হয়, তার কোনো ক্ষতি করা হবে না, সমীহের সঙ্গে আবার তাকে কাপড় পরানো হবে, নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে অর্জন আর তার বন্ধুরা। আর যদি পদ্মা আবারও ওকে প্রত্যাখ্যান করে, অর্জন তখন বাধ্য হয়ে ধর্ষণ করবে তাকে। তবে সে একা নয়।

এই ধর্ষণ পর্ব একটা চক্র ধরে চলতে থাকবে। অর্জন লাইনের প্রথমে থাকবে, আবার লাইনের শেষেও থাকবে—কাজ সেরে আবার লাইনে দাঁড়াবে আর কি।

এটা চলতে থাকবে যতক্ষণ না তিন বন্ধু ক্লান্ত হচ্ছে। একটা খসড়া হিসেব করে অর্জন জানাল, ধরা যাক প্রত্যেকে তারা তিনবার করে মোট ন'বার ধর্ষণ করবে। প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এই ঘটনার পর পদ্মা আর বেঁচে থাকতে চাইবে না। সে হয়তো তাকে মেরে ফেলার জন্যে ওদের হাতে-পায়ে ধরবে। সেটা হবে অর্জনের মূল পরিকল্পনার অনুকূলে।

তিনজন মিলে একটা মেয়েকে বারবার রেপ করার পর তাকে আর বাঁচিয়ে রাখা চলে না, সেটা ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে। কারণ ওই মেয়ের তখন আর হারানোর কিছু থাকবে না, কাজেই কোনো রকম রাখটাক না করে যা যা ঘটেছে সব হুবহু পুলিশকে বলে দেবে।

অর্জনের প্ল্যান হলো তিনজন মিলে পদ্মাকে ক্ষতবিক্ষত করবে—পর চাইনিজ কুড়াল, চাপাতি আর বড় ছুরি নিয়ে পদ্মার দু'পাশে বসবে তারা, জ্যান্ত অবস্থায় মেয়েটাকে টুকরো টুকরো করে কাটবে।

অর্জনের কথা হলো, এই শাস্তি পদ্মার প্রাপ্য, তার ভালোবাসতে না পারার খেসারত। হাড় ও মাংসের প্রতিটি টুকরো একটা ওয়াটারপ্রুফ বস্তায় ভরা হবে।

অর্জন ব্যাখ্যা করতে লাগল, পদ্মাকে ঠিক কিভাবে কাটতে চায় সে।

‘প্রথমে আমি তার স্তন দুটো কাটব, ওকে বলা হবে ও-দুটো আমরা রান্না করে খাবো—এটা শ্রেফ মজা করার জন্যে বলা. সত্যি সত্যি আমরা নরমাংস খেতে যাব না...’

নরম সুরে, বোঝানোর ভঙ্গিতে, এই প্ল্যান থেকে সরে আসতে বলা হলো অর্জনকে। তার দুজন বন্ধু বিকল্প একটা প্ল্যান দিল: পদ্মাকে ছেড়ে আবদুল্লাহকে ধরা হোক—আবদুল্লাহর অস্তিত্ব না থাকলে পদ্মাকে পাবার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে অর্জনের।

অর্জন বলল পদ্মা যেহেতু তাকে অপমান করেছে, কাজেই প্রতিশোধ নিতে না পারলে তার মনে শান্তি আসবে না।

তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে গ্রুপের দুজন সদস্য সাফ জানিয়ে দিল, পদ্মাকে নিয়ে অর্জনের প্ল্যান তারা সমর্থন করে না, কাজেই ব্যাপারটার সঙ্গে তারা জড়াতে রাজি নয়। অর্জন তাদেরকে শর্ত সাপেক্ষে গ্রুপ থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করার অনুমতি দিল। শর্ত হলো, তার প্ল্যান সম্পর্কে ওরা দুজন কাউকে কিছু বলবে না। যদি বলে, অর্জনের হাতে তারা একদিন না একদিন খুন হয়ে যাবে।

কি ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ভয়ে আধমরা হয়ে পড়ল তিস্তা। সে তার সাধ্যমতো অর্জনকে বোঝাতে চেষ্টা করল, বলল, ‘প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তুমি যদি নিজের ক্ষতি করে ফেলো, সেটা একটা হাস্যকর ব্যাপার হবে না? পুলিশ যদি তোমাকে ধরে, পদ্মাকে রেপ করার মামলা যদি আদালত পর্যন্ত গড়ায়, তুমি হবে একটা ভিলেন। অথচ তোমার উদ্দেশ্য পদ্মাকে বিয়ে করে হিরো হয়ে থাকা। গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে পরস্পর বিরোধী লাগছে। আমি অন্তত মেলাতে পারছি না।’

‘অত মেলাবার দরকার নেই। আর, তিস্তা, কানের কাছে এত বকবক করো না তো। তোমরা এমনভাবে কথা বলছ, আমি যেন একটা অবোধ শিশু। শোনো, তোমার জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি, আমি একা শুধু পদ্মার সর্বনাশ করতে চাইছি না, নিজেকেও ধ্বংস করতে চাইছি। বাবা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চেয়েছেন, পদ্মা আমাকে ভালোবাসতে পারবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে, কাজেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নেব। আমি যখন, প্রাপ্য শাস্তিটুকু পদ্মাকে দিয়ে যাব। বুঝলে এবার?’

থমথমে চেহারা নিয়ে চূপ করে থাকল তিস্তা।

তার দিকে চোখ গরম করে তাকাল অর্জন। ‘তুমি ঠিক কি ভাবছ বলো তো?’

‘কই! না, কিছু ভাবছি না তো।’

‘কিছু যদি নাই ভাবো, চেহারা অমন হাঁড়ি করে রেখেছ কেন?’ খঁকিয়ে উঠল অর্জন। ‘শোনো, তোমাকে আমি এর মধ্যে জড়াতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার কথা কানে তোলোনি। এখন আমার প্ল্যান তুমি জেনে ফেলেছ, কাজেই সেটা পছন্দ না হলেও আমার সঙ্গে থাকতে হবে তোমাকে। যদি ভেবে থাকো, ওই দুজনের মতো তোমাকেও আমি চলে যেতে দেব, মস্ত ভুল করবে। ওদের ব্যাপার আলাদা, চাইলেও ওরা আমার সঙ্গে বেইমানি করতে পারবে না, কারণ আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিমাসে উপকৃত হয় ওদের পরিবার-ওরা সেটা হারাতে চাইবে না। কিন্তু তোমাকে যদি চলে যেতে দিই, আর তুমি যদি আমার প্ল্যান ফাঁস করে দাও, আমি তাহলে আর প্রতিশোধ নিতে পারব না। কাজেই তুমি থাকবে।’

‘আমি থাকব? বুঝলাম না! আমি কোথায় থাকব, অর্জন?’

মাথা চুলকাচ্ছে অর্জন, চিন্তা করছে। এর আগে তিস্তাকে সে বলেছে পদ্মাকে এই ফ্ল্যাটবাড়ির তিনতলায় পৌঁছে দিলেই তার দায়িত্ব শেষ, তারপর সে তার নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে পারবে। এখন বলছে তাকে যেতে দেয়া হবে না। তিস্তা তাহলে থাকবে কোথায়?

পদ্মাকে ধর্ষণ করার সময় আর কোনো মেয়ের তো এই ফ্ল্যাটে থাকা চলে না।

‘তোমরা ওকে নিয়ে যাই করো না কেন, ওই সময় এই ফ্ল্যাটে আমার থাকার প্রশ্ন ওঠে না,’ সাবধানে, মনে করিয়ে দেয়ার সুরে বলল তিস্তা।

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে, এখানে তোমাকে থাকতে হবে না,’ বলল অর্জন। ‘তুমি থাকবে তোমাদের বাড়িতে, তবে বাড়ি ছেড়ে অন্তত আটচল্লিশ ঘণ্টা তুমি বেরোতে পারবে না।’

‘ধন্যবাদ, অর্জন,’ বলল তিস্তা, সংকট কেটে যাওয়ায় পরম স্বস্তি বোধ করছে। ‘তোমাকে আমি কথা দিলাম, আটচল্লিশ ঘণ্টার আগে সত্যি বাড়ি থেকে বের হব না। আমার ওপর তুমি আস্থা রাখতে পারো।’

‘কারও ওপর আস্থা নেই আমার,’ রাগের সঙ্গে বলল অর্জন। ‘ভেবো না তুমি কথা দিলেই আমি সেটা বিশ্বাস করব। আমি ব্যরস্থ করছি, আমার কজন ঝুঁকু তোমাদের বাড়ির ওপর নজর রাখবে। তুমি বের হতে চাইলেও বেরোতে পারবে না, ওরা বাধা দেবে। আর যদি একান্ত প্রয়োজনে বেরোতেই হয়, ওরা তোমার পিছু নেবে।’

আড়ষ্ট হাসি দেখা গেল তিস্তার ঠোঁটে। ‘ঠিক আছে, তুমি যা ভালো মনে করো, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই।’

প্ল্যান চূড়ান্ত করা হলো। এবার সেটা কার্যকর করার পালা।

নির্দিষ্ট তারিখের দুদিন আগে পদ্মার সঙ্গে কলেজ ক্যাম্পাসে দেখা করল তিস্তা। পরিচয় প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক সংগ্রাহক ভদ্রলোক সম্পর্কে জানাল ওকে। সদ্য তৈরি একটা ফ্ল্যাটে ঘরভর্তি দামী দামী সব পেইন্টিং অযত্নে পড়ে আছে, যার যেটা খুশি বেছে নেয়া যাবে, দাম বাজারদরের চেয়ে অনেক কম।

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল পদ্মা। জানতে চাইল, ফ্ল্যাটবাড়িটা কোথায়, কখন গেলে ভদ্রলোককে পাওয়া যাবে ইত্যাদি।

তিস্তা জানাল, ঠিকানাটা তার জানা নেই। জেনে নিয়ে ফোনে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করবে সে।

দুদিন পর, কলেজ বন্ধ, সকাল দশটায় পদ্মাকে ফোন করে তিস্তা বলল, ‘আমি কলেজের গেটে অপেক্ষা করছি, তুমি যদি পেইন্টিংগুলো দেখতে চাও তো দশ মিনিটের মধ্যে চলে এসো।’ পদ্মাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল সে।

উত্তেজনায় কাঁপছে তিস্তা। এই যে কাজটা করছে সে, এতে তার মনের এতটুকু সায় নেই। মানুষ হিসেবে সে অপরাধপ্রবণ নয়, কারও ক্ষতি করার কোনো ইচ্ছে কখনও তার মধ্যে ছিল না, আজও নেই।

কিন্তু বাড়ির পরিবেশ তাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে বলে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে জড়াতে বাধ্য হয়েছে সে। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, সে চাইলেও এই ভয়ঙ্কর সংকট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারবে না। সে চেষ্টা করতে গেলে হিতে বিপরীত হবার সমূহ আশঙ্কা, তাকে হয়তো ওরা খুনই করে ফেলবে। তার দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিচু গলায় আলাপ করতে দেখেছে অর্জনের কজন বন্ধুকে, বিশেষ করে যে দুজন পদ্মাকে ধর্ষণ পূর্বে অর্জনের সঙ্গে থাকবে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ওরা হয়তো নিজের মধ্যে আলাপ করছে পদ্মার মতো তিস্তাকেও ধর্ষণ করা যেতে পারে, তারপর তাকে মেরে ফেললেই বা কার কি করার বা বলার আছে।

বোকার মতো কিছু করা চলবে না, বুঝতে পারছে তিস্তা। অর্জনের প্রতিটি নির্দেশ তাকে মেনে চলতে হবে। তবে তাদের বাড়ির ওপর সারাক্ষণ নজর রাখবে অর্জনের বন্ধুরা, এটা তাকে খুব অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। যারা তার ওপর নজর রাখবে তাদের মাথায় কখন কি কুবুদ্ধি খেলবে তা কি কেউ আগে

থেকে বলতে পারে? এটা-সেটা নানা কাজে তিস্তাকে তো বাইরে বেরোতেই হবে, ওরাও তার পিছু নেবে, তারপর? রাস্তা থেকে তাকে যদি ওরা জোর করে তুলে নেয় নিজেদের গাড়িতে? যদি খালি কোনো বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে, এবং প্রমাণ না রাখার জন্যে মেরে ফেলে? কে তাদেরকে বাধা দেবে? কেউ না।

আর কিছু চিন্তা করার সুযোগ পেল না তিস্তা, দেখতে পেল তার সামনে গাড়ি থেকে নামছে পদ্মা। ঠিক দশ মিনিটের মাথায় পৌঁছে গেছে সে।

‘গাড়ি ছেড়ে দে, পদ্মা,’ ওকে বলল তিস্তা। ‘আমরা রিকশা নিই, তাতে বাড়িটা খুঁজতে সুবিধে হবে।’

একটু ইতস্তত করে মাথা বাঁকাল পদ্মা, ঝুঁকে ড্রাইভারকে কিছু বলল। তিস্তা লক্ষ করল পদ্মার কথা শোনার সময় তার দিকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে লোকটা।

এই লোককে যখন জেরা করা হবে, পুলিশকে আমার চেহারার হুবহু বর্ণনা দেবে সে, ভাবল তিস্তা, কারণ ওই ড্রাইভার ভালোমতো চেনে তাকে, পদ্মাদের বাড়িতে কয়েকবার আসা-যাওয়া করতে দেখেছে।

গাড়ি নিয়ে চলে গেল ড্রাইভার। ওরা একটা রিকশায় উঠল। পদ্মা জানতে চাইল, তিস্তা চিত্র সংগ্রাহক ভদ্রলোকের খবর পেলো কোথেকে? জবাব দিতে যাবে তিস্তা, দেখল পাশের রিকশায় অর্জনের দুজন বন্ধু বসে রয়েছে। মুখ শুকিয়ে গেল তার, ভাবল, তারমানে তার ওপর এখন থেকেই নজর রাখতে শুরু করেছে ওরা।

জোর করে একটু হাসল তিস্তা, পদ্মাকে বলল, ‘ভদ্রলোক আমাদের এক একম আত্মীয়ই, তবে তিনি নিষেধ করে দিয়ে বলেছেন সম্ভাব্য ক্রেতার কাছে তাঁর পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না।’

‘কি ধরনের বা কার কার পেইন্টিং আছে তাঁর কাছে, তোমার কোনো ধারণা নেই?’ জানতে চাইল পদ্মা।

হাত জোড় করল তিস্তা। ‘এই শিল্প মাধ্যম সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ, পদ্মা। এ প্রসঙ্গে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করাই উচিত হবে তোমার। তবে এনেছি, দেশি-বিদেশি অনেক নামী-দামী শিল্পীর পেইন্টিং আছে তাঁর সংগ্রহে।’

‘এসব তিনি বিক্রি করে দিচ্ছেন কেন?’

‘তুমি বরং সরাসরি তাঁকেই জিজ্ঞেস করে জানে নিয়ো, ভাই। এবার আমাকে ঠিকানা মিলিয়ে বাড়িটা খুঁজতে দাও।’

খানিক ঘোরাঘুরি করার পর ঠিকানা মিলিয়ে বাড়িটার সামনে রিকশা দাঁড় করাল তিস্তা। বন্ধ গেটের ভেতর লুঙি পরা এক শ্রোঁড় লোককে দেখা গেল, দারোয়ান, ওদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জানতে চাইল, ‘আপনারা কেডা? কারে চান?’

‘আমরা শুনেছি এই বাড়িতে কিছু ছবি আছে, বিক্রি করা হবে হবে,’ বলল তিস্তা, ভাবল এই লোকটাকে অর্জন আবার কোথেকে যোগাড় করল।

‘ঠিকই হুনছেন,’ গেট খুলে দিয়ে বলল দারোয়ান। ‘সোজা তিনতলায় উঠা যান।’

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার সময় কারও সঙ্গে ওদের দেখা হলো না। প্যাসেজেও কেউ নেই। বৈঠকখানার দরজা খোলা, তবে পরদা ঝুলছে। আগে ওই পরদা দেখেনি তিস্তা।

পদ্মাকে কিছু না বলে পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল সে। সাজানো সুন্দর ঘর, পদ্মাকে সোফায় বসার ইঙ্গিত করে পরদা সরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল। সেটা খালি। খালি আরও একটা কামরা পার হয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল জোড়া ফ্ল্যাটের মাঝখানের দরজার সামনে। নক করতে অর্জনই খুলে দিল দরজা। সে তার দুই বন্ধুকে নিয়ে পাশের ফ্ল্যাটে অপেক্ষা করছে।

চৌকাঠ পেরিয়ে পাশের ফ্ল্যাটে পা রাখল তিস্তা। মুখে কিছু বলল না, শুধু একবার মাথা ঝাঁকিয়ে জানিয়ে দিল তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে সে, তারপর আরেক দরজা দিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

তিস্তাও বেরিয়ে যাচ্ছে, পাশের ফ্ল্যাটের বৈঠকখানায় বসে থাকা পদ্মাকে পাহারা দেয়ার জন্যে অর্জনের দুই বন্ধুও আরেক দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

‘এই শোনো, এক মিনিট,’ তিস্তার পথ আটকাল অর্জন, ঠোঁটে বাঁকা হাসি।

তিস্তার বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠল। ‘কেন, কি ব্যাপার?’ নিজের অজান্তেই চড়ে গেল গলা, অবচেতন মন যেন জানে এ-ধরনের লোকজন শক্তের ভক্ত আর নরমের যম।

বাঁকা হাসি মিলিয়ে গেল ঠোঁট থেকে, নরম সুরে অর্জন বলল, ‘না, মানে, তোমার ফোনটা একবার একটু দাও তো দেখি।’

‘ফোন দেব? কেন ফোন দেব?’

‘এই জন্যে দেবে যে আমাকে দেখতে হবে তোমার ফোনে পদ্মার মা বা বাবার ফোন নম্বর আছে কিনা। কিংবা আবদুল্লাহর ফোন নম্বরও পাই কিনা।’

‘থাকতে পারে...আছে হয়তো। তাতে কি?’

‘তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, ওদের কারও নম্বর তোমার কাছে থাকাটা নিরাপদ নয়। মানে, তোমার জন্যে নিরাপদ নয়। এখানে যদি কাজের সময় আমাদের কোনো বিপদ ঘটে, তোমার কাছে ওদের ফোন নম্বর থাকলে সবার আগে আমরা তোমাকে দায়ী ভাবব। সেটাই উচিত, তাই না? ভেবো দেখো না, ওরা যদি খবর পায়, তুমি ছাড়া কে ওদেরকে খবর দেবে, বলো?’

‘তোমার যুক্তি আর সন্দেহ নিয়ে তুমি থাকো, আমি এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নই। এই নাও ফোন, নম্বরগুলো মুছে ফেলো।’

প্রথমে ফোনটা নিল অর্জন, তারপর বলল, ‘মুছে ফেলার সময় কোথায়? তুমি তো জানো, আমার প্রেমিকা আমার অপেক্ষায় পাশের ফ্ল্যাটে অপেক্ষা করছে।’ ফোনটা ট্রাউজারের পকেটে ভরল, তিস্তাকে পাশ কটাল, পাশের ফ্ল্যাটে ঢোকার দরজার দিকে হাঁটছে।

কথা আর না বাড়িয়ে নিজের পথ ধরল তিস্তা।

‘এক সময় এর পুরস্কার তুমি পাবে,’ পেছন থেকে তাকে আশ্বস্ত করল অর্জন।

দ্বিতীয় ফ্ল্যাটের প্যাসেজ হয়ে সিঁড়ির মাথায় পৌঁছল তিস্তা, ভাবল, পুরস্কার পেয়ে আর কাজ নেই, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে আমার। ইতোমধ্যে নিজের চরম বোকামি উপলব্ধি করেছে সে। ভালো স্বামী হবে মনে করে অর্জনকে ধরে বুলে পড়ার প্ল্যান ছিল তার, সে ভুল বেশ কদিন আগেই ভেঙে গেছে। এখন এই বিকট সংকট থেকে নিজের গা বাঁচাবে কিভাবে সেই চিন্তায় পাগল পারা হয়ে আছে।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল তিস্তা। গেটের দিকে না গিয়ে পাকা চাতাল ধরে বাড়ির পেছন দিকে চলে এল। খিড়কি দরজায় তালা আছে, অর্জনের কাছ থেকে পাওয়া চাবি দিয়ে সেটা খুলে বাড়ির পাশের গলিতে বেরিয়ে এল।

রিকশা নিয়ে বাড়ি ফিরছে তিস্তা।

তার সামনে আর পেছনে, দুটো আলাদা রিকশায়, অর্জনের চার জুনিয়র বন্ধুও রয়েছে। ওরা চারজন পালা করে তিস্তাদের বাড়ির ওপর নজর রাখবে, তিস্তা বাইরে বের হলে পিছু নেবে তার, দেখবে কোথায় সে যায়, কার সঙ্গে দেখা করে বা কথা বলে।

বিশাল একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে রিকশা থেকে নামল তিস্তা। এই ভবনে মোট চল্লিশটা ফ্ল্যাট আছে, দশতলা দালনের পাঁচ তলার একটা ফ্ল্যাটে



থাকে তিস্তারা। ভেতরে ঢুকে লিফটে চড়ার আগে আভারখাউন্ড গ্যারেজে একবার নামল তিস্তা, দেখে নিল তাদের গাড়িটা আছে কিনা। নেই।

তারমানে তার সৎমা নিদ্রা শপিং করতে বেরিয়েছে। নিদ্রার মাত্র তিনটে কাজ: এক, ঘুমানো; দুই শপিং করা; তিন, সংসার থেকে তিস্তাকে কিভাবে বিদায় করা যায় তা নিয়ে গবেষণা করা।

ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দিল কাজের বুয়া। সোজা নিজের ঘরে ঢুকল তিস্তা, দরজা বন্ধ করতে না করতে এতক্ষণ চেপে রাখা কান্না বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল। তাড়ামাড়ি টিভি অন করে কান্নার আওয়াজ চাপা দিতে হলো। তারপর লাফিয়ে পড়ল বিছানায়, গড়াগড়ি খাচ্ছে, ভেঙে পড়ল বাঁধ ভাঙা কান্নায়।

খানিক পর একটু শান্ত হলো তিস্তা, বিড়বিড় করছে, ‘পদ্মা, পদ্মা রে, এ আমি তোর কি সর্বনাশ করলাম, ভাই! আমাকে তুই মাফ করে দে রে!’

নিজেকে তার শুধু অপরাধী নয়, প্রচণ্ড নোংরা লাগছে। আমার মতো নোংরা নির্ভুর মেয়ে ভূ-ভারতে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না, ভাবল সে।

আধঘণ্টা পর শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ভিজল তিস্তা। তার একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল এভাবে দীর্ঘক্ষণ গোসল করলে নিজেকে বোধহয় আর নোংরা লাগবে না। কিন্তু নিজেকে বারবার ধুয়ে পরিষ্কার করার পর উপলব্ধি করল এ নোংরা তার শরীরে নয়, মনে। অথচ মন পরিষ্কার করার গোসল বা পদ্ধতি তার জানা নেই।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো।

জানালায় পরদার একটা কোন সামান্য একটু সরিয়ে পাঁচতলা নিচে তাকাল তিস্তা। বেশিক্ষণ চোখ বুলাতে হলো না, অর্জনের একজন বন্ধুকে চিনতে পারল, ভ্যানগাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে চটপটি খাচ্ছে, তাকিয়ে আছে ওদের ফ্ল্যাটের জানালার দিকেই। তিস্তা ভাবল, নিশ্চয় বাড়ির পেছন দিকেও নজর রাখছে ওরা।

বেলা দুটোয় নিদ্রা বাড়ি ফিরল। নিজের এবং আধবুড়ো স্বামীর জন্যে প্রচুর কেনাকাটা করেছে সে, তিস্তার জন্যে একটা সুতোও নয়। তারপরও তাকে নিজেদের বেডরুমে ডেকে এক এক করে প্রতিটি পদ দেখাল, তারপর এক প্রশ্ন করে জানতে চাইল, রং পছন্দ হয়েছে কিনা, পরলে কেমন মানাবে, মাপ ঠিক আছে তো, দাম কম পড়ল না বেশি ইত্যাদি। যন্ত্রণার মাত্রা কমানোর জন্যে কম কথায় নিদ্রা যা শুনলে খুশি হবে তাই বলে তিস্তা, এক পর্যায়ে মাথা ধরেছে বলে পালিয়ে এল নিজের ঘরে।

একটু পরই দরজায় নক করে খেতে বসার জন্যে ডাকল কাজের বুয়া।

‘খাব না, খিদে নেই,’ বলে তাকে বিদায় করল তিস্তা। ‘আমাকে আর ডেকো না তো।’

সারা ঘরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে তিস্তা। আপনমনে বিড়বিড় করছে: ‘এখনও কিন্তু দেরি হয়ে যায়নি! কিছু যদি করতে চাই, সময় পাবো। অর্জন বলেছে সারাটা দিন পদ্মাকে বোঝানোর চেষ্টা করবে সে, পদ্মা যেন তাকেই বিয়ে করে। কোনোভাবেই যদি রাজি করা না যায়, তাহলে, তার ভাষায়, ‘অপারেশন শুরু করা হবে রাত দশটার পর। আমরা ওকে ছিড়ে ছিড়ে খাব। হিংস্রতা মেটাব।’

বিড়বিড় করছে আর আঙুল দিয়ে কপালের পাশ টিপছে তিস্তা।

তারপর মাথা নাড়ল। ‘আমি ভীতু আর একা একটা মেয়ে। অতগুলো হিংস্র তাগড়া ছেলের বিরুদ্ধে কি করতে পারি! এটা চিন্তা করাই হাস্যকর। নাহ, পদ্মার কাছে আর আল্লাহর কাছে মারফ চাওয়া ছাড়া সত্যি আমার কিছু করার নেই।’

সারাটা বিকেল ঘরের ভেতর একটানা হাঁটাহাঁটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল তিস্তা, তার ওপর আজ সারাদিন পেটে একটা দানাও পড়েনি। বিছানায় দ হয়ে শুয়ে পড়ল। হাঁপাচ্ছে।

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল শ্বাস-প্রশ্বাস, তারপর নিজেও জানে না কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছে তিস্তা।

পুলিশের একটা জিপ গাড়িতে বসে রয়েছে সে। জিপ ছুটছে অর্জনদের ফ্ল্যাটবাড়ির দিকে। জিপে আবদুল্লাহও রয়েছে, হাতের পিস্তল তিস্তার কপালের একপাশে ঠেকিয়ে রেখেছে সে, তিস্তা যাতে লাফ দিয়ে পালাবার চেষ্টা না করে বা ড্রাইভারকে ভুল দিক নির্দেশনা না দেয়।

ঘুম ভাঙার পর দেখল ঘেমে গোসল হয়ে গেছে শরীর। হাতঘড়িতে সাতটা বাজে।

বিদ্যুৎচুম্বকের মতো মনে পড়ে গেল স্বপ্নটার কথা। ঠিক স্বপ্ন নয়, মনে পড়ল আবদুল্লাহর কথা। ওকে ফোন করতে পারে সে। তারপর ফোন নেই, ওর নম্বরও মুখস্থ করা নেই। তবে ওদের বাড়ি চেনে সে।

আবদুল্লাহর সঙ্গে দেখা হলে সব কথা তাকে খুলে বলবে তিস্তা। তাহলে নিশ্চয়ই একটা কিছু করবে সে। সে বা পুলিশ। সন্দেহ নেই, এতক্ষণে পাগলের মতো ছুটোছুটি শুরু করেছেন পদ্মার মা-বাবা আর আত্মীয়স্বজনরা। আবদুল্লাহও চুপ করে বসে নেই। ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই জানাশুনা হয়ে গেছে যে পদ্মা আর তিস্তাকে একসঙ্গে দেখা গেছে কলেজের গেটের কাছে।

পদ্মা আর তিস্তার মোবাইল ফোন নিশ্চয় বন্ধ পাচ্ছেন তাঁরা।

তিস্তাদের এটা নতুন ফ্ল্যাট, এটার ঠিকানা ওদের কারও জানা নেই।

কাপড় পাল্টাল তিস্তা, তার ওপর বোরকা পরল। কিছু একটা করতে হবে, জানে সে, আর তাই বুকে সাহস সঞ্চয় করেছে। প্রথম কাজ অর্জন যাদেরকে পাহারা দিতে পাঠিয়েছে তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বাড়ি থেকে বেরোনো। বাড়ি থেকে একবার বেরোতে পারলে অনেক কিছুই করতে পারবে সে-পুলিশকে গোটা ব্যাপারটা জানানো যায়, পদ্মাদের বাড়িতে যাওয়া যায়, যাওয়া যায় আবদুল্লাহর বাড়িতে।

বোরকা পরে নিচতলায় নামল তিস্তা। আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল ড্রাইভার। ইন্টারকমে আগেই তার সঙ্গে কথা হয়েছে তিস্তার। তিস্তাকে বোরকা পরা দেখে লোকটা যদি অবাক হয়ে থাকে, চেহারায় তার কোনও প্রকাশ নেই।

গাড়ির দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল ড্রাইভার, ভেতরে ঢুকতে গিয়েও তিস্তা ঢুকল না, ইতস্তত করেছে। হঠাৎ তার মনে হলো, যারা তার ওপর নজর রাখছে তারা যদি এই গাড়ি চিনে ফেলে? তাহলে তো সমস্যা হবে। বোরকা পরা একমাত্র আরোহী যে তিস্তা, এটা বুঝতে পারবে ওরা। নিশ্চয় গাড়িটাকে থামানোর চেষ্টা করবে, কিংবা পিছু নেবে।

‘তিস্তা, কোথায় যাচ্ছ তুমি, মা?’

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল তিস্তা। ওদের মুখোমুখি ফ্ল্যাটের মিসেস তামান্না, বোরকা পরা, তবে ওরই মতো মুখ ঢাকা নয়, এদিকেই হেঁটে আসছেন, পেছনে তাঁদের ড্রাইভার।

খুশি হয়ে উঠল তিস্তা, সমাধান পাবার আশায় হাসি হাসি করল মুখ, বলল, ‘এই তো, আন্টি, একটু স্টেশন রোডের ওদিকে যাব। কিন্তু আমার মা জান যাবে একদম উল্টোদিকে, আমাকে গাড়িতে উঠতে নিষেধ করে দিয়েছে—তাই কি করব ভাবছি।’

‘ঘরে সৎমা, তোমার কপাল পুড়েছে, মা!’ মিসেস তামান্না নিষ্ঠুর গলায় বললেন। ‘এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো। তোমাকে স্টেশনের কাছে নামিয়ে দিলে হবে তো?’

‘জি, আন্টি, হবে; অসংখ্য ধন্যবাদ, আন্টি।’

‘কিন্তু তুমি আবার ফিরবে কিভাবে, মা?’

এক গাল হেসে তাঁকে আশ্বস্ত করল তিস্তা, ‘আন্টি, আমি চিন্তা করবেন না, আন্টি। আমি যে বান্ধবীর বাড়িতে যাচ্ছি সে-ই আমাকে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে।’

‘তাহলে এসো, মা।’

হাঁ করে তিস্তার দিকে তাকিয়ে আছে ওদের ড্রাইভার, তবে তার দিকে একবারও না তাকিয়ে মিসেস তামান্নার সঙ্গে গ্যারেজের ভেতর দিকে চলে যাচ্ছে তিস্তা।

স্টেশন রোড থেকে একটা রিকশা নিয়ে তুষার আবদুল্লাহর বাড়ির দিকে যাচ্ছে তিস্তা, ঘড়িতে তখন আটটা বাজতে বারো মিনিট বাকি। পদ্মার মা-বাবা বা পুলিশের কাছে না গিয়ে আবদুল্লাহর সঙ্গে তার দেখা করতে চাওয়ার কারণ হলো, নিজেকে এদের সবার উপকারী বন্ধু হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে সে। অর্জনের ষড়যন্ত্রে তার বড় একটা ভূমিকা রয়েছে, সেই তো বাড়ি থেকে ডেকে এনে অর্জনের ফাঁদে আটকেছে পদ্মাকে। এখন তার এই ভূমিকাকে ছোট করে দেখাবার গরজ অনুভব করছে সে। থানায় যাচ্ছে না, এর কারণ এটা আন্দাজ করা কঠিন কিছু নয় যে পদ্মার মা-বাবা ইতোমধ্যে থানায় গিয়ে তার বিরুদ্ধে ডায়েরি, কিংবা হয়তো মামলা করেছেন। এখন যদি সে থানায় যায়, পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করবে তাকে।

তিস্তার প্ল্যান হলো প্রথমে আবদুল্লাহকে সব কথা জানাবে, তারপর ওকে নিয়ে থানায় যাবে। বান্ধবী পদ্মাকে রক্ষার চেষ্টা করছে, পুলিশের কাছে এটা প্রমাণ করতে পারলে তার আগের ভূমিকাকে অত সিরিয়াসলি তারা নাও নিতে পারে।

কিন্তু তিস্তা যা ভেবেছে ঘটনা সেদিকে এগোবার নয়। আবদুল্লাহকে বাড়িতেই পাওয়া গেল, কিন্তু ওকে সব কথা খুলে বলার সুযোগ পেল না সে। কোন পরিস্থিতিতে পদ্মাকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যাবার অর্জনের প্রস্তাবে রাজি হতে হয়েছে তাকে, সেটা ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছিল তিস্তা, উদ্বেগ আর উত্তেজনায় অস্থির আবদুল্লাহ তাকে থামিয়ে দিয়ে বার বার শুধু একটা প্রশ্ন করতে লাগল, ‘পদ্মা এখন কোথায় আছে তুমি জানো?’

কাজেই কিছুই ব্যাখ্যা করতে না পেরে তিস্তাকে জবাব দিতে হলো, ‘হ্যাঁ, জানি। জানি বলেই তো এসেছি...’

‘এক মিনিট!’ বলে বাড়ির অন্দরমহলে চলে গেল আবদুল্লাহ, ফিরল দু’মিনিট পর, পকেটে পিস্তল ভরতে ভরতে।

‘পিস্তল কি হবে?’ আঁতকে উঠল তিস্তা। ‘পদ্মাকে উদ্ধার করবে পুলিশ, আবদুল্লাহ, চলো আগে আমরা পুলিশের কাছে যাই!’

‘কোনো কথা নয়,’ কঠিন সুরে বলল আবদুল্লাহ। ‘আমাকে শুধু তুমি দেখিয়ে দাও কোথায় আছে পদ্মা।’

‘কিন্তু ওখানে ওরা অনেক ছেলে পদ্মাকে পাহারা দিচ্ছে, আবদুল্লাহ! তাদের কাছেও পিস্তল আছে, তুমি একা ওদের সামনে দাঁড়াতেই পারবে না! চলো, আগে আমরা পুলিশের কাছে যাই, যা করার ওরাই করবে...’

‘ঠিক আছে, তোমার কথাও থাকুক, আমার কথাও থাকুক। আমাকে তুমি দূর থেকে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে সোজা থানায় গিয়ে সব কথা পুলিশকে জানাও। আমি পুলিশ না আসা পর্যন্ত আড়াল থেকে বাড়িটার ওপর নজর রাখব, বিশেষ করে লক্ষ রাখব পদ্মাকে নিয়ে ওরা অন্য কোথাও সরে যাচ্ছে কিনা।’

আবদুল্লাহর কথায় যুক্তি আছে, বুঝতে পেরে তার প্রস্তাবে রাজি হলো তিস্তা।

গ্যারেজে কয়েকটাই গাড়ি, তবে গাড়ি না নিয়েই বেরোল আবদুল্লাহ, রাস্তার মোড় থেকে রিকশা নিল। সাড়ে আটটার দিকে নির্দিষ্ট এলাকায় পৌঁছে গেল ওরা। তিস্তা বলল, ‘আমি যতটুকু জানি, রাত দশটার পর্যন্ত পদ্মার কোনো ক্ষতি ওরা করবে না। কাজেই অস্থির হয়ে কিছু করতে যাওয়াটা চরম বোকামি হবে...’

কিছু বলল না, তবে মনে মনে নিজেকে কিছু জানিয়ে রাখছে আবদুল্লাহ: ‘ছ’টা বুলেট, পাঁচটাই অর্জন আর তার সঙ্গপাদদের উড়িয়ে দেয়ার জন্যে, বাকি একটা নিজের জন্যে— নোংরা কীট হত্যার অপরাধে বিচারের মুখোমুখি হতে রাজি নই।’

আবদুল্লাহ বিরক্ত হবে ভেবে আর কিছু বলছে না তিস্তা। এক মিনিট পর রিকশাঅলাকে থামাল, হাত বাড়িয়ে দূরের দুটো পাঁচতলা বাড়ি দেখিয়ে বলল, ‘ওই যে, ছাইরঙের একজোড়া বাড়ি দেখতে পাচ্ছ না, ওখানে। ওগুলোর সামনে দাঁড়ালে ডান দিকের বাড়িটা, ঠিক আছে? তিনতলার একটা ঘরে আটকে রাখা হয়েছে পদ্মাকে। দুটো বাড়িই কিন্তু একদম খালি, কেউ বসবাস করে না। এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে আসা-যাওয়া করা যায়।’

‘তুমি জানো সব মিলিয়ে কজন ওরা?’ জিজ্ঞেস করল আবদুল্লাহ।

‘চার থেকে সাতজন, নিশ্চিত করে বলতে পারব না। অর্জনের ছোট ছোট নয়, না ডাকলেও কিভাবে যেন খবর পেয়ে চলে আসছে। তুমি কিন্তু ভুলেও একা ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবে না! মনে রেখো, সেটা হলে নেহাতই বোকার মতো আত্মহত্যা।’

‘না, না, আমাকে নিয়ে তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। তুমি পুলিশ ফোর্স নিয়ে এসো, আমি আড়াল থেকে ওদের ওপর নজর রাখছি।’

‘তুমি নামো, আমি এই রিকশা নিয়েই থানায় যাই।’

থানায় পৌঁছে নিজের পরিচয় দিতেই তিস্তা তাবাসসুম গ্রেফতার হয়ে গেল। তার বিরুদ্ধে পদ্মাদের ড্রাইভার মঈন মিয়া থানায় মামলা করেছে, অভিযোগে বলা হয়েছে টেলিফোনে পদ্মাকে কলেজের গেটে ডেকে নিয়ে গেছে তিস্তা, তারপর ওকে নিয়ে শ্রেফ গায়েব হয়ে গেছে। অর্থাৎ অপহরণের গুরুতর অভিযোগ, প্রমাণিত হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কিংবা এমনকি ফাঁসি পর্যন্ত হতে পারে।

কি কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে, এটা জানানোর পর পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তিস্তাকে জেরা করতে বসলেন। প্রথম দিকে নিজের ভূমিকা ছোট করে দেখাবার চেষ্টা করল তিস্তা, কিন্তু অফিসারদের ধমক শুনে আর চোখ রাঙানি দেখে তার পিলে চমকে গেল, এরপর আর নয়-ছয় না করে গুরু থেকে যা যা ঘটেছে সব সত্যিকথা গড়গড় করে মুখস্থ বলে গেল।

থানার ইনচার্জ, একজন ইন্সপেক্টার, ছ'জনের একটা সশস্ত্র দল নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন পদ্মাকে উদ্ধার করার জন্যে। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে থানায় হাজির হয়েছেন পদ্মার বাবা এবং স্বজনরা। পুলিশের সঙ্গে তাঁরাও যাচ্ছেন পদ্মার উদ্ধার অভিযান দেখতে। রওনা হবার আগে ইন্সপেক্টার সাহেব নির্দেশ দিয়ে গেছেন তিস্তাকে জেল হাজাতে পাঠাতে হবে।

খবর পেয়ে তিস্তার মা-বাবাও থানায় চলে এলেন। সঙ্গে করে উকিল নিয়ে এসেছেন তাঁরা। তবে তিনি অনেক প্যাঁচ কষেও তিস্তাকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারলেন না। তিস্তার বাবা উকিলের মাধ্যমে পুলিশকে কয়েক লাখ টাকা ঘুষ সাধলেন, কিন্তু পদ্মার বাবা যেহেতু তিস্তার বাবার চেয়ে অনেক বড় ধনী এবং সমাজে তাঁর প্রতিপত্তিও অনেক বেশি, তাই ঘুষ খাবার সাহস হলো না সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার। তিস্তাকে জেল হাজাতে যেতেই হলো। প্রসঙ্গত, পুলিশ তিস্তার নামে যে অপহরণের কেস করেছে, সেই কেসে জামিনের কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

ওদিকে, তিস্তা রিকশা নিয়ে থানার দিকে চলে যাবার পর, কৌমরে গৌজা পিস্তল বের করে একবার চেক করে নিল আবদুল্লাহ, তারপর সোজা জোড়া ফ্ল্যাটবাড়ির দিকে এগোল। যদিও তিস্তাকে আশ্বস্ত করে বলেছে যে আড়াল থেকে নজর রাখবে অর্জন আর তার গ্রুপের ওপর, কিন্তু ওর চিন্তার মধ্যে নজর রাখার মতো একঘেয়ে কাজের কোনো স্থান নেই। পদ্মাকে ভালোবাসে আবদুল্লাহ, সেই মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে অর্জন আর তার সঙ্গপাত্ররা, কাজেই

সোজা তাদের আস্তানায় হানা দিতে হবে আবদুল্লাহকে, গায়ের জোরে ছিনিয়ে আনবে পদ্মাকে। ওর এই কাজে কেউ যদি বাধা দেয়, তাকে প্রাণ হারাতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো দ্বিধা নেই আবদুল্লাহর মনে। ওকে এখন কেউ বাধা দিলে তাকে গুলি খেতে হবে।

বাড়িটার ভেতর ঢোকান আগের আবদুল্লাহ টের পেয়ে গেল ভেতরে অর্জন ছাড়াও কমপক্ষে সাত-আটজন তরুণ আছে, আরও আছে একজন দারোয়ান আর দুটো গাড়ির দুজন ড্রাইভার। অর্জনের বন্ধুরা সবাইকে তিনতলায় খোলা জানালার সামনে ঘোরাফেরা করছে, তাদের চোখে-মুখে চাপা উল্লাস আর উত্তেজনা। ওদেরকে যদি ওখানে পাহারা দেয়ার কাজে রেখে থাকে অর্জন, তাহলে বলতে হবে তার কথা ওরা একদমই শুনছে না। কারণ তিনতলার তরুণরা কেউ ভুলেও একবার জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে না।

ওদের হাবভাব আবদুল্লাহকে আরও অস্থির করে তুলল। মনে ভয় জাগল, ওর বোধহয় আসতে দেরি হয়ে গেছে।

প্রথমে দারোয়ানের সামনে পড়ল আবদুল্লাহ।

‘আপনে কেডা, সার? কারে চান?’

‘আমি অর্জনের ছোটবেলার বন্ধু, শুনলাম এখানে আড্ডা মারছে ওরা, তাই চলে এলাম আর কি। গেটটা খোলো।’

লোহার গেটের দিকে আরও এক কি দু’পা এগোল দারোয়ান, বলল, ‘মাফ কইরেন, সার। পেরথমে আপনার নাম আর কাম কি কন। মালিকরে গিয়া কইমু। তা না কইলে ভিতরে ঢুকা নিষেদ আছে।’

এরকম উৎকট একটা সমস্যার একদম পানির মতো সহজ সমাধান বের করে ফেলল আবদুল্লাহ। লোকটার কাঁধের ওপর দিয়ে তার পেছন দিকে তাকাল, সেদিকে যেন কাউকে দেখতে পেয়েছে; আর তাকাতেই কোমরে গোঁজা পিস্তল বের করে দারোয়ানের মাথায় ঠিক মাঝখানে বেশ জোরে হাতলের একটা বাড়ি মারল। এতটুকু শব্দ না করে গেটের সামনে চলে পড়ল লোকটা।

একজোড়া লোহার রডের মাঝখানে হাত গলিয়ে দারোয়ানের কোমর থেকে একটানে চাবির গোছাটা কেড়ে নিল আবদুল্লাহ। গেট খুলে ভেতরে ঢোকান পর চাবিটা ফেলে দিল কাছাকাছি ঝোপের ভেতর, তারপর ফ্ল্যাটবাড়ির ভেতর ঢুকল।

সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় ওঠার সময় পদ্মার বিপদের কথা ভেবে দিশেহারা বোধ করছে আবদুল্লাহ। ওর মন বলছে, অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে, পদ্মার সর্বনাশ যা হবার তা হয়তো হয়ে যাচ্ছে...

কোমরের পিস্তল আগেই হাতে বেরিয়ে এসেছে, এবার সেটা মাথার ওপর তুলে ফাঁকা একটা গুলি করল আবদুল্লাহ।

বন্ধ জায়গার ভেতর গুলির শব্দ কামান দাগার মতো শোনাল। আবদুল্লাহ এখনও তিনতলার সিঁড়িতে পা দেয়নি, রয়েছে এক ও দোতলার মাঝামাঝি জায়গায়, তা সত্ত্বেও শুনতে পেল তিনতলায় হঠাৎ করে ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেছে। তারপর কারও চিৎকার ভেসে এল কানে। ‘অর্জন! অর্জন, সর্বনাশ! সম্ভবত পুলিশ...

আবদুল্লাহ ভাবল, চরম উত্তেজনার মধ্যে অপরাধীদের মাথা ঠিকমতো কাজ নাও করতে পারে, পদ্মা বেঁচে থাকলে ওদের অপরাধের প্রত্যক্ষদর্শী হবে সে, আদালতে সাক্ষি দেবে, এ-কথা ভেবে ওকে তারা মেরে ফেলতে পারে।

চিন্তাটা মাথায় আসতে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ছুটল আবদুল্লাহ, হাতে উদ্যত পিস্তল, প্রতিবারে তিনটে করে ধাপ টপকাচ্ছে।

তিনতলায় দুটো ফ্ল্যাট, তবে শুধু একটার দরজা খোলা। প্রচণ্ড উন্মত্ত আবেগ অস্থির করে রেখেছে মনটাকে, ইচ্ছে হচ্ছে ঝড়ের বেগে ঘরে ঘরে ঢুকে তল্লাশি চালায়, যাকে সামনে পায় তাকেই গুলি করে। নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে রাখছে, হাতে বাগিয়ে ধরা পিস্তল, সাবধানে চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। এটা একটা সাজানো বৈঠকখানা, তবে সব কিছু তছনছ হয়ে আছে—উল্টে পড়ে আছে দুটো চেয়ার; ডিভানটা বাঁকা হয়ে আছে; কার্পেটে রক্তের গাঢ় দাগ দেখা যাচ্ছে।

উল্টোদিকের দরজা খোলা, সেখানে এক তরুণকে দেখা গেল, উঁকি দিয়ে দেখল আবদুল্লাহকে। তার হাতেও পিস্তল রয়েছে, সেটা আবদুল্লাহর দিকেই তাক করা।

‘কাওসার, তুই এখানে!’ তাকে চিনতে পেরে বলল আবদুল্লাহ। ‘পদ্মা কোথায়?’

‘দোস্তু, তুই অনেক দেরি করে ফেলেছিস। পদ্মার কথা ভুলে যাওয়া, কারণ ওকে দিয়ে তোর আর কোনো কাজ হবে না।’

‘মানে?’

‘এর আবার মানে জানতে চাইছিস? আরে বাবা, পদ্মা এতক্ষণে বাসি মাল হয়ে গেছে, দোস্তু। অর্জনের পর আমরা সবাই লাইন দিয়ে ওর কাছে যাব। লাইনে ইচ্ছে করলে তুইও থাকতে পারিস, যদি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চাস।’



হতাশায় ভেঙে পড়ল আবদুল্লাহ, নামিয়ে নিচ্ছে পিস্তল ধরা হাত, তারপর কোমরের কাছ থেকে গুলি করল, ঠিক যখন নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে মনে করছে কাওসার। হতাশায় ভেঙে পড়াটা ছিল আবদুল্লাহর ভান, কাওসারের জন্যে পাতা ফাঁদ।

বুলেটটা কাওসারের বাঁ বুকে লাগল। চৌকাঠের ওপর পড়ে গেল সে, তাকে উপরে পাশের ঘরে ঢুকল আবদুল্লাহ, দেখল আরেক তরুণ উল্টোদিকের দরজা দিয়ে পালাচ্ছে। তাকে লক্ষ্য করে তৃতীয় গুলিটা করল আবদুল্লাহ।

কাওসারের খুলির পেছনে বড় একটা গর্ত তৈরি হলো, সেটা থেকে যেন উল্লাসে অধীর হয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে এল টাকটকে লাল তাজা রক্ত। চৌকাঠের ওপর চিৎপটাং হয়ে পড়েছে, খিঁচুনি উঠে গেছে শরীরে, সেই অস্থির শরীরটাকে উপরে ছুটল আবদুল্লাহ, আরেক দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল পাশের ফ্ল্যাটে।

যতই তাড়াহুড়ো করুক, যতই উত্তেজিত হোক, ওর মাথার ভেতর অ্যালার্ম বাজছে, সেই অ্যালার্ম ওকে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে, পদ্মা চিৎকার করছে না।

কি আশ্চর্য, মেয়েটার কোনো সাড়া-শব্দ নেই কেন?

পদ্মা যদি বেঁচে থাকে, পদ্মা যদি সুস্থ থাকে, তাহলে সে চেষ্টাবে না? আবদুল্লাহর কাছে এ প্রশ্নের সম্ভাব্য যে উত্তর আছে সেগুলো সে মানতে রাজি নয়।

হতে পারে পদ্মা মারা গেছে।

পদ্মার হয়তো জ্ঞান নেই।

পদ্মা চিৎকার করছে, গলা ফাটাচ্ছে, কিন্তু তাকে অনেক দূরে সরিয়ে নেয়ার কারণে আবদুল্লাহ তা শুনতে পাচ্ছে না।

পদ্মা বেঁচে না থাকলে...

পাশের ফ্ল্যাটের সিঁড়ি বেয়ে ঝড়ের বেগে নামছে আবদুল্লাহ। একতলায় নামতে এক প্রস্থ সিঁড়ির আর মাত্র অল্প কটা ধাপ বাকি আছে, এই সময় ল্যান্ডিংয়ের ওপর অর্জনকে দেখতে পেল, এক হাত দিয়ে পৈঁচিয়ে ধরে আছে পদ্মার গলা। না, পদ্মা চিৎকার করছে না। কি করে করবে, তার মুখ আটকে রাখা হয়েছে টেপ দিয়ে। শুধু তাই নয়, পদ্মার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা।

হাতের পিস্তল পদ্মার কপালের পাশে ঠেকিয়ে রেখেছিল অর্জন, সিঁড়ির মাথায় আবদুল্লাহকে উদয় হতে দেখে সেটা ঘুরিয়ে ওর দিকে তাক করল।

দুজনের হাতের দুটো পিস্তল পরস্পরের দিকে তাক করা।

বাড়া ভাতে ছাই দিতে আসা আবদুল্লাহকে দেখে প্রচণ্ড আক্রোশে বাঘের মতো গর্জে উঠল অর্জন। গর্জন করতে হলে আপনাকে মুখ খুলতে হবে, অর্জনকেও খুলতে হলো।

দুজন একই সঙ্গে যে যার পিস্তলের ট্রিগার টেনেছে।

আবদুল্লাহর গুলি অর্জনের খোলা মুখে ঢুকল। সে ঢোক গিলতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো, কারণ ঢোক গিলতে হলে মুখের যে-সব মাংসপেশি আর অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্য দরকার হয়, সেগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে তার মাথার পেছন দিয়ে বেরিয়ে গেছে গুলি।

লক্ষ্য ভেদে অর্জনও কম যায় না, তার ছোঁড়া বুলেটও আবদুল্লাহর খুলি উড়িয়ে দিত। কিন্তু মুশকিল হলো নিজের পেছনে দাঁড়ানো পদ্মার কথা বেমালাম ভুলে গিয়েছিল অর্জন। সে যখন পিস্তলের ট্রিগার টানছে, পেছন থেকে তাকে ধাক্কা দিয়েছে পদ্মা, ফলে বুলেটটা আবদুল্লাহর মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

বিপদ কেটে গেছে, এটা উপলব্ধি করে ওই ল্যাভিংঙের ওপর দাঁড়ানো অবস্থায়, পরম স্বস্তির প্রাবল্যে, তরঙ্গিনী পদ্মা জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। ল্যাভিংঙের ওপর ঢলে পড়ে যাচ্ছে, দেখতে পেয়ে সিঁড়ির মাথা থেকে লাফ দিল আবদুল্লাহ, প্রায় উড়ে এসে ধরে ফেলল পদ্মাকে।

মাত্র দুই কি তিন মিনিট পরই জ্ঞান ফিরল। ইতিমধ্যে তার ঠোঁটে সাঁটা টেপ তুলে ফেলেছে আবদুল্লাহ, হাতের বাঁধন খুলে দিয়েছে, চোখে-মুখে ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়েছে। চোখ মেলার পর পদ্মা দেখল, আবদুল্লাহর কোলে মাথা রেখে সিঁড়ির ল্যাভিংঙে শুয়ে আছে সে, আবদুল্লাহ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

‘আর কোনো ভয় নেই,’ পদ্মা ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে আশ্বস্ত করল আবদুল্লাহ। ‘অর্জন হেরে গেছে। সে নেই। বাকি সবাই পালিয়েছে।’

‘কিন্তু তোমার কি হবে, তুমার?’ হঠাৎ সব কথা মনে পড়ে যাওয়ায় ঝট করে উঠে বসল পদ্মা, জড়িয়ে ধরল আবদুল্লাহকে। ‘কজনকে মেরেছ? গুলির আওয়াজ আমি বেশ কটা শুনেছি...এখানে আসার আগে তুমি আর কাকে-?’ উদ্বেগে আর আতঙ্কে কাহিল হয়ে পড়ছে।

‘তুমি হাঁটতে পারবে?’ পদ্মাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল আবদুল্লাহ। ‘তুমি যদি রাস্তায় বেরোতে পারো, আমি তোমাকে রিকশায় তুলে বাড়িতে রেখে আসি...’

‘আমাকে বাড়িতে রেখে আসবে-মানে?’ পদ্মা প্রশ্ন কোঁচকাল। ‘তুমি কোথায় যাবে, তুমার?’

‘থানায়,’ বলল আবদুল্লাহ। ‘আমাকে থানায় যেতে হবে, পদ্মা। একা শুধু অর্জন নয়, তার দুই শিষ্যও নেই।’

পদ্মাকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল আবদুল্লাহ, ঠিক সেই সময় পুলিশের একটা জিপ এসে থামল ওদের সামনে। জিপের পিছু নিয়ে এল পদ্মাদের গাড়ি, সেটা থেকে ওর মা-বাবা নামলেন।

ওদিকে একপাশে সরে গিয়ে ইন্সপেক্টরকে তখন আবদুল্লাহ বলছে, ‘স্যার, পদ্মাকে ওদের হাত থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে আমাকে গুলি করতে হয়েছে। কাওসার, জাহেদ আর অর্জন মারা গেছে। যদিও আমি আত্মরক্ষার জন্যে গুলি করতে বাধ্য হয়েছি, তারপরও আইনের ওপর শ্রদ্ধা রেখে আমি আত্মসমর্পণ করছি...’

আবদুল্লাহর বাড়ানো হাত থেকে পিস্তলটা নিলেন ইন্সপেক্টর। ‘এটা কি আপনার পিস্তল? লাইসেন্স আছে?’

‘হ্যাঁ, লাইসেন্স আছে.’ বলল আবদুল্লাহ, মুখটা শুকনো। ‘তবে, না, এটা আমার পিস্তল নয়। বাবার নামে লাইসেন্স।’

কথা না বলে গম্ভীর হয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর।

অনেক নামকরা উকিল রাখা হলেও, আত্মরক্ষার জন্যে গুলি করার যুক্তি আদালতের সামনে ধোপে টিকল না। বাড়ি থেকে পিস্তল নিয়ে বেরোনো উচিত হয়নি আবদুল্লাহর, বলেছেন সরকারি উকিল, এতে প্রমাণ হয় বিবাদী গুলি করার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছিলেন-কেউ তাকে বাধা না দিলেও তিনি গুলি করতেন বলে মনে হয়।

যাই হোক, মহামান্য আদালত দু’পক্ষের বক্তব্য শোনার পর রায় দিলেন। রায়ে বলা হলো, আবদুল্লাহ বড় ধরনের একটা অপরাধ ঠেকাতে গিয়ে গুলি করেছেন, এটা সত্যি। কিন্তু আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে আবার নিজেও অপরাধ করেছেন। কাজেই তাকে সাজা পেতে হবে। তবে সেটা কম করে দেয়া হলো।

সাত বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড।

সাত বছর খুব একটা বেশি সময় নয়। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। মা-বাবাকে পদ্মা জানাল, জেল থেকে ছাড়া পাবার পর তুষারের সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে। তাতে ওর মা-বাবা আপত্তি করার মতো কিছু দেখলেন না। এরপর পদ্মা আবদার ধরল, আগামী সাত বছর ওর তুষারকে সরকার যে জেলখানাতেই বন্দি

করে রাখুক, সেই জেলখানার যতটা কাছে সম্ভব পাঁচ-সাততলা একটা বাড়ি ভাড়া করতে হবে, যাতে সেই বাড়ির ওপরতলা থেকে প্রতিদিন অন্তত একবার তুম্বারকে যেন সে দেখতে পায়।

মেয়ের এই আবদার বিনা প্রতিবাদে রক্ষা করছেন মা-বাবা। এর আগে যে জেলখানায় রাখা হয়েছিল আবদুল্লাহকে, সেটার কাছাকাছি একটা বাড়ির ছাদ থেকে পাঁচিল ঘেরা উঠান দেখা যেত, প্রতিদিন বিকেলে সেই উঠানে বেরিয়ে আবদুল্লাহ দেখতে পেতো তার প্রেমিকা ছাদের রেইলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রায় সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটছে কাঠফাটাতে। রোজ বিকেলে সেল থেকে বেরিয়ে উঠানে চলে আসে আবদুল্লাহ, এসেই উত্তর-পূর্ব দিকে তাকায়।

কাঠফাটা থেকে দূরে, প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে, সাততলা একটা নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে। সেই বাড়ির চিলেকোঠায় আছে ছোট্ট একটা জানালা। ওই জানালার কাচ কখনও খোলা হয় না। জানালার ভেতর কি আছে বা কে আছে তা আমাদের কখনও জানা হতো না, যদি না তুম্বার আবদুল্লাহ আমাদের বলত।

আবদুল্লাহ আমাদের বলেছে, নির্দিষ্ট একটা সময়ে ওই জানালার সামনে বসে থাকে ওর প্রেমিকা তরঙ্গিনী পদ্মা। আর ওই মেয়ের হাতে থাকে একটা শক্তিশালী দূরবীণ। সেটা চোখে সঁটে অপেক্ষা করে কাঠফাটার উঠানে কখন বেরিয়ে আসবে তার মনের মানুষ তুম্বার আবদুল্লাহ।

এটা স্বীকার না করে উপায় নেই যে এরকম জমজমাটা প্রেমকাহিনি সচরাচর শুনতে পাওয়া যায় না।

হয়.

সেই যে লন্ড্রির পেছনে সখিদের সঙ্গে উদ্যমের নোংরা ঝামেলা শুরু হয়েছিল, তিন বছর পর একটা ঘটনার মধ্যে দিয়ে অবশেষে মিটল সেটা। এই ঘটনা তার লন্ড্রি থেকে বেরিয়ে আসারও সুযোগ তৈরি করল, যেখানে হাড়ভাঙা শ্রম দিতে হচ্ছিল তাকে।

আপনারা হয়তো লক্ষ করেছেন এমন পর্যন্ত আমি যা বলেছি সবই কারও না কারও কাছ থেকে শোনা- কেউ একজন কিছু দেখে আমাকে বলেছে, আমি সেটা আপনাকে জানিয়েছি। বলতে গিয়ে অনেক কিছুই আমি বেশি সহজ করে ফেলেছি, আবার কোনো ঘটনা হয়তো পাঁচ-সাত হাত ঘুরে আসায় পুনরাবৃত্তি করা হয়ে গেছে, এবং পরেও হয়তো হবে। এখানের এটাই ধরন। একগাদা

মিথ্যে আর গুজবের ভেতর থেকে এক টুকরো সত্য বের করে আনা সহজ কাজ নয়।

আপনি সম্ভবত এটাও আইডিয়া করতে পেরেছেন যে আমি যে ব্যক্তির বর্ণনা দিতে বসেছি সে যতটা না একজন পুরুষ, তারচেয়ে বেশি একটা কিংবদন্তি। আমি আপনার সঙ্গে একমত হয়ে বলতে চাই এর মধ্যে কিছু সত্যতা আছে। আমরা যারা দীর্ঘ মেয়াদে সাজা ভোগ করছি, যারা উদ্যমকে বহু বছর ধরে চিনি, সবাই টের পাই ফ্যান্টাসির কিছু উপাদান ঘিরে রাখে তাকে, যেন মিথ আর ম্যাজিকে মোড়া একজন রহস্যময় মানুষ—যদি ধরতে পেরে থাকেন ঠিক কি বলতে চাইছি আমি। যে গল্পটা এখন আমি বলতে যাচ্ছি তাতে দেখা যাবে বোগাস হীরাতে বড় পদে কাজ পেতে দেয়নি উদ্যম, সেটা ওই মিথের অংশ; এবং টানা তিনটে বছর কিভাবে সে সখিদের সঙ্গে একা লড়ে গেছে, তাও ওই মিথ তৈরি হতে কাজে লেগেছে, সেই মিথেরই অংশ লাইব্রেরিতে তার কাজ পাওয়া। তবে এসব ঘটনার সঙ্গে এর আগে বলা গল্পের পার্থক্য আছে, কারণ আগের গল্পগুলো ছিল লোক মুখে শোনা, আর পরের ঘটনা যা কিছু যখন ঘটেছে আমার উপস্থিতিতে ঘটেছে, এবং আমি আমার জন্মদাত্রী মায়ের কসম খেয়ে বলছি এগুলো সবই সত্যি ঘটনা। আপনার হয়তো ভাবছেন খুনের অপরাধে সাজা পাওয়া একজন কয়েদির কসমের কি আর দাম। তবু, এটা বিশ্বাস করতে বলি, আমি মিথ্যে বলি না।

ততদিনে উদ্যমের সঙ্গে বেশ ভালোই সম্পর্ক তৈরি হয়েছে আমার, প্রায়ই দেখা হয়, আর দেখা হলে আমরা কথা বলি। এই লোক আমাকে অবাক করে। পেছনের দিকে ফিরে গেলে সেই পোস্টার প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে, অবহেলার কারণে আপনাকে জানানো হয়নি। এখন মনে হচ্ছে জানানো দরকার। মধুবালাকে সেলের দেয়ালে লটকাবার পাঁচ সপ্তাহ পর (ততদিনে ওটার কথা ভুলে গেছি আমি, নতুন আরও অনেক ব্যবসার কাজে ব্যস্ত হয়ে ওঠার কারণে), লোটা বাবু ছোট সাদা একটা বাক্স গ্রিলের ফাঁক দিয়ে আমার সেলে ঢুকিয়ে দিল।

‘উদ্যম পাঠিয়েছেন,’ নিচু গলায় বলল সে, মেঝে মোছার কাজে এক পলক বিরতি না দিয়ে।

‘ধন্যবাদ, লোটা,’ বলে আমি তার হাতে এক প্যাকেট বগা ধরিয়ে দিলাম।

ভাবছি কি জিনিস হতে পারে ওটা। বাক্স খুলে আবরণ সরালাম। প্রচুর তুলো দেখতে পাচ্ছি, তার নিচে...

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম সেদিকে। কয়েক মিনিট পার হয়ে গেল, ওগুলো আমার ছুঁয়ে দেখার সাহস হলো না, এতই সুন্দর। জেলে সুন্দর জিনিসের প্রচণ্ড অভাব, এবং এটা সত্যি করুণা জাগার মতো একটা বাস্তবতা যে এখানে সুন্দর জিনিস যে নেই সেটা কেউ খেয়ালও করে না, সৌন্দর্যের অনুপস্থিতি ওদেরকে সৌন্দর্যের অস্তিত্বের কথাই ভুলিয়ে দিয়েছে।

বাক্সে দুটুকরো কোয়ার্টাজ রয়েছে, দুটোই খুব সতর্কতার সঙ্গে পালিশ করা। পানিতে ভেসে আসা কাঠের আকৃতি ওগুলোর, লোহা থাকায় সোনার কণার মতো চকচক করছে। এত বেশি ভীর না হলে পুরুষের কাফ-লিঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করা যেত, আকৃতির দিক থেকে দুটোর মধ্যে এত মিল।

এগুলো তৈরি করতে কতটা খাটতে হয়েছে তাকে? আলো নিভে যাবার আগে নয়, পরে, এটা আমার জানা আছে; এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় দিতে হয়েছে। প্রথমে কেটে সাইজ করা, তারপর ওই রক-ব্ল্যাক্টে দিয়ে পালিশের পর পালিশ, তা যেন আর শেষ হতে চায় না। এত কষ্ট করে বানানো এরকম সুন্দর একটা জিনিস কাউকে উপহার দেয়া, এর অনেক মূল্য। মানুষ এটা পারে বলেই পশুদের সঙ্গে সে আলাদা। আমি আরও একটা কারণে বিহ্বল হয়ে পড়লাম, ওই লোকের নিষ্ঠা বা লেগে থাকার ধরন অনুধাবন করে, সেটা নিজের ওপর প্রায় অত্যাচারের মতো। তবে উদ্যম হাসান ঠিক কতটা লেগে থাকতে পারে সে-সম্পর্কে আমার পরিষ্কার ধারণা হলো আরও অনেক পরে।

সিদ্ধান্ত হলো সাইনবোর্ড তৈরির কারখানার ছাদে আলকাতরা লাগাতে হবে। রোদ তেতে ওঠার আগেই কাজটা শেষ করার কথা বলা হলো, ধারণা করা হয়েছে সব মিলিয়ে সাত দিন লাগবে এবং সবাইকে ডেকে বলা হলো যারা স্বেচ্ছাসেবক হতে চায় তারা হাত তোলো।

সত্তরজন লোক শুধু হাত তুলল না, রীতিমতো হইচই বাধিয়ে দিল। এর কারণ হলো কাজটা চারদেয়ালের বাইরে, আর মে মাসটা বাইরে কাজ করার জন্যে খুব ভালো। কাগজের টুকরোয় সবার নাম লিখে নয় কি দশজনকে খেনয়ার জন্যে লটারি করা হলো, ভাগ্যক্রমে উদ্যম আর আমার নাম উঠে গেল।

পরের সপ্তাহ থেকে শুরু হলো কাজ। সকালের নাস্তা শেষ হলে মার্চ করে উঠানে জড়ো হই আমরা। আমাদের সামনে পেছনে দুজন করে গার্ড থাকে, আর টাওয়ারের গার্ডরা তো চোখে ফিল্ডগ্লাস স্টে সারাক্ষণই নজর রাখছে। সকালের মাঝে আমরা চারজন একটা এক্সটেনশন মই নিয়ে যাই। ওটাকে একটা নিচু দালানের গায়ে খাড়া করা হয়। তারপর আমরা বালতি করে গরম আগুন

আলকাতরা ছাদে তুলি। ওই টার আপনার গায়ে একটু লাগলে হয় শুধু, সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে।

এই প্রজেক্টে ছ'জন গার্ড ডিউটি দিচ্ছে, বাছাই করে শুধু যারা সিনিয়র কয়েদি তাদের নেয়া হয়েছে। তাদের কাছে গোটা ব্যাপারটা প্রায় এক সপ্তাহ ছুটি কাটানোর মতো। লজ্জিতে পাহারায় দাঁড়িয়ে ঘাম ঝরানো বা কারখানায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোহা পেটানোর শব্দ সহ্য করার চেয়ে হাজার গুণ ভালো এটা।

এখানে ওরা অলস সময় কাটাচ্ছে, কখনও বল খেলছে, কখনও গাছের গায়ে হেলান দিয়ে ঝিমাচ্ছে। আমাদের ওপর খুব একটা নজর রাখার দরকার পড়ে না তাদের, কারণ দক্ষিণ পাঁচিলে বসানো সেন্সিটিভ পোস্ট এত কাছে, চাইলে মুখের চিবানো ছিবড়ে আমাদের গায়ে ছুঁড়ে দিতে পারে ওরা। যারা ছাদ সিল করছে তাদের কাউকে যদি উদ্ভট ধরনের নড়াচড়া করতে দেখা যায়, তাকে একজোড়া .৪৫ ক্যালিবারের মেশিন-গানের ঝাঁক ঝাঁক বুলেট দিয়ে ছিন্নভিন্ন করতে সময় লাগবে মাত্র চার সেকেন্ড। কাজেই গার্ড যারা ডিউটি দিচ্ছে, দিব্যি খোশ মেজাজে আছে তারা, ছুটির আমেজ উপভোগ করছে। এখন ওদের দরকার শুধু বরফে ঢুকিয়ে রাখা গোটা ছয়েক সোডা ওয়াটারের বেতল, তাহলেই সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে সুখী প্রাণী বলে মনে করবে নিজেদের।

ওদের একজনের নাম দবির খান। এই জেলে আমার চেয়ে আগে থেকে আছে। আর আছে খুঁতখুঁতে স্বভাবের মুজার আলি। কিছুদিন আগেও ওয়ার্ডেনের দায়িত্ব পালন করার সুবাদে এই মুজার আলিই কাঠফাটায় সবার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছিল। পেনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ওপর তার একটা ডিগ্রি আছে। কেউ তাকে পছন্দ করে না, আমি যতটুকু বুঝতে পারি, শুধু যারা তাকে এই পদে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে তারা বাদে। এই জেলখানার কোনো বিষয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই, সে শুধু কিছু তথ্য জড়ো করতে চায়, যেগুলোর সাহায্যে একটা বই লিখবে, এবং সেটা ছাপবে আমেরিকার না ইংল্যান্ডের কোনো প্রকাশক, তবে ছাপা বাবদ সব খরচ মুজার আলিকেই বহন করতে হবে। ভালো ফুটবল খেলে সে। জেলের প্রশাসনিক শাখায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করত, সেটা হারায় গাড়ি মেরামত বাবদ যে বিল তৈরি করা হয়েছে, তাকে ডিসকাউন্টের মাত্রা অনেক বেশি হওয়ায়। তদন্তে বেরিয়ে আসে ওখান থেকে চুরি করা টাকা ধীমান চট্টো আর দবির খানের সঙ্গে ভাগাভাগি করে দিয়েছে সে। দবির আর ধীমান নিজেদের গা বাঁচাতে পেরেছে—তারা পুরনো পাপী, আগে থেকে সতর্ক ছিল—ছাঁকাটা একা মুজারকে খেতে হয়। তাকে সরে যেতে দেখে কেউ দুঃখ

পায়নি, তবে তার জায়গায় ধীমান চট্টোকে উঠে আসতে দেখেও খুশি হয়নি কেউ।

ধীমান ছোটখাট লোক, পেট শক্ত লোহা বললেই হয়, আর তার মতো ঠাণ্ডা চোখ দেশে আর কারও আছে কিনা সন্দেহ। তার মুখে সব সময় কষ্টের একটু হাসি লেগে থাকে, যেন এই মুহূর্তে তার একবার বাথরুমে যাওয়া দরকার, কিন্তু তা সে যেতে পারছে না। ওয়ার্ডেন হিসেবে ধীমান দায়িত্ব নেয়ার পর কাঠফাটায় অনেক নির্ভুর ঘটনা ঘটেছে, যদিও আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই, তারপরও বিশ্বাস করি জ্যোছনা রাতে জেলখানার পূর্বপাশের বনভূমিতে অন্তত আধ ডজন কবর দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। মুক্তার আলি খারাপ ওয়ার্ডেন ছিল, কিন্তু ধীমান ছিল নির্দয় একটা বর্বর।

ধীমান আর দবির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওয়ার্ডেন হিসেবে মুক্তার আলি শুধু পদের অধিকারী ছিল, তার সব কাজ করে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছিল ধীমান, ধীমানের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে বেশিরভাগ কাজ করে দিত দবির। বলতে গেলে এই দবিরই জেলখানা চালাত।

দবির বেশ লম্বা, নড়াচড়ায় আড়ষ্ট ভাব, মাথার চুল কমে এসেছে। লোকটা চড়া গলায় কথা বলে, তার নির্দেশে আপনি যদি দ্রুত সাড়া না দেন, হাতের ছড়ি দিয়ে আপনাকে আঘাত করবে। সেদিন, ছাদে আমাদের তৃতীয় দিন চলছে, দবির আরেক গার্ড আবুল কাদেরের সঙ্গে কথা বলছিল।

দবির খানের কাছে অবাক করার মতো একটা ভালো খবর আছে, কাজেই সেটা সে শক্ত পাহারা দিয়ে রেখেছে। এটাই তার স্টাইল। এই লোক কাউকে ধন্যবাদ দিতে জানে না, জীবনে বোধহয় কাউকে কখনও একটা ভালো কথা বলেনি, এমন একজন লোক যে নিজেকে বিশ্বাস করিয়েছে গোটা দুনিয়ার লোকজন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

ওখানে বসে চড়া গলায় একটু একটু করে গল্পটা আবুল কাদেরকে শোনাচ্ছে দবির, আমরাও সেটা শুনছি; তার চওড়া সাদা কপাল ইতিমধ্যেই রোদ লেগে লালচে হয়ে উঠেছে। তার একটা হাত নিচু পাঁচিলের উপর পড়ে আছে, ছাদের কিনারা বরাবর তৈরি করা হয়েছে ওই পাঁচিল। তার আরেক হাত .৩৮ রিভলভারের বাঁটে।

দবির খানের গল্পটা হলো, তার বড় ভাই কমবেশি চোদ্দো বছর আগে লাপাত্তা হয়ে গিয়েছিল, সেই থেকে পরিবারের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ ছিল না। সবাই ধরে নিয়েছিল মারা গেছে সে, এবং সবাই খুশি মনে ব্যাপারটা মেনেও নিয়েছিল। তারপর, এই দিন দশেক আগে, রাজশাহী থেকে এক উকিল



ফোন করেছেন। এখন জানা যাচ্ছে দবির খানের ভাই মারা গেছে মাত্র চারমাস আগে, এবং সে মারা গেছে প্রচুর ধন-সম্পত্তি রেখে। লোকটা নদীতে ডোবা লঞ্চ-স্টিমার তোলার ব্যবসা করত, তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির মূল্য আন্দাজ করা হয়েছে তিন কোটি টাকা।

না, দবির খান কোটিপতি হয়ে যায়নি। তা হলে এমনকি তার মতো মানুষও খুশি হতো, কিছু সময়ের জন্যে হলেও, কিন্তু তার ভাই সব টাকা তাদেরকে দিয়ে যায়নি, দিয়েছে মাথা পিছু বিশ লাখ করে, বাদবাকি সব এতিমখানা আর মসজিদে দান করে গেছে। মন্দ কি। বিশ লাখই কে কাকে দেয় বা কোথেকে আসে।

কিন্তু দবির খানের কাছে গ্লাস সব সময় অর্ধেক খালি। তার খুব ইচ্ছে একটা গাড়ি কিনবে। ‘কিন্তু কিভাবে কিনব, ট্যাক্স দিতেই তো ফকির হয়ে যেতে হবে আমাকে। তারপর আছে মেরামত আর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ। বাচ্চারা আবদার ধরবে, টপ খোলা অবস্থায় আমাদের বেড়াতে নিয়ে চলো...’

‘একটু বড় হলে, ওরা নিজেরা চালাতে চাইবে,’ বলল কাদের, সে জানে কিভাবে তেল মারতে হয়।

‘গুধু চালাতে চাইবে?’ মাথা নাড়তে লাগল দবির। ‘বলবে টাকা দাও, গাড়ি চালানো শিখে আসি।’ শিউরে উঠল সে। ‘বছর শেষে কি দাঁড়াবে? দেখা যাবে জমা টাকা সব শেষ, ট্যাক্সের টাকা পকেট থেকে দিতে হচ্ছে। তারপর আসবে ইনকাম ট্যাক্সঅলারা। মাথায় একেবারে বাজ ফেলে দেবে না!’

মুখ বেজার করে বসে থাকল দবির, ভাবছে বিশ লাখ টাকা পাওয়ায় কপালটা তার কিভাবে ফেটেছে। পনেরো ফুট দূরেও নয়, বড়সড় একটা ব্রাশ দিয়ে ছাদে আলকাতরা লাগাচ্ছে উদ্যম হাসান। সেটা ছুঁড়ে বালতিতে ফেলল সে, তারপর হেঁটে এল যেখানে দবির আর কাদের বসে রয়েছে।

আমরা সবাই শক্ত হয়ে গেলাম। দেখলাম গার্ডদের একজন, তার নাম গিয়াস দীন, হাতটা টেনে হোলস্টারে ভরা পিস্তলের কাছে নিয়ে গেল। সেন্সিটিভ টাওয়ারে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডদের মধ্যে একজন তার সঙ্গীর হাতে কোটা মারল, তারপর দুজনেই ঘুরে এদিকে তাকাল। মুহূর্তের জন্যে আমার মনে হলো উদ্যম গুলি খেতে যাচ্ছে, কিংবা ওর মাথায় লাঠি (ব্যাটন) ভাঙা হচ্ছে।

তারপর তাকে বলতে শুনলাম, খুবই নরম সুরে দবির খানের দিকে তাকিয়ে, ‘তুমি তোমার স্ত্রীকে বিশ্বাস করো?’

দবির শ্রেফ তার দিকে তাকিয়ে থাকল। সবারই দেখতে পাচ্ছে তার মুখ ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠছে, এবং আমি জানি এটা খুব খারাপ লক্ষণ। খুব বেশি হলে

আর তিন সেকেন্ডের মধ্যে সে তার ব্যাটন টেনে নিয়ে সরাসরি উদ্যমের সোলার প্লেস্সাসে আঘাত করবে, যেখানে শ্লায়র বড় থোকাটা আছে। ওখানে খুব জোরে লাগলে মানুষ মারা যাবে, অথচ সব সময় ওখানেই মারে তারা। ওই আঘাতে আপনি যদি মারা না যান, এত লম্বা সময়ের জন্যে পঙ্গু হবেন যে মনে থাকবে না কি চমকপ্রদ চাল দেয়ার কথা আপনি ভেবেছিলেন।

‘বাপ,’ দবির খান বলল, ‘তোমাকে আমি শ্রেফ একটা সুযোগ দিচ্ছি হাড়-মাংস যাই থাক নিয়ে কেটে পড়ো। তারপর কিন্তু এই ছাদ থেকে মাথা দিয়ে নামতে হবে তোমাকে।’

উদ্যম তার দিকে তাকিয়ে থাকল, একদম শান্ত আর স্থির। তার চোখ দেখলাম বরফ। ভাব দেখে মনে হলো দবিরের কথা শুনতে পায়নি। আমার দেখলাম তাকে বলতে ইচ্ছে করছে এই পরিস্থিতির কি অর্থ, তার আসলে কি করা উচিত ছিল। উচিত ছিল গার্ডদের জানতে না দেয়া তারা কি বলছে তুমি তা শুনছ, এবং তাদের আলাপের মাঝখানে কখনও ঢুকে পড়তে নেই, যদি না তারা তোমাকে ঢুকতে বলে (এবং তখনও তুমি তাদেরকে এমন সব কথা বলবে যেগুলো তারা শুনতে চায়, এবং তারপর আবার বোবা হয়ে যেতে হবে)। আমি উদ্যমকে বলতে চাইলাম এখানে এদের হাতে খুন হওয়া ডালভাত। বলতে চাইলাম এরচেয়ে অনেক কম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে লোকজনকে আমি নুনা হারাতে দেখেছি, হারাতে দেখেছে আঙুল বা কান, এমনকি জানও। আমার তাকে বলতে ইচ্ছে হলো তোমার বেলায় অনেক দেরি হয়ে গেছে হে। এখন সে ফিরে গিয়ে ব্রাশটা তুলে নিতে পারে, বলা যায় না তাতে হয়তো এ যাত্রায় তার প্রাণটা রক্ষা পেলোও পেতে পারে, তবে আজ হোক কাল হোক গোসলখানায় সখিরা তোমার জন্যে অপেক্ষায় থাকবে, পালা করে তোমার ওপর চড়বে তারা, সবশেষে পাকা চতুরে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে যাবে। তাকে আমার বলতে ইচ্ছে করল, যতটুকু খারাপ হবার হয়েছে, এরচেয়ে খারাপের দিকে যেন না নিয়ে যায়।

আমি যা করলাম তা হলো ছাদে যেমন আলকাতরা লাগাচ্ছিল তেমনি লাগাতে থাকলাম, যেন কোথাও কিছু ঘটেনি বা ঘটছে না। বাকি সবার মতো আমিও প্রথমে নিজের স্বার্থ দেখছি। সেটাই আমাকে দেখতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই।

উদ্যমকে বলতে শুনলাম, ‘হতে পারে আমার বলায় মধ্যে ভুল আছে। স্ত্রীকে তুমি বিশ্বাস করো বা না করো, সেটা কোনো ব্যাপার নয়। ব্যাপার হলো তোমাকে সে পেছন থেকে ল্যাং মারার চেষ্টা করবে বলে সন্দেহ করো কিনা।’

দবির দাঁড়াল। কাদের দাঁড়াল। গিয়াস দাঁড়াল। দবিরের চেহারা এখন কালচে লাল। ‘তোমার একমাত্র সমস্যা,’ বলল সে, ‘এটা জানা যে কটা হাড় ভাঙেনি। সেটা তুমি গুনবে হাসপাতালে গিয়ে। এসো, কাদের। এই গুথেকোকে আমরা নিচে ফেলে দিই।’

গিয়াস দীন তার পিস্তল বের করল। বাকি আমরা সবাই চেখে পাগলা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছি। গায়ে কামড় দিচ্ছে রোদ। সন্দেহ নেই কাজটা করতে যাচ্ছে ওরা। দবির আর কাদের স্রেফ ছাদ থেকে ফেলে দেবে উদ্যমকে। মারাত্মক দুর্ঘটনা। উদ্যম, ৩৩৪১৮-কাঠফাটা, দুটো খালি বালতি নিয়ে মই বেয়ে নিচে নামার সময় পা পিছলে পড়ে মারা গেছে। দুঃখজনক।

তাকে ধরল ওরা, কাদের খামচে ধরল তার ডান হাত, দবির বাম হাত কজা করল। উদ্যম বাধা দিল না। তার চোখ ঘোড়ামুখো দবিরের ওপর থেকে একবারও সরছে না।

‘তাকে যদি তুমি নিজের আঙুল দিয়ে দাবিয়ে রাখতে পারো, দবির মিয়া, তাহলে,’ আবার মুখ খুলল সে, একই শান্ত এবং সংযত গলায় বলল, ‘ওই টাকার প্রতিটি পয়সা তাকে না দেয়ার আমি তো কোনো কারণ দেখি না। চূড়ান্ত ফল, দবির খানের বিশ লাখ বিশ লাখই থাকবে, সরকার শুধু চেয়ে চেয়ে দেখবে আর ঢেকুর তুলবে।’

কাদের তাকে টানতে টানতে ছাদের কিনারায় নিয়ে যাচ্ছে। দবির স্রেফ অটল দাঁড়িয়ে। এক সময় মনে হলো উদ্যম একটা রশি, তাকে দূদিক থেকে টানাটানি করছে ওরা। তারপর দবির বলল, ‘এক সেকেন্ড থামো, আবুল। কি বলতে চাও তুমি, বাপ?’

‘আমি বলতে চাইছি, তোমার যদি স্ত্রীর ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে, ওই টাকাটা সব তুমি তাকে দিয়ে ফেলতে পারো,’ বলল উদ্যম।

‘তোমার কথার অর্থ থাকতে হবে, বাপ, তা না হলে তোমাকে আমরা নিচে ফেলে দেব।’

‘সরকার নতুন আইন করেছে, স্বামী তার স্ত্রীকে একবার এককালীন উপহার হিসেবে টাকা দিতে পারবে,’ বলল উদ্যম। ‘যে কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে চল্লিশ লাখ টাকা পর্যন্ত দিতে পারবে।’

দবির খান প্রায় হাঁ করে তাকিয়ে আছে উদ্যমের দিকে। ‘না, এটা ঠিক নয়,’ বলল সে। ‘ট্যাক্স ফ্রি?’

‘ট্যাক্স ফ্রি,’ বলল উদ্যম। ‘ইনকাম ট্যাক্স ওই টাকার একটা পয়সাও নিতে পারবে না।’

‘এরকম একটা বিষয় তুমি জানলে কিভাবে?’

গিয়াস বলল, ‘ব্যাক্সার আছিল, দবির। আমার মনে হইতাছে হালার পুত...’

‘অ্যাই পুঁটির বাচ্চা, তুই তর ফুটা বন্ধ কর,’ তার দিকে না তাকিয়ে ধমক দিল দবির খান। ধমক খেয়ে মুখ হাঁড়ি করল গিয়াস, তবে আর কিছু বলল না। দবির একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে উদ্যমের দিকে। ‘তুমি বাপ সেই স্মার্ট ব্যাক্সার, নিজের বউকে খুন করেছ। তোমার মতো একজন স্মার্ট ব্যাক্সারকে আমি বিশ্বাস করব কেন? শেষ পর্যন্ত আমিও তোমার মতো এখানে বসে পাথর ভাঙব নাকি? কাজটা তুমি খুব ভালোবাসো, তাই না?’

‘ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ায় এদেশে কারও জেল হয়েছে বলে আমার জানা নেই,’ বলল উদ্যম। ‘আর ট্যাক্স তোমরা ফাঁকি দিচ্ছও না। সরকার বলেছে স্ত্রীকে গিফট দিলে ট্যাক্স দেয়া লাগবে না।’

‘আমার ধারণা তুমি মিথ্যে কথা বলছ,’ বলল দবির, তবে নিজেও কথাটা এখন বিশ্বাস করছে না।

‘না, আমি মিথ্যে কিছু বলছি না। আমার মুখের কথা তোমাকে বিশ্বাস করতে হবেও না। ইনকাম ট্যাক্সের একজন উকিলকে ধরো, তিনি সব বুঝিয়ে দেবেন।’

‘ওরা তো শুনেছি ডাকাতের চেয়েও খারাপ,’ মাথা নাড়ছে দবির।

উদ্যম কাঁধ ঝাঁকাল। ‘তাহলে কর অফিসে যাও, ওরা সব বুঝিয়ে দেবে। নিজে বোঝো, কারও কথা বিশ্বাস করার দরকার নেই।’

‘কর অফিসে যেতে ভয় করে...’

‘কাজটা আমিও করে দিতে পারি, ফি প্রায় না দিলেও চলবে,’ বলল উদ্যম। ‘আমার সহকর্মীদের একটা করে সোডা ওয়াটার খাওয়ালে...’

‘হিহিহি, সহক্রিমি,’ বলল গিয়াস, সশব্দে চাপড় মারল নিজের হাঁটুতে।

‘তুই ব্যাটা পুঁটিকা বাচ্চা চুপ যা কইলাম,’ দাঁত-মুখ খিচিয়ে বলল দবির খান। গিয়াস চুপ মেরে গেল। দবির আবার উদ্যমের দিকে তাকাল। ‘তুমি বাপ বলছ আমার এই সমস্যার সুন্দর একটা সমাধান করে দেবে? তা তুমি সত্যি সত্যি পারবে?’

‘এটা আমার জন্যে কোনো সমস্যা না,’ বলল উদ্যম।

সেদিন ওখানে আর যারা উপস্থিত ছিল তাদের সবার সঙ্গে কথা বলেছি আমি-রনো টিপরা, কাজী লিয়াকত, ধীরেন পাল-আমি যা ভেবেছি, তারাও তাই ভেবেছে। এবং আমরা দেখলাম উদ্যমের কথাই শুনে সবাই, তাকে গুরু মেনে নিয়েছে এই জেলখানার কঠিনতম সব পাত্রা।

‘সোডা ওয়াটার না, আমার যদি ইচ্ছা হয় আমি তোমাকে দু’বোতল বিয়ার খাওয়াব,’ ভারী গলায় বলল দবির খান।

‘আর আমি তোমাকে এক টুকরো দামী পরামর্শ দেবো—টাকাটা বউকে গিফট দাও, সত্যি যদি তার ওপর তোমার আস্থা থাকে, যদি জানো যে সে তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।’

‘বিশ্বাসঘাতকতা?’ কর্কশ গলায় বলল দবির খান। ‘আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে? তাকে যদি একটা বটগাছ চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে হয়, তারপরও আমার অনুমতি ছাড়া দূষিত বাতাস ছাড়তে সাহস হবে না তার।’

দবিরের দুই সঙ্গী মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে হাসছে।

কিন্তু উদ্যমের মুখে হাসি নেই। ‘ব্যাঙ্কে লোক পাঠিয়ে ফর্মটা আনিয়ে দাও, আমি সেটা পূরণ করে দেব,’ বলল সে। ‘তারপর তোমার সই লাগিয়ে ওই ব্যাঙ্কেই জমা দিয়ে আসতে হবে।’

কথাটা শুনতে খুব গুরুত্বপূর্ণ লাগল, দবির খানের বুক ফুলে উঠতে দেখলাম আমরা। তারপর পালা করে সবার দিকে তাকাল সে, হুক্কার ছেড়ে বলল, ‘তুমরা ইদিক তাকায়া কি দেখতাছ? পাছা ঘুরাও হালারা!’ ব্যক্তি ভেদে তার ভাষা বদলে যাচ্ছে। আবার উদ্যমের দিকে তাকাল। ‘তুমি বাপ আমার কাছে সরে এসো, তারপর ভালো করে শোনো আমি কি বলি। তুমি যদি কোনো ভাবে আমাকে বোকা বানিয়ে থাকো, এক সপ্তাহও পার হবে না, তোমার মাথাটা গোসলখানার পাকা চতুরে গড়াগড়ি খাবে—বুঝেছ তো?’

‘হ্যাঁ, বুঝেছি,’ বলল উদ্যম।

হ্যাঁ, তা সে বুঝেছিল। জিনিসটা যেভাবে পরিণতি পেল, উপলব্ধি করলাম আমার চেয়ে অনেক বেশি বুঝেছে উদ্যম—আমাদের যে কারও চেয়ে বেশি।

এভাবেই ফ্যান্টারির ছাদে, আলকাতরা লাগানোর কাজ শেষ হবার দুদিন আগে, সাজা পাওয়া কয়েদিরা সকাল দশটার রোদে লাইন দিয়ে বসে বিয়ার খেয়েছিল। তবে উদ্যম খায়নি। আমি আগেই তার মদ খাওয়ার অভ্যাস সম্পর্কে জানিয়েছি আপনাকে। শেডের ছায়ায় বসেছিল সে, দু’হাঁটুর মাঝখানে ঝুলে আছে হাত, আমাদের দেখছে আর একটু একটু হাসছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে কত লোক ওই ভঙ্গিতে মনে রেখেছে তাকে।

সেই থেকে উদ্যমকে আর বিরক্ত করেনি সখিয়ার। দবির আর ধীমান নির্দেশটা জায়গামতো পৌঁছে দিয়েছিল। এরপর থেকে উদ্যমের আভারঅয়্যারে যদি এক ফোঁটা রক্তও দেখা যায়, কাঠফাটার প্রত্যেক সখিকে প্রচণ্ড মাথাব্যথা

নিয়ে শুতে যেতে হবে। এই নির্দেশ আর হুমকি নিয়ে কেউ তর্ক করতে যায়নি। আগেই বলেছি, ওদের শিকারের কোনো অভাব হয় না, প্রায় প্রতিদিনই নতুন কয়েদি ঢুকছে কাঠফাটায়। যাই হোক, এর পর থেকে উদ্যম নিজের পথে থাকল, সখিরা থাকল তাদের আলাদা পথে।

উদ্যম তখন লাইব্রেরিতে নতুন কাজ নিয়েছে, পুরনো কয়েদি কঠিন পাত্র সমিরুল হকের অধীনে। কলেজে পড়াশোনা করেছে হক, তাই লাইব্রেরির দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তাকে। হক এই দায়িত্ব গত ত্রিশ বছর ধরে পালন করে আসছিল। তার ডিগ্রি ছিল পশুপালন বিষয়ে। এবং যতই হাস্যকার শোনাক কাঠফাটায় তখন সেই ছিল সবচেয়ে শিক্ষিত কয়েদি। তাই তাকেই লাইব্রেরিয়ান বানানো হয়েছিল। জুয়া খেলায় হেরে যাওয়ার পর স্ত্রী আর কন্যা তাকে যাচ্ছেতাই বলে গালিগালাজ করায় রাগের মাথায় তাদেরকে খুন করে ফেলেছিল হক।

আটষষ্টি বছর বয়সে ঢোলা প্যান্ট আর কালো কোট পরা সমিরুল হক যখন বাতে আক্রান্ত পা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কাঠফাটার গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, এক হাতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক দণ্ড মওকুফের কাগজ, আরেক হাতে বাসের টিকিট, ঝরঝর করে চোখের পানি ফেলছিল সে। একুশ বছর বয়স থেকে কাঠফাটা ছিল তার জীবন এবং জগত। জেলখানায় হকের একটা গুরুত্ব ছিল। সে ছিল হেড লাইব্রেরিয়ান। জেলের বাইরে? ওখানে তার কিছুই নেই—না কাজ, না মাথা গোঁজার ঠাই, না খাবার, না কোথাও যাবার ঠিকানা। তাকে আসলে তার জেলায় ফেরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারপর তার কি হবে তা নিয়ে কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। এই অবস্থায় হক ছ'মাসও বাঁচে কিনা সন্দেহ।

তারপর একদিন ওই কাছাকাছি সময়েই খবর পেলাম, ট্রেনে কাটা পড়েছে সে। সেই থেকে কাঠফাটায় আমরা কজন সুর করে গাইতাম যার কেউ নেই তার ট্রেন আছে। কি নির্মম সত্য, তাই না?

হকের জায়গায় উদ্যম হেড লাইব্রেরিয়ান হলো, ওই পদে তেইশ বছর ছিল সে। তার আমলে পুঁথি, লোকগীতি, কবিতা আর উপন্যাস সংগ্রহ করা হয়েছে লাইব্রেরির জন্যে। আমাদের আমলে বেশ অনেক শিক্ষিত লোকজনকে কয়েদি হিসেবে পেয়েছি আমরা। তাদের বেশিরভাগই রাজনীতিক সঙ্গে জড়িত। এদের জন্যে রিডার ডাইজেস্ট আর ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সংগ্রহ করেছে উদ্যম।

লাইব্রেরিতে বসে ব্যাক সম্পর্কে নিজের বিদ্যা আর জ্ঞান কাজে লাগাতে চেষ্টা করল উদ্যম। ঘন ঘন চিঠি লিখতে লিখতে দেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয় আর

সরকারি-বেসরকারি প্রায় সব বড় ব্যাঙ্কের কাছে পরিচিত একজন মানুষ হয়ে উঠল সে। একটা ট্রাস্ট গঠন করল, যারা জেলে আছে তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া চালানোর জন্যে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ওই ট্রাস্টের মাধ্যমে টাকা ধার দেবে, লেখাপড়া শেষ হবার পর ওই ধারের টাকা অল্প সুদ সহ ফেরত দিতে হবে সহনীয় কিস্তির মাধ্যমে। কাঠফাটায় তার এই স্কিম দারুণ সফল হলো।

সাত.

কাঠফাটায় নতুন যে-সব কয়েদি আসে তারা এক একজন এক এক রকম, কারও সঙ্গে কারও মিল খুঁজতে যাওয়া বৃথা। কেউ হাবাগোবা টাইপের, চড়-থাপড় খেয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, প্রতিবাদ করে না, বাধাও দেয় না। এরাই সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়, সব শ্রেণির কয়েদি থেকে শুরু করে গার্ডরা পর্যন্ত হাতের সুখ মেটাবার এই সুযোগ ছাড়ে না। শেষে দেখা যায় পুরনো কয়েদি আর গার্ডদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে তারা, চুরি থেকে শুরু করে অন্যায় আর নোংরা যত কাজ থাকতে পারে সব করানো হয় তাদেরকে দিয়ে। আবার যৌন টোপ হিসেবেও ব্যবহার করা হয় তাদের। কিছু কয়েদি আছে রাজনীতিকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা থাকায় যাদের গায়ে কেউ হাত দিতে পারে না, তারা গাম্ভীর্য আর ব্যক্তিত্ব ধরে রেখে কাঠফাটায় নিঃসঙ্গ সময় কাটায়, তাদেরকে ফাঁদে ফেলার জন্যে এই হাবাগোবা ক্রীতদাসদের ব্যবহার করা হয়। গার্ডদের সহায়তা নিয়ে এরকম এক নিঃসঙ্গ কয়েদির সেলে থাকার ব্যবস্থা করা হলো এক হাবার, মূল উদ্যোক্তা কজন সখি। দু'চার দিন পর এক রাতে নিঃসঙ্গ কয়েদির পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল ওই হাবা, ঘুমিয়ে পড়ার ভান করে পা তুলে দিল গায়ে, কিংবা হাত রাখল স্পর্শকাতর কোথাও। নিঃসঙ্গ যদি সাড়া দেয়, পরদিনই খবর পৌঁছে যায় জায়গামতো। তারপর আরেক গভীর রাতে নিঃসঙ্গ আর হাবা যখন আপত্তিকর অবস্থায় বিছানায় সময় কাটাচ্ছে, ষড়যন্ত্রের হোতা সখির গার্ডদের নিয়ে ওই সেলের সামনে হাজির হয়, সবার হাতে টর্চ। এই ঘটনার পর থেকে সখিদের জন্যে ওই নিঃসঙ্গ ব্যক্তিকে ধর্ষণ করা পানির মতো সহজ হয়ে যায়, সঙ্গে টাকা-পয়সা থাকলে তাতেও ভাগ বসাতে পারে। তবে মরে গেলেও সখিদের কাছে নতি স্বীকার করবে না, এমন কয়েদিও মাঝেমাঝে দু'একজন আসে কাঠফাটায়। এদের কেউ কেউ শ্রেষ্ঠ মরতে আসে বা বলা উচিত আত্মহত্যা করতে আসে। সখিরা যখন তাকে নিতে বাথরুম এলাকায় বা কোনো

কানাগলিতে ঢুকে পড়ে, সংখ্যায় পাঁচ-সাতজনের কম থাকে না তারা। তখন চিৎকার-টেঁচামেচি করে কোনো লাভ হয় না, কারণ গার্ডরা আসবে না। কেউ কেউ তারপরও ধস্তাধস্তি করে। কিন্তু যতই ধস্তাধস্তি করুক, যেতে তাকে হয়ই-অনেক সময় চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। আবার কেউ কেউ বিনা আপত্তিতে ওদের সঙ্গে যায়, যেন নিজের দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে, বুঝে নিয়েছে আত্মসমর্পণ না করে এখানে বেঁচে থাকা অসম্ভব। তবে কারও আচরণ দেখে আপনি বলতে পারবেন না সে ঠিক কি করতে যাচ্ছে। যদি বলেন, আপনার ভুল হবার সম্ভাবনা প্রচুর। প্রমাণ চান? তাহলে মোস্তাজ মঈনের কথা ধরুন। নতুন কয়েদি হিসেবে কাঠফাটায় সে এলো নিরীহ গোবেচারার হয়ে। এক মন্ত্রীর বডিগার্ড ছিল, ক্ষমতার দাপট দেখানোর জন্যেই কিনা কে জানে, বাড়ির দরজা-জানালা খুলে রেখে বউকে নিয়মিত পেটাত, প্রতিবেশীরা যাতে দেখতে পায়। শালারা তাতে বাধা দেয় এবং এক পর্যায়ে বোনকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদ চাওয়ায় রাগে দিশেহারা হয়ে নিজের হাতে এক শালাকে খুন করে ফেলে সে। ব্যক্তিত্ব আর গাভীর ধরে রেখে কাঠফাটায় নিঃসঙ্গ কারাজীবন শুরু করল মন্ত্রী মহোদয়ের বডিগার্ড। সখিরা যখন তাকে বাথরুম এলাকায় ধরল, একটু টু-শব্দ পর্যন্ত করল না সে, অনুগত চাকরবাকরের মতো রওনা হলো তাদের সঙ্গে। সখিদের কারও ধারণা ছিল না, মোস্তাজ মঈন জানত তাকেও একদিন ধরা হবে, এবং সেদিনের জন্যে যথোপযুক্ত প্রস্তুতিও নেয়া ছিল তার। সে এমন এক প্রস্তুতি, কারও মাথায় কখনও খেলেনি, নিজেকে যারা ভালোবাসে তাদের মাথায় খেলার কথাও নয়। মোস্তাজ কি করল শুনুন। সখিদের সঙ্গে একটা কানাগলিতে গেল ঠিক পোষা ভেড়ার মতো। যখন বলা হলো প্যান্ট হাঁটুর কাছে নামাও, একটু ইতস্তত করার পর নামাল। তার কপালে স্কু-ড্রাইভার ধরা হলো, বলা হলো অসহযোগিতা করলে ওটা তার মগজে ঢুকিয়ে দেয়া হবে। মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল ওদের বক্তব্য সে বুঝেছে। তারপর লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সখিদের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে তার পেছনে দাঁড়াল, প্যান্টের বোতাম খুলল। এরপর এক সখিও পার হয়নি, দেখা গেল মোস্তাজ সখির সঙ্গে সহযোগিতা করেছে, কিন্তু তারপরই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো সখি আত্ননাদ করে উঠল, কানাগলির মতো অনবরত লাফাচ্ছে, দু'হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরেছে উরুসন্ধি, আঙুলের ফাঁক গলে হড়হড় করে বেরিয়ে আসছে টকটকে তাজা লাল রক্ত। জমিনে পড়ে একইভাবে লাফাচ্ছে গোড়া থেকে কাটা সখির নুনু। একের পর এক লাথি মেরে সেই অস্থির নুনুটাকে খেঁতলে দিয়েছে মোস্তাজ। তেমন কিছু না, অস্ত্র হিসেবে মোস্তাজ



একটা ব্লেন্ডের অর্ধেকটা ব্যবহার করেছে। নতুন ব্লেন্ড কিন্তু ভয়ঙ্কর, দু'আঙুলে যদি ভালো করে ধরা যায়, যেকোনো লোকের জান কেড়ে নিতে পারে। মোস্তাজ এখানে কারও জান কেড়ে নেয়নি, কেড়ে নিয়েছে যৌনজীবন, ওই লোকের বেঁচে থাকা পুরোপুরি নরকতুল্য যন্ত্রণা হয়ে দাঁড়াল। স্বভাবতই তৎক্ষণাৎ মোস্তাজের খুন হয়ে যাওয়ার কথা, হলে সেটাই হত স্বাভাবিক। কিন্তু নুনু হারানো সখির আতর্নাদ শুনে চারদিক থেকে গার্ডরা ছুটে চলে আসায় তার সঙ্গীরা সবাই ছুটে পালিয়ে গেল। আহত সখিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো, আর সলিটারিতে পাঠিয়ে বাঁচিয়ে দেয়া হলো মোস্তাজকে। ওই ঘটনার পর কাঠফাটায় মোস্তাজের একঘণ্টাও বাঁচার কথা ছিল না। একুশ দিন সাজা ভোগ করে সলিটারি থেকে বের হলো মোস্তাজ, বেশ বোঝা গেল ওপর মহলের চাপ আছে, তা না হলে বিশ মিনিটের মধ্যে তাকে কাঠফাটা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হতো না। অন্য জেলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো এই কারণে যে তা না হলে সখিরা তাকে খুন করে ফেলবে। কোন জেলখানায় বদলী করা হলো, সেটা পর্যন্ত গোপন রাখা হয়েছে। একমাস পর হাসপাতালে আত্মহত্যা করল ওই সখি, নিজের বুকের ভেতর জু-ড্রাইভার ঢুকিয়ে হৃদপিণ্ডে গর্ত তৈরি করেছিল সে। বিশ্বাস করুন, একবিন্দু বাড়িয়ে বলছি না, আত্মহত্যা করার আগে একটা চিরকুট লিখে রেখে গেছে সে, তাতে লিখেছে: 'আমার যেটা নেই সেটার জন্যেই একজন পুরুষ বাঁচে।' কথা হচ্ছিল কাঠফাটায় নতুন করেদি যারা আসে তাদের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। আমার মেয়াদকালে নতুন করেদিদের নিয়ে বিচিত্র যে-সব ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর মধ্যে আবেদালির কাহিনি একাধারে মজার এবং বিপজ্জনক, আবার বিস্ময়ে স্তম্ভিত না হয়েও পারা যাবে না—এরকম অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা কিভাবে ঘটতে পারল ভেবে। আবেদালির সবচেয়ে দর্শনীয় বৈশিষ্ট্য ছিলো তার চার্লি চ্যাপলিন মার্কী গৌফ জোড়া-হুবহু এক। চার্লির মতোই ছোটখাট সে, ঘন ক্র, আভা আভা চোখ, মাথায় ডেউখেলানো কালো মখমল চুল, গলার স্বর কর্কশ, হাঁটাচলার মধ্যে সামান্য আড়ষ্ট ভাব, যে কারণে তাকে মাঝেমাঝে শারীরিক প্রতিবন্ধী বলে সন্দেহ হতো। আবেদালি রিকশা চালাত, যে গ্যারেজে রাতে রিকশা রাখত নিজেও সেখানে রাত কাটাত, আরও তিন কি-চারজন লোকের সঙ্গে। কি নিয়ে গুপ্তগোল বলা মুশকিল, কারণ বাদী-বিবাদী কোনো পক্ষই তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি, অভিযোগে শুধু বলা হয়েছে আবেদালির সাতশ টাকা চুরি করেছিল নাজমুল নামে আরেক রিকশা চালক, এ নিয়ে বাগড়ার মধ্যে হাতুড়ি দিয়ে নাজমুলের মাথায় জোরে বাড়ি মেরে বসে আবেদালি, ওখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে নাজমুল। আবেদালি কাঠফাটায় এল এক বর্ষমুখর

দুপুরবেলা। আমাদের খাওয়াদাওয়া তখন শেষ হয়ে গেছে, সবাই যে যার সেলের ভেতর। গরাদের ভেতর থেকে তাকে আমরা আসতে দেখলাম, তেমন আগ্রহ বা কৌতূহল নিয়ে নয়, একটু বরং তাক্সিল্য আর বিরক্তির সঙ্গে। রাতে আমি খবর পেলাম ওই কয়েদির নাম আবেদালি, এবং তাকে থাকতে দেয়া হয়েছে উদ্যম হাসানের সেলে। পরপর দুদিন উঠানে উদ্যমকে দেখলাম না আমি, দেখলাম না নতুন কয়েদি আবেদালিকেও। তৃতীয় দিনও উঠানে তারা অনুপস্থিত দেখে কৌতূহল হলো আমার, ভাবলাম ব্যাপারটা কি? হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম উদ্যমের সেলে।

সেল খালি, সেখানে উদ্যম বা আবেদালি নেই। অবাক হয়ে গার্ডদের কাছে গেলাম। তারা আমাকে জানাল, অসুস্থ হয়ে পড়ায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে নতুন কয়েদিকে, আর সেলমেট হিসেবে প্রতিদিন বিকেলে তাকে দেখতে যাচ্ছে উদ্যম। স্বভাবতই আমার কৌতূহল আরও বাড়ল। নতুন কয়েদি কাঠফাটায় এসেই কি এমন রোগ বাধাল যে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে তাকে? আমাকে আরও অবাক করছে লোকটার প্রতি উদ্যমের আকর্ষণ-উঠানের মতো লোভনীয় একটা জানালা ছেড়ে অচেনা এক রোগীকে কি কারণে প্রতিদিন দেখতে যাচ্ছে সে। কাউকে কিছু না বলে আমি গার্ডদের চিফকে ধরে হাসপাতালে যাবার অনুমতি চেয়ে নিলাম, দেখতে যাচ্ছি কি ব্যাপার। কিন্তু হাসপাতালে ঢুকতে পারলেও, আবেদালিকে যে ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে সেখানে ঢুকতে বাধা দেয়া হলো আমাকে, কারণ ওই ওয়ার্ডে শুধু ছোঁয়াচে রোগের রোগীদের রাখা হয়েছে। ওয়ার্ড বয়কে ডেকে জিজ্ঞেস করে জানলাম রিকশা চালক আবেদালির চিকেন পক্স হয়েছে। এবং উপযাচক হয়ে তার দেখাশোনা করছে আমাদের উদ্যম হাসান।

আমার কৌতূহল কিছুটা মিটল, কিছুটা মিটল না। আবেদালির পক্স হয়েছে, ভালো কথা, এখন তার দেখাশোনা করছে হাসপাতালের ডাক্তার আর নার্সেরা, সেখানে উদ্যমের ভূমিকা রাখার বা নাক গলানোর সুযোগ কোথায়? সে কেন আঠার মতো লেগে আছে তার সঙ্গে? একটা রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না?

কাঠফাটায় তখন উদ্যমের সময়, সবেমাত্র কঠিন পাত্রদের গায়ে জয় করেছে, সবাই তাকে হুজুর হুজুর করছে, কাজেই এত সাহস কারও নেই যে প্রসঙ্গটা নিয়ে তাকে প্রশ্ন করবে। আমার অবশ্য সাহসের দরকার নেই, তার সঙ্গে আমার দারুণ ঘনিষ্ঠতা, ইতস্তত না করে যেকোনো প্রশ্ন করতে পারি আমি তাকে। কিন্তু পারি বলেই পারাটা সহজ নয়, ভাবতে হয় আমাকে দেয়া অধিকার অপব্যবহার করে ফেলছি কিনা।

এক সপ্তাহ পর তার সঙ্গে আমার দেখা হলো বিকেলের উঠানে। প্রথম দশ মিনিট উঠানে তার দীর্ঘ কয়েক দিনের অনুপস্থিতি বা নতুন কয়েদি আবেদালি সম্পর্কে একটা কথাও বলল না সে। সিদ্ধান্ত নিলাম আরও দশ মিনিট দেখব।

পরের দশ মিনিটও নিষ্ফলা কাটল। অগত্যা আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘উঠানে তোমাকে আমি তিনদিন পর দেখছি কেন? কিছু হয়েছে নাকি?’

‘হয়নি মানে! হতে কিছু আর বাকি আছে নাকি!’

‘তাই নাকি? কি রকম?’

আমার প্রশ্ন শুনে অপ্রস্তুত হয়ে গেল উদ্যম। ‘না, মানে,’ খানিক পর আমতা আমতা করে বলল, ‘সে-সব এখন থাক, আলোচনা না করাই ভালো। সময় হোক, তোমাকে আমি সব খুলে বলব একদিন।’

‘কি খুলে বলবে? কি ঘটনা?’ ধৈর্য হারানোর সুরে বললাম তাকে। ‘আমাকে একটু আভাস অন্তত দাও।’

প্রবল বেগে মাথা নাড়ল উদ্যম, এত জোরে নাড়ার প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও। ‘না, না। ব্যাপারটা বেশ জটিল। ভয়ানক বিপজ্জনকও। একটু ভুল হয়ে গেলে মানুষ মারা যাবে। এ প্রসঙ্গে তুমি আর কিছু বলো না, কিছু জানতেও চেয়ো না।’

এ-কথার পর আর কিছু বলা চলে না। প্রসঙ্গ পাণ্টে জানতে চাইলাম, একটু হয়তো আকস্মিক হয়ে গেল: ‘আবেদালি আসলে কে? তাকে কি তুমি আগে থেকে চেনো?’

অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল উদ্যম, তার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল, স্থির হয়ে গেল শরীরও, তারপর ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল আমার দিকে। ‘তোমাকে না বললাম এ প্রসঙ্গে আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করো না!’

‘কিন্তু সেটা যে আবেদালি প্রসঙ্গ তা তো তুমি আমাকে জানাওনি! আমি বুঝব কিভাবে?’

‘দুঃখিত, আমারই ভুল হয়েছে। আমি তোমাকে আবেদালি প্রসঙ্গেই কিছু জিজ্ঞেস করতে নিষেধ করছি।’

‘ও, আচ্ছা, ঠিক আছে,’ বললাম আমি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটলাম আমরা। তারপর না চাইতেই দৃষ্টির মতো উদ্যম বলল, ‘হ্যাঁ, আবেদালিকে আমি অনেক আগে থেকে চিনি। সে আমাদের গ্রামের ছেলে। তবে অনেক বছর দেখা-টেখা হয়নি, তাই আমাকে প্রথমে চিনতে পারেনি সে। আমার কিন্তু ভুল হয়নি, দেখামাত্র চিনে ফেলেছি।’

আমি কিছু বললাম না। এরপর উদ্যমও মুখে কুলুপ আঁটল।

পরের দু'সপ্তাহ মাত্র একদিন উঠানে এল সে। আগের মতোই চুপচাপ, তবে এবার তাকে বেশ চিন্তিত বা উদ্ভিগ্ন বলে মনে হলো। মানা করেছে, কাজেই আমি কিছু জানতে চাইলাম না।

তারপর একদিন আবেদালিকে নিয়ে উঠানে হাজির হলো উদ্যম। একা শুধু আমি না, বাকি সব কয়েদি আর গার্ডরাও দেখল, আবেদালিকে পাশে নিয়ে গোটা উঠানে হাঁটাহাঁটি করছে উদ্যম, নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে তারা, ভুলেও আর কারও সঙ্গে কথা বলছে না সে, এমনকি চোখাচোখি হবার ভয়ে কারও দিকে একবার তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। একবার আমার মুখোমুখি পড়ে গেল, কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে আমাকে সে চিনতে পেরেছে বলে মনে হলো না। দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

পরের দিনও ওই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটল। আবেদালিকে মুহূর্তের জন্যেও নিজের কাছছাড়া করছে না উদ্যম। সেদিনও কারও দিকে তাকায়নি, আমাকে দেখেও চিনতে না পারার ভান করেছে।

তারপর আবার পরপর তিনদিন দেখা নেই উদ্যমের। ভাবলাম পরদিন আসবে, কিন্তু এল না। আবার আমাকে তার খোঁজ নিতে যেতে হলো। গিয়ে দেখি সেল খালি। গার্ডদের জিজ্ঞেস করতে তারা বলল, এবার উদ্যমের পক্ষ হয়েছে, এবং তার সেবা করার জন্যে রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা হাসপাতালেই থাকছে আবেদালি। বুঝলাম ওদের দুই দেশির মধ্যে পারস্পরিক সেবাদান বেশ জমে উঠেছে।

অনেক চেষ্টা করেও ওই ওয়ার্ডে আমি ঢুকতে পারলাম না, সেদিন নয়, পরবর্তী দু'সপ্তাহও নয়। যত দূর মনে করতে পারি, টানা একুশ দিন উঠানে অনুপস্থিত থাকার পর আবার একদিন আমরা উদ্যমের দেখা পেলাম। বলাই বাহুল্য যে পক্ষ সেরে গেছে তার, গোসল করার পর তার দ্বারা আর সংক্রমিত হবার ভয় নেই কারও। এও সম্ভবত বলা বাহুল্য যে উঠানে একা নয়, সঙ্গে করে আবেদালিকে নিয়ে এসেছে সে।

তবে এবার উদ্যমের আচরণ সম্পূর্ণ অন্য রকম। আমাকে একবার পাশ কাটাল তারা, তারপর একা উদ্যম ফিরে এল আমার কাছে ফিসফিস করে বলল, 'আজ আমি শুধু তোমার জন্যে আবেদালিকে উঠানে নিয়ে এসেছি। ওকে দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে সেটা খানিক পর তোমার কাছে আমি জানতে চাইব।'

'খানিক পর কেন, সেটা আমি তোমাকে এখনই বলতে পারি,' বললাম তাকে। 'আমি কি বলব না বলব তার আর কি গুরুত্ব, বলো। সখিরা বলাবলি

করছে তুমি নাকি ওদের দলে নাম লিখিয়েছ, তবে তোমার শিকার করার পদ্ধতি ওদের চেয়ে আলাদা, আর তোমার প্রথম শিকার হলো ওই রিকশাঅলা-আবেদালি।’

যতই অস্থির আর উদ্ভিগ্ন দেখাক উদ্যমকে, হেসে ফেলল সে, বলল, ‘ভুল, একদম ভুল।’ বলে ওখান থেকে সরে গেল। এর পাঁচ কি সাত মিনিট পর উঠান থেকে গায়েব হয়ে গেল তারা দুজন। কেন গেল, কোথায় গেল, কেউ জানে না।

আধঘণ্টা পর একা ফিরে এল উদ্যম, সম্পূর্ণ নতুন একজন মানুষ হয়ে। লোকজনের দিকে তাকাচ্ছে, চোখ-মুখ থেকে উথলে উঠছে হাসি। শরীর শিথিল, যেন পরম স্বস্তি বোধ করছে।

সরাসরি আমার দিকে হেঁটে আসতে দেখলাম তাকে। ডান হাতটা কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে বাড়িয়ে দিল আমাকে লক্ষ্য করে, একদম সাহেবি স্টাইল, বাধ্য হয়ে সেটাকে আমার ধরে বার দুয়েক ঝাঁকাতে হলো। হ্যান্ডশেক সেরে আমাকে জিজ্ঞেস করল উদ্যম, ‘এবার বলো, কেমন দেখলে আবেদালিকে।’

‘কেমন দেখলাম মানে? আচ্ছা, তুমি এত রহস্য করছ কেন?’ পাল্টা প্রশ্ন আমার।

‘হুঁ-হুঁ, রহস্য সাধে করিনি, হে, সাধে করিনি! ধৈর্য ধরো, সব বলছি তোমাকে। কিন্তু তার আগে বলো আবেদালিকে তুমি কেমন দেখলে?’

‘ঘোড়ার ডিম দেখলাম!’ এবার আমি রেগে গেলাম। ‘একজন রিকশাঅলার মধ্যে দেখার কি আছে, হ্যাঁ? আমি তার দিকে ভালো করে তাকাইনি পর্যন্ত। কেন, ব্যাপারটা কি? তুমিই বরং বলো দেখবার মতো কি আছে তার মধ্যে।’

‘আছে না। বলো ছিল।’

‘মানে?’

‘আবেদালিকে আমরা আর দেখতে পাব না, তাকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দেয়া হয়েছে।’

‘মানে? কেন?’

‘শোনো, একজন মানুষ রিকশা চালায় বলে তাকে তোমার তাকানো করতে হবে, এটা একদম ঠিক নয়। তাকে তোমার ভালো করে দেখা উচিত ছিল।’

‘একই কথা বারবার বলছ। কেন, দেখার মতো কি ছিল ওই ব্যাটার মধ্যে?’

‘দেখার মতো কি ছিল? দেখার মতো ছিল এই যে ওই ব্যাটা ব্যাটা নয়, বেটি।’

দুজন পাশাপাশি হাঁটছিলাম, উদ্যমের কথা শুনে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। ‘হোয়াট?’

পিছিয়ে আমার পাশে চলে এলো উদ্যম। ‘ইয়েস, মাই ফ্রেন্ড, হি ওয়াজ আ শি, নট হি। সে আমার গাঁয়ের ছেলে, দেখামাত্র চিনে ফেলেছি। যাবজ্জীবন সাজা কেন তাকে দেয়া হয়েছে জানো? নাজমুল নামে আরেক রিকশাওয়ালাকে খুন করেছে বলে। তবে অভিযোগে যেটা বলা হয়েছে সেটা ঠিক নয়। সাতশ টাকা চুরি হয়েছে বলে নাজমুলকে সে খুন করেনি, তার আইডেনটিটি ফাঁস হয়ে যাচ্ছিল দেখে নাজমুলকে খুন মেরে ফেলতে বাধ্য হয় সে। সে মেয়ে, এটা ফাঁস হয়ে গেলে শহরে আর রিকশা চালাতে পারবে না, এই ভয়ে। তার বাবা নেই, মা স্ট্রোকের রোগী, নড়াচড়া করতে পারে না, ছোট ছোট তিন ভাইবোনেরও খাওয়া-পরার ব্যবস্থা তাকেই করতে হয়, তাই রিকশা চালানো শিখতে হয়েছে তাকে। সেটা যদি চালাতে না পারে, সবাই তারা না খেয়ে মারা যাবে।’

‘কিন্তু এটা কেমন বিচার ব্যবস্থা হলো যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জানবেন না তাঁরা যার বিচার করছেন সে পুরুষ না নারী!’

‘এটাকেই তো বিরাট বড় রসিকতা বলছি! তুমি প্রহসন বললেও আমি আপত্তি করব না।’

‘না, ঠাট্টা নয়, কেন কেউ জানল না যে ওই লোক একটা মেয়ে? বিচার চলার সময় তার উকিল, তার স্বজনরা...’

‘আবেদা টাকা পাবে কোথায় যে উকিল রাখবে, উকিলের ব্যবস্থা করেছিল সরকার-বোকা যাচ্ছে বাকি সবার মতো তাকেও সে বোকা বানিয়েছে। আর স্বজন বলতে আদালতে আসার মতো কেউ তার নেই, কাজেই আদালত সেরকম কাউকে পাননি।’

‘কিন্তু তারপরও আসামীদের সঙ্গে হাজতে রাখা হয়েছে তাকে, কারও চোখে ব্যাপারটা ধরা পড়ল না? তাকে কখনো শাট আর গেঞ্জি খুলতে হয়নি? গোসল করার সময় কেউ তাকে দেখেনি?’

‘হয়তো সযত্নে এড়িয়ে গেছে, কারও সামনে কাপড়চোপড় খোলেনি। গোসল? হয়তো করেনি।’

‘একটা মেয়ে কয়েদি একদল পুরুষ কয়েদির মাঝখানে ঢুক পড়ল, বাকিটুকু কল্পনা করতে যেকোনো পাষাণেরও বুক কাঁপবে। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে কি ঘটত, ভাবতে পারো?’

‘এক রাতেই মেয়েটাকে ওরা মাংসের কিমা বানিয়ে ফেলত। সেজন্যেই তো ওকে দেখার পর থেকে এক সেকেন্ডের জন্যেও নিজের কাছছাড়া করেনি।’

‘এই উৎকট সমস্যার তুমি সমাধান করলে কিভাবে?’

‘কারা অধিদপ্তরে চিঠি লিখে। ওদেরকে বিশ্বাস করানোটাই কঠিন

ছিল। তারপর যখন বিশ্বাস করল, দ্রুতই সমাধান হয়ে গেল সব। আমার উপস্থিতিতে আবেদাকে কাঠফাটার মহিলা অংশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর শুরু হবে তদন্ত এবং সংশোধনের পালা, আবেদালিকে করা হবে আবেদা। যাদের গাফলতিতে এই কাণ্ড ঘটেছে তাদেরকে চিহ্নিত করা হবে, দায়ের করা হবে মামলা, কিংবা দায়ী ব্যক্তিদের চাকরিচ্যুত করা হবে।’

‘আর আবেদার? তার কোনো শাস্তি হবে না? সে যে সবাইকে বোকা বানাল, তার কি?’

‘আমার সন্দেহ তাকে সলিটারিতে পাঠানো হয়েছে, আদৌ যদি মেয়েদের জন্যেও সে ব্যবস্থা থেকে থাকে। তবে আমি হলে এই ব্যাপারটাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতাম। আর সবাই যাই ভাবুক, আমি তার প্রতি সহানুভূতিশীল।’

‘সেটা বেশ গভীর বলেই মনে হচ্ছে। কিছু যদি মনে না করো, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে তাকে বিপদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে এই যে এত কিছু তুমি করলে, তার পেছনে তোমার কোনো স্বার্থ ছিল না?’

‘ছিল তো,’ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল উদ্যম। ‘মেয়েটিকে যারা ঠুকরে ঠুকরে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে তাদের হাত থেকে ওকে বাঁচানোই ছিল আমার স্বার্থ।’

‘না, আমি তোমার ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা বলছি।’

‘ব্যক্তিগত স্বার্থও ছিল।’

‘কি সেটা?’

‘সবাই ধরে নেবে মেয়েটিকে একা পেয়ে চুটিয়ে উপভোগ করেছে আমি, কাউকে ভাগ দিইনি, এমনকি আমার একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু তোমাকেও না।’

‘যারা এরকম ধরে নেবে তাদেরকে তুমি দোষ দিতে পারো না।’

‘জানি। দোষ আমি দিচ্ছিও না। কিন্তু গার্ডরা সাক্ষ্য দেবে যারা এরকম ধরে নেবে তারা ভুল করেছে, আমি মেয়েটিকে ভোগ করা তো দূরের কথা, ওকে একবার স্পর্শ পর্যন্ত করিনি। এটা এক সময় কাঠফাটার সবাই জানবে। আর এটাই আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ।’

আট.

জেলখানার সময় খুব ধীরে বয়। মাঝে মধ্যে আপনাকে কিসম খেয়ে বলবেন ওটা খেমে গেছে, যদিও আসলে খামে না। চলতে থাকে। গাড়ি মেরামত থেকে পাওয়া টাকা ছয়-নয় করার অপবাদ নিয়ে ওয়ার্ডেনের অফিস ত্যাগ করতে হলো

মুক্তার আলিকে। তার জায়গায় এল ধীমান চট্টো। পরবর্তী ছ'মাস কাঠফাটা হয়ে উঠল জ্যাস্ত নরক। দেখা গেল হাসপাতালের প্রতিটি বেড আর সলিটারি শাখার প্রতিটি সেল সব সময় ভর্তি হয়ে আছে।

একদিন দাড়ি কামানোর ছোট্ট আয়নায় নিজেকে দেখছি—চল্লিশ বছরের এক লোক আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এসেছিল এক ছেলে, মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল, অনুশোচনায় দক্ষ এবং আধপাগল, আত্মহত্যার কথা চিন্তা করছে। সেই ছেলেটা চলে গেছে। চুলও প্রায় নেই। চোখের চারদিকে এখন প্রচুর কাকের ঠ্যাং। সেদিন নিজেকে আমার একটা বুড়ো মনে হলো, নিজের বেরোনোর সময় হবার অপেক্ষায় রয়েছে। ব্যাপারটা আমাকে ভয় পাইয়ে দিল। জেলখানায় কেউ বুড়ো হতে চায় না।

কয়েক বছর পর তহবিল তছরূপের অপরাধে ধীমানের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হলো। তারপর দেখা গেল তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পালিয়ে গিয়ে নিজের মস্ত উপকার করেছে ধীমান চট্টো, কারণ দোষী সাব্যস্ত হলে এখানেই ওই দণ্ড ভোগ করতে হতো তাকে, কিন্তু এখানে সে পাঁচ ঘণ্টা আয়ুও পেত কিনা সন্দেহ আছে, মানুষের ওপর এত অত্যাচার করেছে সে। দবির খান গেছে দু'বছর আগে। তার হার্ট অ্যাটাক করেছিল।

নতুন ওয়ার্ডেন নিয়োগ দেয়া হলো। পাওয়া গেল তার অ্যাসিস্ট্যান্টও। নির্বাচিত করা হলো গার্ডদের নতুন চিফ। উদ্যমকে আবার আগের দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে—একজন খুনি, এবং শ্রেফ একজন কয়েদি। ওই সময় উদ্যমের সঙ্গে সেলটা শেয়ার করছিল একজন আদিবাসী, সুবাস চাকমা। কি কারণে বলা মুশকিল, দুজনের মধ্যে বনিবনা হয়নি—সুবাস ওই সেল ছেড়ে চলে গেল, আর উদ্যমকে পাঠানো হলো সলিটারিতে। ওপরমহল বা কর্তৃপক্ষের নাম বদলে হলে কি হবে, অন্যায় অবিচার আসলে চলতেই থাকে।

উদ্যমকে নিয়ে আমি একবার সুভাষের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। জন্মগত একটা ত্রুটির কারণে তার কথা জড়িয়ে যায়, শ্রোতার বুঝতে অসুবিধে হয় ঠিক কি বলতে চাইছে সে। 'খুব ভালো লোক সে। তার সঙ্গে ওই সেল আমার ভালোই লেগেছে। সে হাসি-ঠাট্টা কাকে বলে জানে না। আমি তাকে কখনও মজা করতে দেখিনি। তবে আমাকে ওখানে চায়নি সে। আমি বুঝতে পারতাম।' বিদেশিদের মতো কাঁধ ঝাঁকাল, সম্ভবত চার্চে যে-সব শিক্ষান আসা-যাওয়া করে তাদের দেখে শিখেছে। 'ওখান থেকে সরে আসতে নিজের ওপর আমি খুশি। ওই সেলে খারাপ ধরনের খরা আছে। সারাক্ষণ ঠাণ্ডা। সে কাউকে নিজের



জিনিস ছুঁতে দিত না। সেটা ঠিক আছে। চমৎকার মানুষ, কক্ষনো মজা করতে দেখিনি। তবে খুব বড় খরা।’

ওই সেল থেকে মধুবালা কবে গায়েব হয়ে গিয়েছিলেন বলতে পারব না, তবে মনে আছে একসময় উদ্যমকে আমি একটা মেরিলিন মনরোর পোস্টার আনিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর একে একে শামিম আরা আর জেবা, এবং কবরী।

আমি একবার তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, ‘এই পোস্টারগুলো তোমার কাছে কি অর্থ বহন করে?’

আমার দিকে কিছুক্ষণ অবাক তাকিয়ে থাকল, তারপর বলল, ‘স্বাধীনতা, মুক্তি। সুন্দর ওই নারীদের দিকে একটু সময় তাকিয়ে থাকো, একসময় বুঝতে পারবে তুমি ওদের পাশে দাঁড়িয়ে আছ।’

তারপর আবার আমরা নতুন একজন জেলার বা ওয়ার্ডেন পেলাম, নাম মৌলানা আলফাজুর রহমান। একটা মসজিদের ইমাম ছিলেন, সেখান থেকে পাঠানো হয়েছে। এসেই ধর্ম প্রচারে লেগে গেলেন ভদ্রলোক। কয়েদিরা তাঁকে দেখলে পালাতে দিশে পায় না, এখনই মসজিদে ধরে নিয়ে যাবে এই ভয়ে। তবে এটা মানতে হবে যে মৌলানা সাহেব অনেক ভালো ভালো কাজে হাত দিলেন। প্রথমেই একটা ফান্ড তৈরি করা হলো, কয়েদিরা যা রোজগার করবে তার শতকরা দশ ভাগ ওই ফান্ডে জমা দেয়া বাধ্যতামূলক করা হলো। মেয়াদ শেষে কয়েদিরা যখন চলে যাবে, এই ফান্ড থেকে নগদ সাহায্য করা হবে তাদেরকে, হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে সে যাতে বিপদে পড়ে না যায়। বলা হলো ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবসা করার জন্যে তাকে কিছু পুঁজিও দেয়া যেতে পারে। এরকম আরও অনেক নতুন প্রোগ্রামে হাত দিলেন তিনি, এবং দেখা গেল পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সাহায্য করছে উদ্যম। ডান হাত হিসেবে, নীরব থাকার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে। জেলখানার লাইব্রেরি ছিল উদ্যমের নিয়তির মতো, মৌলানা রহমান সেটা জানতেন, এবং সেটাকে তিনি নিজের কাজে ব্যবহার করতে লাগলেন।

উদ্যম আমাকে একদিন বলেছে, ‘রহমান সাহেবের প্রিয় একটা ফ্রেইজ কি জানো? এক হাত আরেক হাতকে ধোয়।’ কাজেই উদ্যম তাঁকে ভালো ভালো উপদেশ আর পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে।

তারপর কিছু একটা ঘটল। কি ঘটল এক কথাই বলা সম্ভব নয়। ব্যাপারটা ঘটেছে একদিনে নয়, সাত বছর সময়-সীমা ভেতর। ঘটনাটা ঘটেছিল মৌলানা সাহেব তাঁর ডান হাতকে হাতছাড়া করতে চাননি বলে। আমি আরও একটু বলি:

ব্যাপারটা ঘটেছিল, কারণ তিনি ভয় পাচ্ছিলেন উদ্যম তাঁর বিরুদ্ধে কতটুকু কি বলবে ভেবে-উদ্যম যখন বা যদি কাঠফাটা ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

গল্পটা আমি শুনেছি এর মুখে একটু ওর মুখে একটু, এভাবে। উদ্যমের কাছ থেকেও শুনেছি, তবে সবটুকু নয়। তার জীবনের ওই অংশটা নিয়ে সে কখনো কথা বলতে রাজি হয়নি, এবং সেজন্যে আমি তাকে দোষও দিতে পারি না। গল্পটা আমি পাঁচ কি সাতজন লোকের কাছ থেকে যতটা সম্ভব যোগাড় করেছি।

এই লেখার কোথাও বোধহয় আমি বলেছি যে কয়েদিরা আসলে ক্রীতদাস ছাড়া কিছু নয়, তবে তাদের আছে হাবাগোবা সেজে থাকার আর কান খোলা রাখার ক্রীতদাসসুলভ অভ্যাস। আমি মাঝখানের গল্প পেয়েছি, পেছন দিক পেয়েছি, সামনের দিক পেয়েছি-তবে আপনাকে জানাচ্ছি পয়েন্ট A থেকে পয়েন্ট Z পর্যন্ত। কাহিনিটা জানলে আপনি হয়তো বুঝতে পারবেন কি কারণে লোকটা প্রায় দশ মাস ওরকম আচ্ছন্ন এবং অবদমিত অবস্থায় কাটিয়েছে। আমার মনে হয় না একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সত্যটা কি জানত সে, এই নরকতুল্য জেলখানায় আসার পর পনেরো বছর কাটিয়ে ফেলার পরও। যতদিন না তার সঙ্গে মাখনা নেহালের দেখা হলো। খারাপ কতটা খারাপ হতে পারে তা সে জানত বলে মনে হয় না আমার।

দেশে তখনও স্বাধীনতার জন্যে সম্মুখযুদ্ধ শুরু হয়নি, মাখনা নেহাল আমাদের ছোট্ট মিষ্টি পরিবারে যোগ দিতে এল। তখন তার মাত্র সাতাশ বছর বয়স, অথচ এর মধ্যেই দেশের প্রায় সব জেলখানা থেকে এক-আধবার করে ঘুরে আসা হয়ে গেছে তার। সে একজন পেশাদার চোর, এবং আপনি সম্ভবত আন্দাজ করে নিয়েছেন, আমার নিজের অনুভূতিও তাই আর কি, চুরি করতে করতে আরেকটা পেশায় জড়িয়ে পড়েছিল নেহাল।

সে বিবাহিত, এবং তার স্ত্রী প্রতি সপ্তায় দেখা করতে আসত। এই সময়ের মনে কোথাও একটা আশা জেগে ছিল যে তার স্বামী নিজেকে কোলো এক সময় শুধরে নেবে, আর পরিণতিতে তার এবং তাদের তিন বছর বয়সী ছেলের ভাগ্য ফিরবে-নেহাল যদি হাইস্কুলের বাকি লেখাপড়া শেষ করতে পারে। বউয়ের ধারণা, এসএসসি পাস করাতে পারলে ভালো-মন্দ যা হোক তবু একটা চাকরি যোগাড় হতে পারে। স্বামীকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে রাজি করল সে, নেহাল জেলখানার লাইব্রেরিতে প্রায় নিয়মিত আসা-যাওয়া শুরু করল।

উদ্যমের জন্যে ততদিনে এই ব্যাপারটা রুটিনে দাঁড়িয়ে গেছে। ছাত্র হিসেবে নেহাল মোটেও ভালো নয়, দু'একবছর কঠোর পরিশ্রম করলে এসএসসি পরীক্ষায় বসার যোগ্যতা অর্জন করবে, ব্যাপারটা সেরকম নয়। উদ্যমের ধারণা হলো, অন্তত চার বছর খাটতে হবে তাকে। তবে এটা আমার গল্পের অংশ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো কিছুদিনের মধ্যেই আর সব মানুষের মতো নেহালও উদ্যম হাসানের ভারি ভক্ত হয়ে উঠল।

দুই কি তিনবার কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে উদ্যমকে জিজ্ঞেস করেছে নেহাল, 'আপনের মতো ইস্মার্ট একজন মানুষ এখানে কি করতাকে কন দেহি!'

উদ্যম ওই টাইপের মানুষ নয় যে তাকে বলবে। উত্তরে একটু শুধু হেসেছে, তারপর প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে অন্যদিকে সরে গেছে। নেহালের জন্যেও এটা খুব স্বাভাবিক যে প্রশ্নটা সে অন্য কাউকে করেছে। অবশেষে উত্তরটা যখন পেয়েছে, আমার ধারণা তখন তাকে তার তরুণ জীবনের সবচেয়ে বড় ধাক্কাটাও খেতে হয়েছে।

নেহাল যাকে প্রশ্ন করেছিল আমাদের লন্ড্রিতে কাপড় ইস্ত্রি আর ভাঁজ করে যে লোক, সেই হিরু শেখকে। খুন করার অভিযোগে তাকে এখানে প্রায় বারো বছর সাজা ভোগ করতে হচ্ছে। উদ্যমের মার্ডার কেসের বিশদ বর্ণনা মাখনা নেহালকে নতুন করে শোনাতে ভালোই লাগছিল তার। বিচারে কি রায় হলো বলতে যাবে হিরু শেখ, এই সময় ব্যাপারটা ঘটতে শুরু করল। দশটা ইস্ত্রি নিয়ে দশজন লোক কাজ করছিল ওখানে, তারা শুধু ইস্ত্রি করছিল না, কাপড় ভাঁজও করছিল। ভাঁজ করা কাপড় প্যাকেটে ভরে বাস্ত্রে তুলছিল দুজন লোক, তার মধ্যে একজন মাখনা নেহাল। কিন্তু হঠাৎ কখন কে জানে স্থির হয়ে গেছে সে, তার মুখ এত বড় একটা হাঁ তৈরি করেছে, উঁকি দিলে বোধহয় বুকের ভেতর পর্যন্ত দেখা যাবে। যন্ত্রের মাধ্যমে তার দিকে এগিয়ে আসছে ভাঁজ করা কাপড়ের স্তূপ, কিন্তু সেগুলো কেউ না ধরায়, সচল টেবিল থেকে তুলে না নেয়ায় নীচের কাদাপানিতে পড়ে যাচ্ছে।

সেদিন ওদের ওস্তাদ ছিল যিশু মিয়া, দৃশ্যটা দেখতে পেয়ে চোঁচাতে চোঁচাতে ছুটে এল সে। তার দিকে কোনো খেয়ালই নেই নেহালের। সে হিরুকে জিজ্ঞেস করল, ওখানে যেন যিশু মিয়া বলে কেউ নেই, যে যিশু মিয়া একদা বেশি লোকের মাথা ফাটিয়েছে যে জিজ্ঞেস করলে সংখ্যাটা বলতে পারবে না, 'গলফ শেকাইতো যে ব্যাডা, কি জানি নাম কইলা তার?'

'উত্তম,' উত্তর দিল হিরু শেখ, ইতিমধ্যে পুরোপুরি হতবিস্তার আর বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। পরে সে বলেছে, ছোকরাকে সাদা পতাকার মতো দেখাচ্ছিল। 'উত্তম সিংরাজ বা এরহম কিছু একডা হইবে।'

‘এদিকে তাকা, এদিকে তাকা, হালার পুত...’ তখনও গর্জন করছে যিশু মিয়া। ‘অহনও খাড়ায়া আছস! শিটগুলা লয়া ঠাণ্ডা পানিতে চুবা...’

‘উত্তর সিংরাজ...উ আমার খুদা, উ আমার পরম খুদা,’ নেহাল বলল, এবং এর বেশি কিছু বলতে পারল না সে, কারণ যিশু মিয়া তার কানের পেছনে বেমক্কা একটা ঘুসি মেরে বসেছে।

ঘুসি খেয়ে শক্ত মেঝের ওপর মুখ দিয়ে এত জোরে ছিটকে পড়ল নেহাল, সামনের তিনটে দাঁত ভেঙে গেল। তার যখন জ্ঞান ফিরল, দেখল সলিটারিতে রয়েছে। ওখানে এক সপ্তা আটক থাকতে হলো তাকে, রেকর্ড বুকে কালো দাগ তো পড়লই।

সেটা ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিক ছিল। সলিটারি কনফাইনমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসার পর আরও ছয় কি সাতজন দীর্ঘ মেয়াদে থাকা কয়েদিকে ওই একই প্রশ্ন করেছে মাখনা নেহাল, সবাই তাকে ওই একই গল্প শুনিয়েছে। আমি জানি, কারণ আমিও তাদের মধ্যে একজন। কিন্তু আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম কেন সে জানতে চাইছে, অমনি মুখে তালা মেরে দিল।

তারপর একদিন লাইব্রেরিতে গেল সে, এবং উদ্যম হাসানের সামনে বসে হড়হড় করে একগাদা তথ্য উগরে দিল। তার কথা শুনে জীবনে এই প্রথমবার এবং সম্ভবত শেষবারও নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাল উদ্যম।

সেদিন আরও পরে তাকে আমি দেখলাম, দেখে মনে হলো লোহার হুক দিয়ে কেউ যেন তার মুখটাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। তার হাত দুটো কাঁপছিল। আমার কথার কোনো জবাবই দিল না সে। আরও খানিক পর গার্ডদের প্রধান লতিফ জোয়ারদারকে ধরে ওয়ার্ডেন মৌলানা রহমানের সঙ্গে পরদিনের একটা অ্যাপেয়েন্টমেন্ট পাকা করল।

পরে আমাকে উদ্যম বলেছে, সেদিন সারারাত এক মিনিটও ঘুমাতে পারেনি সে, ঠাণ্ডা রাতে সারাক্ষণ বাতাসের হাহাকার শুনেছে, সার্চলাইটের আলোটাকে বারবার চক্কর দিয়ে ঘুরতে দেখেছে, আর পুরো ব্যাপারটার চিন্তা করে দেখার চেষ্টা করেছে। সে বলল, নেহাল যেন একটা চাবি হাজির করেছে তার সামনে, যেটা দিয়ে তার মগজের পেছন দিকের একটা খাঁচা খোলা যায়, যে খাঁচাটা তার সেলের মতো, যে খাঁচায় বন্দি করে রাখা হয়েছে একটা বসকে, আর সেই রয়াল বেঙ্গল টাইগারের নাম হলো আশা। নেহাল যে চাবি হাজির করেছে সেটা দিয়ে ওই খাঁচা খোলা যায়, ফলে বাঘটা এখন বেরিয়ে পড়েছে, এবং সে চাক বা না চাক, তার মগজে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

চার বছর আগে খুলনায় অ্যারেস্ট হয়েছিল নেহাল। একটা চোরাই গাড়ি চালাচ্ছিল সে, চুরি করা অনেক জিনিসে ঠাসা ছিল গাড়িটা। পুলিশের সঙ্গে একটা সমঝোতায় এসে নেহাল তার সহকারীকে ধরিয়ে দেয়, বিনিময়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হালকা করে লেখা হয়, ফলে খুব অল্প মেয়াদের জেল হয় তার। সাজা শুরু হবার এগারো মাস পর তার সেলের পুরনো বাসিন্দা ছাড়া পেয়ে জেলখানা থেকে বেরিয়ে যায়, তার জায়গায় আসে মীর শাফকাত নামে নতুন একজন। শাফকাতের সাজা হয়েছে সশস্ত্র অবস্থায় সিঁধ কাটতে গিয়ে।

‘এমুন অস্ত্রির টাইপের মানুষ জীবনে আমি দেহি নাই,’ বলল নেহাল। ‘যার বুক খালি তড়পায় হের সিদেল চুর হওয়ন উচিত না, আরও উচিত না হাতে যদি পিস্তল থাকে। খুট কইরা একটু আওয়াজ অইতে যা দেরি, হালার পুত লাফ দা তিন ফুট উপরে উইডা যাইব,,, ...তারপর নাইমা আইব গুলি করতে করতে। এক রাইতে আমার গলা এত জোরে টিইপা ধরছিল, আমি মারা যাইতে লইছিলাম, কারণ হলের ওই দিক দিয়া এক হালার পুত তার সেলের রডে টিনের কাপ ঠুকতে আছিল।

‘ওই সেলে আমি তার লগে সাতমাস আছিলাম, তারপর সাজা কমায়া আমারে ছাইড়া দিল। এই সাত মাস বহুত গল্প হইছে তার লগে আমার। সবই তার গল্প, কারণ শাফকাতের স্বভাব আছিল একা কথা কইবে, তুমারে কিছু কইতে দিবে না, কইতে গেলে চোক গরম করবে। বিষম মোটা ওই ব্যাড়া, মাথায় টাক...দেখলে ডরই লাগে। আল্লারে কই, হের লগে আমার জানি আর দেখা ন অয়।

‘পেরতেক রাইতে তার বকবকানি শুনতে হইছে আমারে। তার বড় হওয়ন, এতিমখানাখে ভাগন, কি কি কাজে আছিল, কি ধরনের মাইয়াদের লগে হইছে, জুয়া খেলায় তার কপাল ফাটছে। বাধ্য হয়ে তার বেবাক কতা হুনতে হইছে আমারে। নিজের মুখডা আমার আহামরি কিছু না, কিন্তু তাই বইলা আমি চাইও না যে কেউ এইডারে বদলায়া দিক।

‘তার কথা যদি হাচা অয়, দুইশত বাড়ির সিঁদ কাটছে হালার পুত। এইডা আমি বিশ্বাস করি নাই। তবে যে গল্পটা কমু, সদয় বাই, হেইউ একশ ভাগই হাচা বইলা কসম খাইছে। তার আগে আমারে কইল সে মশিও মারছে। হে ওইসব মানুষেরে মারছে যারা তারে ঠকাইছে, তার লগে অন্যা করছে। সত্য-মিথ্যা আল্লা মালুম, তবে হের কতা অবিশ্বাস করি না।

‘তো এক রাইতে, কিছু কইতে লাগে তাই কওয়া, তারে জিগাইলাম, কারে আপনে খুন করছেন?’ মস্করা করলাম, বুঝলেন না। হি হি কইরা হাসল দৈত্য,

তারপর কইল, ‘খুঁজ লয়া দেখো গা, চট্টগ্রামের কাঠফাটায় এক ব্যাডায় জেল খাটতাছে আমি ওই দুইডারে খুন করায়। এক বিদেশি ব্যাডা, গলফ খেলা শিকায়। হের লগে ওই দুধের লাহান ফরসা মাইয়ালোক শুইয়া আছিল, যে ব্যাডায় জেলে পচতাছে তার বউ। আমি হালায় চুপচাপ হেগো ঘরে ঢুকতে লইছি, বিদেশি ব্যাডা চিল্লাচিল্লি শুরু কইরা দিল।

‘আমি হালায় মনে করতে পারি না শাফকাত ওই মাইয়াডার নাম আমারে কইছিল না কি কয় নাই,’ বলে চলেছে নেহাল। ‘হয়তো কইছে, আমি মনে রাখতে পারি নাই। তয় লোকটার নাম আমি ভুলি নাই। সিংরাজ, উত্তম। শাফকাতে ভাবছিল ওই বাড়িতে নগদ দুই তিন হাজার টেহা থাকবার পারে। কিন্তু ভেতরে মাত্র ঢুকছে, ওই ব্যাডার ঘুম ভাইঙ্গা গেছিল। কে কইব কি ঘটনা, অইতে পারে লোকটা হুদা নাক ডাকছে, আর হেইডা হুইনাই ঠাস ঠাস গুলি কইরা দুইজনেরে মাইরা ফালাইছে কুত্তার বাচ্চাডা।’

নয়.

নেহালের গল্প পুরোটাই বিশ্বাস করল উদ্যম। শাফকাতের অবাছাই শিকার ছিল না সিংহরাজ, তার জানা ছিল বিদেশি এই গলফ ইস্ট্রাষ্টের প্রচুর টাকা কামায়, তার বাড়িতে অন্তত পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া যেতে পারে।

আরেকটা তথ্য উদ্যমের মনে আশা জাগাচ্ছে। গলফ ক্লাবের লাগোয়া একটা জেটি আছে, সেই জেটির দেখাশোনার কাজ করত এক লোক, শাফকাতের যে বর্ণনা নেহাল দিচ্ছে তার সঙ্গে ওই লোকের অনেক কিছু মিলে যায়—হতে পারে ওই লোক শাফকাতই ছিল। লোকটার কথা পরিষ্কার মনে করতে পারছে উদ্যম—তার তাকানোর ভঙ্গিটা ছিল ভারি অস্বস্তিকর, যেন তোমার মাপ নিচ্ছে। তবে বেশিদিন ওই চাকরি করেনি সে। হয় সে নিজে থেকে চলে গিয়েছিল, নয়তো জেটির দায়িত্বে থাকা মুন্না ভাই তাকে বিদায় করে দিয়েছিল।

তো ঝম ঝম বৃষ্টির মধ্যে মৌলানা রহমানের সঙ্গে দেখা করতে গেল উদ্যম হাসান। প্রশাসনিক শাখায় বেশ বড় একটা দালানে বসেছেন তিনি। তাঁর ডেস্কের পেছনে একটা দরজা আছে, ওটা দিয়ে সহকারী ওয়ার্ডেনের অফিসে যাওয়া যায়। সহকারী বাইরে কোনো কাজে গেছেন, তার বাদল মিয়া আছে—একাধারে কেরানির, পিয়নের, আবার মালির দায়িত্বও পালন করতে হয় তাকে।

‘আসসালামুআলায়কুম, উদ্যম সাহেব। আপনার কি উপকারে লাগতে পারি আমি?’

‘স্যার,’ উদ্যম বলল, এবং আধবুড়ো বাদল মিয়া আমাদের বলেছে যে তার গলা মৌলানা রহমান চিনতেই পারছিলেন না, এতই বদলে গেছে সেটা। ‘স্যার...এখানে একটা ব্যাপার ঘটেছে...আমার জীবনে এমন একটা কিছু ঘটে গেছে...সেটা এমনই, এমনই যে...আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কোথেকে শুরু করব।’

‘ঠিক আছে, আগে আপনি শান্ত হয়ে সামনের ওই চেয়ারে বসুন,’ উদ্যমকে বললেন মৌলানা সাহেব। ‘তারপর শুরু করুন একদম শুরু থেকে। তাতেই ভালো ফল পাওয়া যায়।’

সেটাই করল উদ্যম। শুরু করল কেন তাকে জেলে আসতে হয়েছে তার ব্যাখ্যা দিয়ে। তারপর তাকে মাখনা নেহাল যা বলেছে হুবহু সেটা মুখস্থ বলে গেল। তার কথা শেষ হতে একদম বোবা হয়ে বসে থাকলেন মৌলানা রহমান। বেশ খানিক পর মুখ খুললেন তিনি, বললেন, ‘হ্যাঁ, এরকম জঘন্য গল্প জীবনে এই প্রথম শুনিছি আমি। তবে আমাকে বিস্মিত করেছে অন্য একটা ব্যাপার, উদ্যম।’

‘অন্য একটা...কি, স্যার?’

‘গল্পটা আপনাকে একদম পেয়ে বসেছে দেখে।’

‘স্যার? আ-আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।’ পরে বাদল মিয়া আমাদের বলেছে, তেরো বছর আগে যে উদ্যম হাসান কারখানার ছাদে আলকাতরা লাগানোর সময় দবির খানকে মাথা নত করতে বাধ্য করেছিল, সেই একই ব্যক্তি শব্দ খুঁজে না পেয়ে তোলটানি করেছিল।

‘শুনুন, সাহেব,’ মৌলানা বললেন, ‘এটা আমার কাছে পরিষ্কার যে এই লোকটা, মাখনা নেহাল, আপনাকে খুব প্রভাবিত করতে পেরেছে। তার কথায় আপনি যাকে বলে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছেন। আপনার জীবনের করুণ কাহিনি শুনে খারাপ লেগেছে তার, এবং আপনাকে হাসি-খুশি দেখতে চাওয়াটা তার জন্যে খুব স্বাভাবিক। তার বয়স কম, খুব একটা বুদ্ধিমানও নয়। সে ধারণা করতে পারেনি এরকম একটা বানোয়াট গল্প আপনার কি অবস্থা করবে। এখন আমি বলি কি...’

‘আপনি কি মনে করেন, আমিও এ-সব ভাবিনি?’ প্রশ্ন করল উদ্যম। ‘কিন্তু গলফ ক্লাবে যে লোক ইন্সট্রাক্টর হিসেবে চাকরি করত তার নাম বা চেহারার বর্ণনা আমি কাউকে দিইনি-না নেহালকে, না অন্য কাউকে। কিন্তু নেহালের

সেলমেট শাফকাত ওই লোকের যে বর্ণনা দিয়েছে তা হুবহু সঠিক হতে পারে কিভাবে, যদি সত্যি সে তাকে খুন না করে থাকে?’

‘আপনি হয়তো বাছাই করা একটা পয়েন্টের ওপর ভর করতে চাইছেন। মৃদু শব্দে হেসে উঠে বললেন মৌলানা সাহেব।

‘ব্যাপারটা সেরকম নয়, স্যার...’

‘আপনি ওদিকটায় জোর দিচ্ছেন,’ বাধা দিয়ে বললেন মৌলানা। ‘আমি তা দিতে পারছি না। আর তা ছাড়া, আসুন স্মরণ করি যে ওই গলফ ক্লাবে ওই নামে কোনো লোক অত দিন আগে সত্যি ছিল কিনা তা শুধু আপনার কাছ থেকে জানছি আমরা।’

‘না, স্যার,’ আবার বাধা দিল উদ্যম। ‘না, তা সত্যি নয়। কারণ...’

‘যাই হোক,’ আবার উদ্যমকে থামিয়ে দিলেন মৌলানা সাহেব, গলা খুব ভারী। ‘আসুন, টেলিস্কোপের আরেক দিক দিয়ে দেখা যাক। কেমন? ধরুন, কথার কথা বলছি আর কি, শ্রেফ ধরুন, মীর শওকত নামে সত্যি একজন লোক ছিল।’

‘শাফকাত,’ আঁটসাঁট গলায় বলল উদ্যম।

‘শাফকাতই, ঠিক আছে। এবং এও ধরা যাক সে খুলনায় মাখনা নেহালের সেলমেট ছিল। খুব বেশি সম্ভাবনা এতদিনে রিলিজ অডার হয়ে গেছে তার। নেহালের সঙ্গে তার পরিচয় হবার আগে কতদিন সে জেল খেটেছে তাও তো ছাই জানি না আমরা। জানি?’

‘না। তবে নেহাল বলছে সে লোক ভালো না, তার মেয়াদ কমার কোনো সম্ভাবনা নেই, বরং বাড়ার কথা। সে হয়তো এখনও ওখানে আছে। আর যদি ছাড়া পেয়ে থাকে, নিশ্চয়ই তার ঠিকানা রাখা হয়েছে, স্বজনদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে।’

‘এ-সব লোক সাধারণত মিথ্যে তথ্য দিয়ে যায়, ঠিকানা ধরে গিয়ে দেখা যাবে দুটোই কানাগলি।’

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল উদ্যম, তারপর বিস্কোরিত হলো। সে, ‘তবু এটা একটা সুযোগ তো?’

‘হ্যাঁ, তা বটে। তো, উদ্যম সাহেব, আসুন ধরে নিই শাফকাতের অস্তিত্ব আছে, এবং সে এই মুহূর্তে খুলনার জেলে পচছে। এখন, কেটলির এই মাছ আমরা যদি বালতি করে নিয়ে যাই তার কাছে, কি বলবে সে? সে কি মেঝেতে হাঁটু নামিয়ে, কোটরের ভেতর চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে বলবে, “আমি করেছি!



আমি করেছি! আমার সিঁধ কাটার অভিযোগে যাবজ্জীবন দণ্ডের কথা যোগ করুন।”?’

‘আপনি এতটা অবুঝ হবার চেষ্টা করছেন কেন?’ বলল উদ্যম, এত নিচু গলায় যে বাদল মিয়া কোনো রকমে শুনতে পেল। তবে মৌলানা সাহেবের চড়া গলা শুনতে তার কোনো সমস্যা হয়নি।

‘কি? আপনি আমাকে কি বললেন?’

‘অবুঝ!’ চৈঁচিয়ে উঠল উদ্যম। ‘এটা কি ইচ্ছাকৃত?’

‘উদ্যম, আপনি আমার পাঁচ মিনিট সময় নষ্ট করেছেন-না, সাত মিনিট-এবং আজ আমার শেডিউল এত টাইট যে...’

‘ওই ক্লাবে সব তথ্য সংরক্ষিত আছে, এটা আপনি বুঝতে পারছেন না?’ রীতিমতো চৈঁচাচ্ছে উদ্যম। ‘সে বায়োডাটা জমা না দিয়ে ওই ক্লাবে চাকরি পেয়েছিল? ওখান থেকে বেতন নেয়নি? ছুটির দরখাস্ত করেনি? তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না? পনেরো বছর পুরো একটা জীবন নয়, অনেক কর্মচারীকে এখনও ওখানে পাওয়া যাবে, আমি জানি। তারা তার কথা মনে করতে পারবে। হয়তো মুন্না ভাইকেও পাওয়া যাবে। তিনি নিশ্চয়ই শাফকাতকে মনে করতে পারবেন। নেহালকে আমি যদি সাক্ষি দিতে রাজি করতে পারি যে শাফকাত যা বলেছে সব সে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলুক, আর মুন্না ভাই যদি সাক্ষি দেন যে শাফকাত ওখানে কাজ করেছে, আবার নতুন করে আমার বিচার হবে। আমি...’

‘গার্ড! গার্ড! এই লোককে বাইরে নিয়ে যাও!’

‘আপনার আসলে হয়েছেটা কি?’ জিজ্ঞেস করল উদ্যম, বাদল মিয়া আমাকে বলেছে, ততক্ষণে গলার সব জোর দিয়ে চিৎকার শুরু করেছে সে। ‘এটা আমার জীবন, মিথ্যে অভিযোগ থেকে মুক্তি পাবার আমার একটা সুযোগ-এটা আপনি বুঝতে পারছেন না? নেহালের গল্প সত্যি না মিথ্যে একটা ফোন করে জেনে নিতে ইচ্ছে করছে না আপনার? শুনুন, ফোনের বিল আমি দেব...’

ততক্ষণে গার্ডরা দুদিক থেকে ধরে তাকে টানতে শুরু করেছে।

‘সলিটারি,’ শুকনো গলার বললেন মৌলানা সাহেব। ‘কুটি আপনি।’

গার্ডরা উদ্যমকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে সে, তখনও ওয়ার্ডেনকে লক্ষ্য করে চিৎকার করছে। বাদল মিয়া বলেছে, দরজা বন্ধ হবার পরও তার গলা শোনা যাচ্ছিল, ‘এটা আমার জীবন! এটা যে আমার জীবন, এই সহজ ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারছেন না? এরকম একটা হাবা লোককে কি কারণে এখানে কেউ পাঠাতে পারল!’

বিশ দিন শুধু রুটি আর পানি খেয়ে সলিটারিতে কাটাল উদ্যম। এটা তার দ্বিতীয়বার সলিটারিতে যাওয়া। এবং মৌলানা রহমানের সঙ্গে লাগার “অপরাধে” তার রেকর্ডে এই প্রথম কালো একটা দাগ পড়ল। আর কষ্টের কথা কি বলব। ওখানে আপনি-খাবার সময়, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার সময়, ঘুমাবার সময়, সব সময়-শুধু বসতে পারবেন। ওখানে যদি কেউ বিশ দিন থাকে, তার মনে হবে এক বছর থেকেছে। ত্রিশ দিনকে মনে হবে দু’বছর, চল্লিশ দিনকে মনে হবে দশ বছর। বাতাস ঢোকায় যে সরু নল আছে ওটার ভেতর মাঝে মাঝে ইঁদুর মরে পড়ে থাকে। পচা মাংসের গন্ধে আপনি মারা যেতে বসলেও আপনার কিছু করার নেই। যতই চিৎকার করুন, সেটা কেউ শুনতে পাবে না।

সলিটারি সম্পর্কে ভালো কিছু যদি বলার থাকে, তা হলো, ওখানে বসে আপনি চিন্তা করতে পারবেন। বিশদিন চিন্তা করার সময় পেয়েছে উদ্যম, তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে ওয়ার্ডেন মৌলানা রহমানের সঙ্গে বসার জন্যে আবার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইল। কিন্তু তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হলো।

ধৈর্য না হারিয়ে অনুরোধটা নবায়ন করল উদ্যম। আবার নবায়ন করল। তারপর আবার। তার মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। বলা যায় হঠাৎ করেই আমাদের চোখে পড়ল তার মুখে সরু সরু অনেক রেখা, মাথার দু’পাশের চুলে একটু সাদা ভাব। মুখের কোনে সব সময় মিটি মিটি যে হাসিটা লেগে থাকত, সেটা আর নেই। তার চোখ মাঝে মাঝে শূন্য তাকিয়ে থাকত, এবং ওভাবে কেউ তাকিয়ে থাকলে বোঝা যায় সে আসলে বছরগুলো গুনছে, কত বছর সাজা ভোগ করা হলো...কত মাস, কত সপ্তাহ আর কটা দিন।

সে তার অনুরোধ বার বার নবায়ন করতে থাকল। তার ধৈর্য দেখা গেল অসীম। সময় ছাড়া আর কিছু নেই তার।

অবশেষে মৌলানা রহমান তার সঙ্গে বসতে রাজি হলেন জুন মাসের শেষ দিকে। তাদের মধ্যে যে আলাপটা হয়েছিল, সেটা আমি আরও সাত বছর পর উদ্যমের মুখেই শুনেছি।

‘ব্যাপারটা যদি টাকা-পয়সার হয়, আপনার দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই,’ নিচু গলায় ওয়ার্ডেনকে বলেছিল উদ্যম। ‘এটা এমন একটা প্রসঙ্গ, আমি উচ্চারণ করতে পারি না, ঠিক? এ-সব চোখ ইশারায় সম্পন্ন হয়। আমি আপনাকে ইশারা দিচ্ছি...’

‘যথেষ্ট হয়েছে,’ উদ্যমকে থামিয়ে দিলেন ওয়ার্ডেন রহমান, পাথরের মতো ঠাণ্ডা লাগছে তাঁর চেহারা। চেয়ার সহ হেলান দিলেন তিনি, তাঁর মাথার ঠিক ওপরে লেখা রয়েছে: ‘তাঁর বিচার খুব নির্মম, এবং সেটা তাড়াতাড়ি চলে আসে।’

‘কিন্তু,’ শুরু করতে গেল উদ্যম।

‘আমার সামনে আর কখনও টাকা শব্দটা উচ্চারণ করবেন না,’ বললেন মৌলানা সাহেব। ‘এই অফিসে নয়, অন্য কোথাও-ও নয়। তবে আপনি যদি চান লাইব্রেরি তুলে দিয়ে আমরা আবার ওটাকে রং রাখার গুদাম বানাই, তাহলে আলাদা কথা। বুঝতে পেরেছেন?’

‘আমি আপনার মনটাকে শান্ত করার চেষ্টা করছিলাম, তার বেশি কিছু না।’

‘মন শান্ত করার জন্যে দুঃখের সাগরে ভেসে থাকা আপনার মতো বেজন্মা কাউকে যখন দরকার হবে আমার, আমি তখন অবসর নেব। আমি বিরক্ত হয়ে এই সাক্ষাতে রাজি হয়েছি, উদ্যম। আমি চাইছি এটা এখানেই থামুক। আপনার যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে হিমালয় পাহাড় কিনবেন, সেটা আপনার ব্যাপার। সেটাকে আমারও ব্যাপার করতে যাবেন না। যদি দরজা খোলা রাখতাম, আপনার মতো এরকম পাগলামি প্রতি সপ্তায় দু’চারটে করে শুনতে হত আমাকে। আপনার প্রতি খানিক সম্মান বোধ ছিল। তবে এর সমাপ্তি এখানেই। পরিষ্কার কিনা?’

‘হ্যাঁ,’ বলল উদ্যম। ‘কিন্তু আমি একজন উকিলকে নিয়ে আসছি, জানেন তো?’

‘আল্লাহ! কেন?’

‘আমার ধারণা, ব্যাপারটা আমরা গুছিয়ে ফেলতে পারব,’ বলল উদ্যম। আমার জবানবন্দি, মাখনা নেহালের জবানবন্দি, গলফ ক্লাবের কর্মচারীদের জবানবন্দি সহ রেকর্ডস যেখানে যা আছে সব জড়ো করে জায়গামতো পুনরায় বিচারের আবেদন করা হবে। আমার ধারণা, সব আমরা সাজিয়ে ফেলতে পারব।’

‘এই জেলখানায় এখন আর আপনি মাখনা নেহালকে পাচ্ছেন না

‘হোয়াট?’

‘তাকে ট্রান্সফার করা হয়েছে।’

‘ট্রান্সফার করা হয়েছে কোথায়?’

‘জাফলংয়ে।’

এবার চুপ হয়ে গেল উদ্যম। ইন্টেলিজেন্ট মানুষ সে, তবে গোটা ব্যাপারটা থেকে চুক্তি চুক্তি যে গন্ধটা ছড়াচ্ছিল সেটা অসাধারণ একটা হাবা লোকের

ইন্দ্রিয়কেও ফাঁকি দিতে পারত না। জাফলংয়ে যে নতুন জেলখানা হয়েছে, ওখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নামকাওয়াস্তে।

‘কিন্তু কেন?’ জিজ্ঞেস করল উদ্যম। ‘কেন আপনি-?’

‘আপনার ভালোর জন্যে,’ শান্ত গলায় বললেন আলফাজুর রহমান। ‘খুলনার ওই জেলখানার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি আমি। মীর শাফকাত নামে এক কয়েদি সত্যি ওদের ওখানে ছিল এক সময়। সাজার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে তাকে। ঠিকানা একটা রেখে গেলে কি হবে, আমি খোঁজ নিতে বলার পর দেখা গেছে সেটা ভুয়া।’

উদ্যম জানতে চাইল, ‘ওখানকার ওয়ার্ডেন...তিনি কি আপনার বন্ধু?’

রহমান সাহেবের মুখে সতর্ক প্রহরীর টান টান হাসি। ‘আমাদের মধ্যে সম্ভাব আছে আর কি।’

‘কেন?’ প্রশ্নটা আবার করল উদ্যম। ‘আপনি আমাকে বলতে পারছেন না এই কাজ আপনি কেন করতে গেলেন? আপনি জানেন আমি ওই বিষয়ে আলাপ করতে পারি না...যে বিষয়ে আপনি জড়িয়ে পড়তে চাইতে পারেন। আপনি সেটা জানতেন। তাহলে কেন?’

‘আপনার মতো লোক আমাকে অসুস্থ করে তোলে,’ চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন মৌলানা সাহেব। ‘আপনি যেখানে আছেন ওখানেই আপনাকে আমার ভালো লাগছে, জনাব উদ্যম। এবং আমি যতদিন কাঠফাটায় আছি, আপনাকেও এখানে থাকতে হবে। শুনুন, আমি জানি নিজেকে আপনি সবার চেয়ে উত্তম জ্ঞান করেন। একজন মানুষের মুখ দেখে আমি তার সবটুকু পড়ে নিতে পারি। প্রথম যেদিন আমি লাইব্রেরিতে পা রাখলাম সেদিনই ব্যাপারটা জেনেছি, বলা যায় আপনার কপালে বড় হরফে সেটা লেখা আছে। তবে সে-সব এখন নেই, মুছে গেছে। আর এখনকার শ্রিয়মান ধরনটাই আমার পছন্দ। আগে দেখতাম উঠানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন যেন একজন রাজা, ওটা যেন আপনার দরবার। চোখ খোলা রাখব, আবার ওভাবে হাঁটতে দেখলে সলিটারিতে পাঠাব। এবার যান, ঘুরিয়ে যান এখান থেকে।’

‘ঠিক আছে। কিন্তু সরকারি অনুমতি না নিয়ে যে-সব কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে এখানে, যে-সব খাত থেকে প্রচুর টাকা সংগ্রহ করা হচ্ছে, সব বন্ধ হয়ে যাবে এখন থেকে। আপনার কাছে যে টাকা জমা হচ্ছে, ওগুলো সংভাবে রোজগার করা, আমার তৈরি করা কাগজ-পত্র তাই বলবে বলে জানিয়েছিলাম-কিন্তু এখন আর তা বলবে না।’

আলফাজুর রহমানের চেহারা প্রথমে লালচে, তারপর কালচে হয়ে গেল। ‘দুঃসাহস দেখিয়ে এই কথাটা বলার অপরাধে ত্রিশ দিন সলিটারি পেলেন, রুটি আর পানি। আরও একটা কালো দাগ। আপনার জীবন আমি শ্রেফ নরক বানিয়ে ছাড়ব। সখিরা আপনাকে তাদের তালিকার বাইরে রেখেছে, তাই না? আমাকে অসন্তুষ্ট করলে ওদেরকে আবার লেলিয়ে দেব। আপনি সব কিছু হারাবেন। পরিষ্কার কিনা?’

আমার ধারণা, খুবই পরিষ্কার।

সময় বইতে থাকে। পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো চাতুর্য, এবং সম্ভবত এটাই একমাত্র সত্যিকার জাদু। তবে উদ্যম হাসান বদলে গেছে। বদলে শক্ত আর কঠিন হয়ে গেছে। একমাত্র এভাবেই তার অবস্থার বর্ণনা দিতে পারি আমি। লাইব্রেরির অস্তিত্ব ধরে রাখার জন্যে মৌলানা রহমানের নোংরা কাজ করে যাচ্ছে সে, ফলে বাইরে থেকে দেখে সবকিছু সেই আগের মতোই লাগছে সব।

উনিশ বছর পর আমার কাছে আবার একটা রক হ্যামার চাইল উদ্যম। ভাবতে পারেন, উনিশ বছর! প্রথমটার ধার কমে গেছে। রক হ্যামারের দাম বেড়ে দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে শুনে দুজন খুব হাসাহাসি করলাম আমরা।

শরীর চর্চার উঠান থেকে সংগ্রহ করা পাথর আগের মতোই ঘষছে সে, পালিশ করছে, সিজের সেলে সাজিয়ে রাখছে, আবার মন চাইলে একে-তাকে উপহার দিচ্ছে। তার সেলের পুর্নদিকের জানালায় বেশ কয়েকটা ভাস্কর্য রেখেছে সে, সকালের প্রথম রোদ লাগে ওগুলোয়। তখন নাকি খুব ভালো লাগে তার। এক সময় সবই বিলি করে দিতে হয় তাকে, কারণ জায়গার অভাবে নতুন বানানো ভাস্কর্য মেঝেতে ফেলে রাখতে হয়। আমাকেই নিজের তৈরি বিশটা ভাস্কর্য দিয়েছে সে। আকারে ছোট হলেও, প্রতিটির নিজস্ব আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। মাঝে মধ্যে ভাবি উদ্যমের যদি মন আর সুযোগ থাকত, খুব নাম করা একজন শিল্পী হতে পারত সে।

মৌলানা রহমানের কাছে উদ্যমের হার হবার পর কিছুদিন যেন এক দুই করে চার বছর পার হয়ে গেছে। বদলে গিয়ে আর সবকিছুর মতো হয়নি সে, হয়েছে নীরব, আত্মকেন্দ্রিক, বিষণ্ণ আর চিন্তিত। কে তাকে দোষ দেবে বলুন? কাজেই ধরে নেয়া চলে যে মৌলানা রহমান তার ওপর সন্তুষ্টই আছেন, অন্তত আপাতত।

সে বছর অক্টোবরের দিকে, কত সাল সঠিক মনে করতে পারি না, উদ্যমকে আমি বিষণ্ণতা কাটিয়ে উঠতে দেখলাম। একদিনের কথা মনে পড়ছে। দেয়ালে গায়ে হেলান দিয়ে, হাঁটু ভাঁজ করা, উঠানের মাটিতে বসে আছে সে, দু'হাতে ছোট ছোট পাথর, মুখটা সূর্যের দিকে তোলা।

‘হ্যালো, সদয়,’ গলা চড়িয়ে ডাকল সে। ‘এসো, এখানে বসে একটু ধ্যান করি আর প্রার্থনা করি যা কিছু অশুভ সব দূর হয়ে যাক।’

ওর পাশে গিয়ে বসলাম।

‘এটা তুমি নেবে?’ জিজ্ঞেস করল সে, দুটো পালিশ করা মূর্তির একটা দেখাল আমাকে।

‘হ্যাঁ, নেব। সত্যি ভারি সুন্দর। ধন্যবাদ।’

কাঁধ ঝাঁকিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। ‘আগামী বছর তোমার জন্যে বিরাট একটা বার্ষিকী আসছে।’

মাথা ঝাঁকালাম। আগামী বছর এখানে আমার ত্রিশ বছর পুরো হবে। আমার জীবনের ষাট ভাগ কাঠফাটায় কেটেছে।

‘কি মনে হয়, তুমি কখনও এখান থেকে বেরোতে পারবে?’

‘শিওর। আমার তখন লম্বা সাদা দাড়ি থাকবে, আর অবশিষ্ট থাকবে মাত্র তিনটে মার্বেল, দোতলার কোথাও গড়াগড়ি খাচ্ছে।’

মৃদু হেসে সূর্যের দিকে আবার মুখ তুলল, চোখ বন্ধ। ‘ভালো লাগছে।’

‘শীত চলে আসতে আর বেশি দেরি নেই তো, ভালো লাগার সেটাই হয়তো কারণ।’

মাথা ঝাঁকাল উদ্যম। তারপর দুজনেই বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে আছি।

‘যদি কোনো দিন বেরোতে পারি, তাহলে সব সময় গরম আবহাওয়া থাকে সেরকম জায়গায় যাব। সেটা আমার বাছাইও করা আছে। কোথায় জানো?’

‘কোথায়?’

‘দক্ষিণ ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে,’ বলল সে, সুর করে উচ্চারণ করল, কোমল স্বর। ‘ভারত মহাসাগরের কোলে তেরো হাজার দ্বীপের একটা। প্রচুর পাহাড়, তবে মাটি খুব উর্বর। জাতার পুবে, বুঝলে, দ্বীপটাকে মাঝেমধ্যে পুবের রক্ত বলা হয়। নাচ, ধর্মীয় আচার আর হস্তশিল্পের জন্যে বিখ্যাত। বালি পরিবারগুলো অসম্ভব অতিথিপরায়ণ। আর ওখানেই আমি আমার জীবনটা শেষ করতে চাই, সদয়। একটা উষ্ণ জায়গা, যার একটা সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে।’

কথা বলার সময় মুঠো ভর্তি করে কাঁকর নিল, একটা একটা করে ছুঁড়েছে, ওগুলোকে লাফাতে দেখছে, গড়াতে দেখছে।

‘বালি। ওখানে আমি ছোট একটা হোটেল শুরু করব। সৈকত বরাবর ছ’টা কটেজ, আরও ছ’টা বেশ খানিক পেছন দিকে। আমার জানাশোনা লোক আছে, আমার গেস্টদের মাছ ধরতে নিয়ে যাবে সে। মউগুমের সবচেয়ে বড় মাছ যে ধরবে তাকে ট্রফি দেয়া হবে, তার ছবি বুলিয়ে রাখব লবিতে। যারা হানিমুনে আসতে চায় শুধু তাদের জন্যে খোলা থাকবে আমার হোটেল।’

‘টাকা লাগবে না? কোথায় পাবে?’

‘এমন একটা বাড়ির কথা কল্পনা করো, সদয় জাহান, যে বাড়ির ভেতর দেশি-বিদেশি নামকরা শিল্পীদের আঁকা ছবি, ভাস্কর্য, প্রাচীন যুগের আন্টিক, পুরনো কয়েনের কালেকশন থেকে শুরু করে সিন্দুক ভর্তি সোনার গয়না, কিছু মূল্যবান রত্ন ইত্যাদি আরও বহু কিছু তালা দিয়ে রাখা আছে।’

‘ওই বাড়িটা তোমার বলতে চাইছ?’

‘ওটা দেখাশোনা করছিল আমার এক বন্ধু, বছর ছয়েক আগে মারা গেছে সে। পুরনো আমলের বিশ্বস্ত লোকজনরা দেখে শুনে রাখছে আর কি। তবে আনোয়ারায়, কবরস্থান সংলগ্ন মসজিদের পেছনে একটা বটগাছ আছে। ওই গাছের গোড়ায়-পূবদিকে-পুঁতে রাখা আছে এক গোছা চাবি, কিছু কাগজ-পত্র, যেগুলো আমাকে নতুন একটা পরিচিতি দেবে- কারও সাহায্য ছাড়াই ঢুকতে পারব বাবার বাড়িতে, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিতে পারব। এর সবই আমার ওই বন্ধু আমার জন্যে করে রেখে গেছে। আমার কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী অবশ্য সাহায্য করেছে তাকে।’

‘জিনিসপত্র যা আছে, কত দামে বেচতে পারবে?’

‘দু’কোটি টাকার কম নয়।’

‘আর বাড়িটার দাম কত পাবে?’

‘আরও তিন কোটি ধরো, পুরো এক বিঘা জায়গার ওপর।’

‘জোড়া খুনের অভিযোগে তোমার আজন্ম জেল হলো, কিন্তু তোমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলো না কেন?’

‘আমার সম্পত্তি? আরে না, তখনও এসব আমার সম্পত্তি হয়নি। সব আমার বাপের নামে ছিল, এবং বাবা বহাল তবিয়েই সেজেও ছিলেন তখন, কাজেই আদালত ওদিকে হাত বাড়াতে পারেননি।’

‘তারমানে তুমি যখন উকিল ডাকবে বলেছিলে, সেটা তোমার ছেলমানুষি ছিল না? এত যার টাকা, দেশের সবচেয়ে বড় লইয়ারকে ভাড়া করতে পার

তুমি। কেন করোনি, উদ্যম? ও আল্লাহ! এখান থেকে তুমি রকেটের মতো বেরিয়ে যেতে পারতে!’

মৃদু হাসল উদ্যম, তারপর বলল, ‘না।’

‘না? কেন না?’

‘বাবা মারা গেছেন। আইনত এখন আমি ওই সম্পত্তির মালিক। কিন্তু যখনই আমি ওখান থেকে টাকা নেয়ার জন্যে হাত বাড়াব, অমনি ওটার ওপর ওদের নজর পড়বে, এবং সেটা বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টা চালানো হবে। সমস্যাটা বুঝতে পারছ এবার?’

হ্যাঁ, পারছি।

‘তবে আমার বালি যাওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না। শুধু ওই বাড়ি আর জিনিসপত্র নয়, এদিক সেদিক আরও অনেক কিছু আছে আমার। সব যে নিয়ে যাব, তা হয়তো নয়। তবে ওই হোটেলটা আমি করতে চাই। আমি আমার স্ত্রীকে খুন করিনি, আমি তার প্রেমিককেও খুন করিনি। যে অপরাধ করিনি তার জন্যে এত ভুগতে হলো, এবার সাগরে একটু সাঁতারাতে চাই, রোদে পোড়াতে চাই গায়ের চামড়া। এত কিছুর পর আমি কি খুব বেশি কিছু চাইছি, সদয়?’

আমি মাথা নাড়লাম।

‘কি জানো, সদয়। ওরকম একটা জায়গায় বন্ধুর সঙ্গে পেলো ভালো লাগে। আমার এমন একজন লোক দরকারও যে সব কিছু ম্যানেজ করতে জানে।’

তার প্রস্তাব নিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করলাম আমি। তারপর বললাম, ‘না, তা উচিত হবে না, উদ্যম। এখানে আমি ম্যানেজ করতে পারি, ঠিক, কিন্তু তারমানে এই নয় যে বাইরেও আমি তা পারব। আমি আসলে জানি না কিভাবে আমাকে গুরু করতে হবে, বা কোথেকে শুরু করতে হবে।’

‘তুমি নিজেকে ছোট করে দেখো,’ বলল সে। ‘তুমি একজন স্বশিক্ষিত মানুষ, নিজেই নিজেকে তৈরি করে নিয়েছ। একজন মানুষ সম্পর্কে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কি হতে পারে।’

‘কিন্তু আমার ভেতর মারাত্মক ধরনের অপরাধপ্রবণতা ছিল, আর...’

‘হ্যাঁ, ছিল তো, তা না হলে কেউ নিজের স্ত্রীকে খুন করতে পারত? কিন্তু তারপর? আর কোনো অপরাধ নিজেকে দিয়ে করাতে পেরেছ? সেদিকে তোমার ঝোঁক টের পেয়েছ কখনো? একটা অপরাধ করে সেটা হজম করতে পারনি, সারাটা জীবন ধরে অনুশোচনায় ভুগছ।’

‘নিজের সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই—নিজের কথা আমি যতটুকু জানি, উদ্যম দেখছি তারচেয়ে কম কিছু জানে না। বললুম, ‘বাইরে আমি ভালো করব না, এটা আমি জানি, উদ্যম।’



দাঁড়াল সে। ‘এটা নিয়ে আরও চিন্তা করো,’ সাবধানে বলল, ‘সিদ্ধান্ত যদি কোনোদিন বদলাও ভেবে তোমার ব্যবস্থা আমার করা থাকবে।’ তারপর শান্ত পায়ে চলে গেল, সে যেন একজন মুক্ত মানুষ, আরেকজন মুক্ত মানুষকে এই মাত্র একটা প্রস্তাব দিয়ে গেল। কিন্তু সেলের ভেতর রাতে আবার নিজেকে আমার কয়েদি মনে হতে লাগল।

দিন কাটছে, কিন্তু আমার মনে শান্ত হতে পারছে না। মেক্সিকো যাবার কথা নিয়ে যেদিন আলাপ করল উদ্যম সেদিন থেকেই আমার মনে একটা সন্দেহ দানা বেঁধেছে, সে সম্ভবত গায়েব হয়ে যাবার প্ল্যান করছে।

কিন্তু কাঠফাটা থেকে পালানোর চেষ্টা শতকরা নিরানব্বুই ভাগ ব্যর্থ হবার রেকর্ড আছে। তবে গার্ডরা সহায়তা করলে অন্য হিসাব। এ-সব মৌলানা রহমান জানেন, এবং উদ্যমের ওপর কড়া নজর আছে তাঁর।

আমি এখনও মনে করি তার মুক্তি পাওয়ার সবচেয়ে ভালো সুযোগ তৈরি হবে দক্ষ একজন লইয়ারের ওপর সব যদি ছেড়ে দেয়া হয়, বিচারটা যদি আবার নতুন করে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যায়।

এ-সব প্রসঙ্গ নিয়ে উদ্যমের সঙ্গে প্রায়ই আমি কথা বলি। সে শুধু একটু একটু হাসে, তার চোখ থাকে বহুদূরে, আমাকে আশ্বস্ত করার সুরে বলে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করছে সে।

পরে দেখা গেল আরও অনেক কিছু নিয়ে চিন্তা করছিল উদ্যম হাসান।

দশ.

সময় ধীরে বইছে, তারপরও কিভাবে যেন ছ’মাস কেটে গেল। তার মধ্যে বরার মতো মাত্র একটা ঘটনাই ঘটেছে কাঠফাটায়।

ছোটখাট আকৃতি। মাথাটা লম্বাটে আর সরু। দেখতে শক্তিশালী এবং মজবুত লাগে, হাবভাবে দৃঢ়চেতা। ক্রমশ সরু মুখ ভাঁজ করা, ইংলিশ অক্ষর V আকৃতির কান। গায়ের লোম ছোট। প্রকৃতি যে কোট পুষিয়ে রেখেছে সেটা সাদা, তবে কালো বা মরচে রঙা দাগ দেখা যাচ্ছে গায়ে, চোখের ওপর আর পায়ে। ছোটখাট হলে কি হবে, সারাক্ষণ লাফানুফি আপাঝাপি করছে, তার মধ্যে ক্লান্তির ছিঁটেফোঁটাও নেই। ভারি সুন্দর দেখতে, অসম্ভব সজাগ, আমাদের কেউ কেউ এমনকি তার চেখে বুদ্ধির বিলিকও আবিষ্কার করে ফেলল।

কেউ জানে না কাঠফাটা জেলখানায় কিভাবে বা কোথেকে এসে জুটল ওটা। কোন দেশের জীব, কি জাত, কেউ কিছুর বলতে পারছে না।

ওটাকে দেখে সবাই বলতে গেলে আনন্দে আত্মহারা। সবাই নাগালে পেতে চাইছে, গায়ে হাত বুলিয়ে একটু আদর করতে চাইছে। তাতে বেশ বিরক্ত ওটা, অন্তত আচরণ দেখে সেরকমই আমাদের মনে হলো। আদর নিচ্ছে, কিন্তু তার ভাবভঙ্গি যেন বলতে চাইছে অনেকটা যেন বাধ্য হয়ে আমাদের এই অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে তাকে, সে যেন এখানে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। সেটা কি, ব্যাখ্যা করে আমাদের জানাল উদ্যম হাসান।

সে গড়গড় করে বলে গেল এই কুকুর একটা ফক্স টেরিয়ার। বিদেশে গ্রাম্য এলাকায় পোষা হয় ওদেরকে, কারণ ফক্স টেরিয়ার হলো শিয়ালের যম। যেখানেই লুকাক শিয়াল, একটা টেরিয়ার ঠিক তাকে খুঁজে বের করে ফেলবে, প্রয়োজনে গর্তের ভেতর ঢুকে হলেও। পৃথিবীর বহু দেশে শিয়াল ধরার জন্যে ওগুলোকে ব্যবহার করা হয়। কিছু টেরিয়ারের চুল তারের মতো দেখতে হয়, আবার কিছু টেরিয়ারের চুল হয় মসৃণ ও নিভাঁজ। ফক্স টেরিয়ারকে ইংল্যান্ডের কুকুরই বলা হয়।

কয়েদিরা অবাক হয়ে জানতে চাইল, ফক্স টেরিয়ার সম্পর্কে এত কথা উদ্যম জানল কিভাবে? উদ্যমের মুখ থেকেই জানা গেল সে যখন খুব ছোট, তারা যখন গ্রামে থাকত, ওর বাবা তখন শিয়ালের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্যে দুটো ফক্স টেরিয়ার কিনেছিলেন, সেই সূত্রে এসব তথ্য জানার সুযোগ পেয়েছিল সে।

কোথেকে এল ওটা? জানতে চাইল উদ্যম।

বললাম সেটা কেউ বলতে পারছে না।

জেলখানার ভেতর প্রতিদিনই কত লোক আসছেন, তাঁদের মধ্যে মন্ত্রী থেকে শুরু করে দেশি-বিদেশি মানবিধাকর কর্মকর্তারাও থাকেন, সম্ভবত তাঁদেরই কেউ একজন ওটাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু যাবার সময় খেয়াল না থাকায় ফেলে রেখে চলে গেছেন, পরে আর মনে করতে পারেননি কোথায় হারিয়েছেন।

কয়েদি এবং গার্ডরা মিলে সিদ্ধান্ত নিল ফক্স টেরিয়ার বিশেষজ্ঞ উদ্যম হাসানকেই কুড়িয়ে পাওয়া এই কুকুরকে দায়িত্ব নিতে হবে। এক গাল হেসে তাতে সানন্দে রাজি হলো উদ্যম। কিন্তু তাকে যখন জিজ্ঞাস করা হলো, কুকুরটা কি উদ্দেশ্য নিয়ে জেলখানায় ঢুকেছে, সে উত্তর দিতে পারল না, শুধু বলল তাকে আরও কটা দিন সময় দিতে হবে।

কিন্তু পরদিনই একটা খবর গোটা জেলখানায় হতাশা ও আতঙ্ক ছড়াল, ভয়ে আর আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল সবাই।

খবরটা হলো, জেলার মৌলানা আলফাজুর রহমান কঠিন ভাষায় নির্দেশ জারি করেছেন, ‘নাপাক কুত্তার বাচ্চাকে যেখানে দেখবে সেখানেই খুন করবে গার্ডরা, এর অন্যথা হলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।’

দশ মিনিট পর এই নির্দেশের সংশোধনী ঘোষণা করা হলো।

‘নাপাক কুত্তাকে কেউ যদি ইচ্ছে করে না ধরে বা না মারে, তাহলে একা শুধু তাকে শাস্তি দেয়া হবে না, সে যদি গার্ড হয় তাহলে ডিউটিতে থাকা সব কজন গার্ডকেও সাজা ভোগ করতে হবে। এই আদেশ কয়েদিদের জন্যেও প্রযোজ্য।’

গার্ড আর কয়েদিদের মধ্যে ফিসফাস আলোচনা শুরু হলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে দু’পক্ষ একমত হলো: ফক্স টেরিয়ারকে রক্ষা করা হবে।

কিভাবে তা সম্ভব? উদ্যম বলল, একটাই উপায়, লুকিয়ে রেখে। সবাই একমত হলো, হ্যাঁ, ফক্স টেরিয়ারকে লুকিয়ে রাখতে হবে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠল, কেউ যদি বেইমানি করে? ধরা যাক জেলারের চোখে ভালো হবার জন্যে গার্ডদের বা কয়েদিদের কেউ একজন তাঁকে জানিয়ে দিল, কুকুরটাকে সবাই মিলে লুকিয়ে রাখছে, তখন কি হবে?

সিদ্ধান্ত হলো, সে রকম যদি কিছু ঘটে তাহলে সেটা যখন ঘটবে তখন দেখা যাবে। কে বেইমানি করল, এটা জানা কাঠফাটায় অন্তত কঠিন কিছু নয়। এবং একবার শুধু চেনা গেলে হয়, বেঁচে থাকা অভিশাপ বলে মনে হবে তাঁর।

চব্বিশ ঘণ্টাও পার হলো না, গার্ডদের নতুন চিফ মোতালেবকে ডেকে জেলার আফলাজুর রহমান বললেন, ‘নাপাক কুত্তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আমার কানে এরকম একটা কথা এসেছে যে ওটাকে নাকি লুকিয়ে রাখা হয়েছে। আপনাকে দু’ঘণ্টা সময় দিলাম, তদন্ত করে প্রকৃত পরিস্থিতি জানাবেন আমাকে। রিপোর্ট যদি অসত্য হয়, আপনার কপালে খারাবি আছে।’

গার্ডদের প্রধান হস্তদস্ত হয়ে সোজা উদ্যমের সেলে হাজির হলো। অবাধ্য প্রহরী প্রধান মোতালেব এবং অপরাধীদের হোতা উদ্যম নিঃশব্দে গলায় বেশ কিছুক্ষণ পরামর্শ করল।

‘জেলারকে আমি কি রিপোর্ট দেব, উদ্যম সাহেব?’ উদ্যম একটা ব্যাক্সের ভাইস চেয়ারম্যান ছিল, তাকে লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্ব পালন করতে দেয়া হয়েছে, সুখিরা তাকে সমীহ করে চলে, এসব কারণে উদ্যমকে অনেকেই সাহেব বা মিস্টার বলে।

উদ্যম যেন প্রশ্নটা নিয়ে আগেই চিন্তা-ভাবনা করেছে, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, ‘আপনি রিপোর্ট করবেন, জেলারকে নিশ্চয়ই কেউ ভুল তথ্য দিয়েছে। আসল তথ্য হলো, ফক্স টেরিয়ার কুকুরটাকে আমরা মেরে মাটিচাপা দিয়েছি। আর হুবহু ওরকম আরেকটা কুকুরকে কেউ কেউ দেখেছে বলে যে দাবি জানানো হচ্ছে, সেটার ব্যাখ্যা হলো, ওটা নতুন একটা কুকুর, সম্ভবত প্রথমটার যমজ।’

‘কি?’ রিপোর্ট পড়ে জেলার সংকটে পড়ে গেলেন. হাসবেন না কাঁদবেন বুঝতে পারছেন না। ‘ওটা আরেকটা কুকুর? আগেরটার যমজ? কিন্তু তা কি করে হয়!’

‘হলে খুব সহজেই হয়ে যায়, স্যার,’ বলল মোতালেব। ‘প্রথম বার তাই হলো না?’

‘প্রথমবার তাই হলো মানে?’

‘প্রথম কুকুরটা কিভাবে এখানে ঢুকল, আমরা কেউ জানি, বলুন? সেরকম, এটার কথাও কেউ কিছু বলতে পারছে না—কার কুকুর, কোথেকে বা কিভাবে এখানে এল, কারও কিছু জানা নেই।’

খানিক চিন্তা করার পর জেলার নতুন নির্দেশ দিলেন, ‘এই কুত্তাকেও মারতে হবে, এবং সেটা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। আর মনে রাখবেন, এবার আমি কুত্তার লাশ দেখব।’

‘জি, স্যার; অবশ্যই, স্যার,’ বলে জেলারের সামনে থেকে পালিয়ে এল মোতালেব।

আবার উদ্যমের সেলে মিটিং বসল। এবারও দেখা গেল মোতালেব কি প্রশ্ন করবে তা যেন জানত সে, তাই সংকট থেকে উত্তরণের পথ সঙ্গে সঙ্গে বাতলে দিল। ‘চিন্তার কিছু নেই, জেলারকে কুকুরের লাশ দেখানোর ব্যবস্থা হবে।’

উদ্যমের পরামর্শে বিশ্বস্ত একজন গার্ডকে ডেকে কোথায় গিয়ে কি ব্যবস্থা করতে হবে বুঝিয়ে দিল মোতালেব। গার্ড ছুটল শহরে, সরাসরি মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে গিয়ে খোঁজ নিল তাদের কুকুর ধরে মেরে ফেলার প্রোগ্রাম এই মুহূর্তে চালু আছে কিনা। তাকে বলা হলো, হ্যাঁ, চালু আছে। এই মুহূর্তে তাদের টিম কে. সি. দে রোডে অভিযান চালাচ্ছে।

আবার ছুটল গার্ড। রোডে দেখা গেল বিষম যানজট। কারণ রাস্তা বন্ধ করে কুকুর ধরার কাজ চলছে। আগে কুকুরকে মেরে ফেলার কাজটা করা হতো লোকচক্ষুর অন্তরালে। এখন কুকুরকে ধরে তোলা হচ্ছে ট্রাকে, তারপর মিউনিসিপ্যালিটির ডাক্তাররা বিষ মেশানো ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলছে

ওগুলোকে। বলা হচ্ছে বটে ডাক্তার, তবে যারা ইঞ্জেকশন দিচ্ছে তাদের চেহারা-সুরত আর হাবভাব দেখে মনে হলো পিয়ন। গার্ডের তাতে সুবিধেই হলো। তাদের একজনের হাতে দুটো দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে একটা মরা নেড়ি কুত্তার লাশ নিজের সঙ্গে থাকা ব্যাগে ভরে নিতে পারল সে। ওরা ডাক্তার হলে এই কাজে তাকে হয়তো একশ টাকার দুটো নোট খরচ করতে হতো।

যে পক্ষ কুকুরের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাদের ভরসা হলো জেলার রহমান সাহেব কুকুর চেনেন না। তাঁকে নেড়ি কুত্তার লাশ দেখিয়ে বলা হবে, এটাই ফক্স টেরিয়ার বা ফক্স টেরিয়ারের বংশধর।

মরা কুকুর তখনও পচতে শুরু করেনি, তা সত্ত্বেও নাকে রুমাল চেপে ধরে কুকুরটাকে দেখতে অফিস কামরা থেকে করিডরে বেরিয়ে এলেন তিনি। বিড়বিড় করে কি সব পড়ছেন, সম্ভবত দোয়া-দরুদই হবে, হয়তো নাপাক কুকুরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হওয়ায় আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নিচ্ছেন।

বস্তার মুখ খুলে নেড়ি কুত্তার লেজের দিকটা শুধু দেখাচ্ছে মোতালেব, বলল, 'এই হলো যমজদের একটা, স্যার। আশা করা যায় এদের উপদ্রব এখানেই শেষ হবে। দুটো প্রাণী এক রকম দেখতে হতে পারে, যতটুকু জানি আর কি, তিন বা আরও বেশি একই রকম হয় বলে শুনিনি।'

'তুমি জানো না। হয়। তিন বা তার চেয়ে বেশি ভাইবোন হব্ব একরকম দেখতে, এরকম দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি আছে। তবে সেটা মানুষের বেলায়। অন্য কোনো জীবের বেলাতেও হয় কিনা...

'তাহলে হয়, স্যার। মানুষ তো একটা প্রাণী, পশুরাও প্রাণী, কাজেই মানুষের যদি হয়, পশুদেরও হবে।'

'তুমি একটা মূর্খ। মানুষকে তুমি শুধু প্রাণী বললে, আর সব প্রাণীর সঙ্গে এক কাতারে ফেললে, তাকে ছোট করা হয়, অপমান করা হয়। মানুষ হলো সৃষ্টির সেরা জীব।'

'স্যার, আমি সত্যি আকাট মূর্খ। তাই অনুরোধ করছি, বেয়াদবি নেবেন না। তবে,' বলল মোতালেব, 'আমার মনে সন্দেহ জাগে।'

'তোমার মনে সন্দেহ জানে মানে? কি সন্দেহ জাগে?'

'মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, একথা বলে আমরা আসলে নিজেকে পিঠ চাপড়াচ্ছি না তো, স্যার? এটা তো স্বাভাবিক যুক্তি যে মহাশূন্যের গ্যালাক্সিগুলোয় যেখানে হাজার হাজার কোটি সূর্য আর গ্রহ গিজ গিজ করছে, সেখানে বুদ্ধিমান প্রাণী না থেকে পারে না। কোথাও যদি প্রাণী থাকে, থাকে বিবর্তন, অর্থাৎ তাকে যদি প্রয়োজনীয় সময় দেয়া হয়, আমাদের চেয়ে উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠতে বাধ্য।'

জেলার রহমান সাহেবকে হাসতে দেখা গেল। ‘উঠুক গড়ে নতুন সভ্যতা, তাতে কারও কোনো আপত্তি নেই। ওই সভ্যতার প্রাণীরা যে মানুষ নয়, আপনি তা জানছেন কিভাবে? আমি তো বলব তারাও আমাদের মতো মানুষ, অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব।’

‘আপনি কত জ্ঞানী মানুষ, আপনার সঙ্গে আমার তর্ক করা সাজে না, স্যার,’ বস্তার মুখ বন্ধ করে বিদায় নেয়ার জন্যে সিধে হলো মোতালেব। ‘দেখা যাক আরও একটা ছব্ব একই রকম কুকুর এসে পড়ে কিনা।’

‘যদি আসে, ওটাকেও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মেরে ফেলবেন আপনারা।’

‘জি, স্যার,’ বলে চলে এল মোতালেব।

দুদিন পর আমি, প্রধান গার্ড মোতালেব আর উদ্যম মিটিং করলাম। আমরা দুজন শ্রোতা, উদ্যম বক্তা। চারদিন কুকুরটাকে কাছ থেকে দেখার পর কি অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটা আমাদের জানাল সে। প্ল্যাস্টিকের রশি দিয়ে বানানো মুখ-বন্ধনী ব্যবহার করায় ঘেউ ঘেউ করতে পারছে না টাইগার। টাইগার হলো উদ্যমের দেয়া ফক্স টেরিয়ারের নাম। ডাকাডাকি করতে না পারায় অনেক গার্ড এবং কয়েদিরা এখন জানে না ওটাকে কে লুকিয়ে রেখেছে বা কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু ডাক ছাড়তে না পারলে কি হবে, গভীর রাতে যখন জেলখানার পাশের পাহাড়ি বনভূমি থেকে শিয়ালরা ডাকাডাকি করে, টাইগারকে ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। চেইনের সঙ্গে এমন ধস্তাধস্তি করে সে, গলার কলার ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হয়।

শিয়ালের ডাক মাঝে মধ্যে আমরা শুনি ঠিকই, কিন্তু তা নিয়ে এতদিন মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করিনি। আমাদের জেলখানা কাঠফাটা আকারে বিশাল, পূর্ব পাশে আছে পাহাড় আর জঙ্গল, এবং স্বভাবতই ওদিকে কিছু শিয়াল, বববিড়াল, বাঁদর, বুনো গুয়ার, বেজি ইত্যাদি থাকার কথা।

উদ্যমের কথা হলো, টাইগার বিনা কারণে কাঠফাটায় ঢোকেনি। আমাদের জেলখানার ভেতর শিয়ালের বংশবৃদ্ধি ঘটেছে, ফক্স টেরিয়ার এসেছে আর একটা বিহিত করতে। কাজেই সে যা করতে চায় তা তাকে করতে দিতে হবে। ফিসফাস আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হলো, সেদিন সন্ধ্যারাত্রেই তিনজন গার্ডকে নিয়ে রওনা হবে সে, সঙ্গে থাকবে টাইগার আর স্যার। আমাদের গন্তব্য হবে জেলখানার পূর্বদিকের জঙ্গল।

তবে সময়টা নানা কারণে পিছিয়ে দিতে হলো। সন্দের আগেই মোতালেব এসে খবর দিল, মিউনিসিপ্যালিটির ট্রাক থেকে কিনে আনা তিন নম্বর কুকুরের

লাশটাকে ফক্স টেরিয়ার বলে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন আফলাজুর রহমান। ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিকে টেরিয়ারের ফটো দেখেছেন তিনি, তার সঙ্গে মোতালেবের দেখানো কুত্তার কোনো খুঁজে পাননি তিনি।

মোতালেব তাঁকে বলেছে, ‘স্যার, আমাদের এখানে যে কুত্তাগুলোকে দেখা যাচ্ছে সেগুলো টেরিয়ার কিনা আমার জানা নেই। আমি স্যার কুত্তা বুঝি না। আপনি যদি এই লাশকে নেড়ি কুত্তার লাশ বলেন, তো তাই। যদি না বলেন, তো নাই।’

‘টেরিয়ার নয়, এটা পরিষ্কার,’ বলেছেন জেলার। ‘রাস্তার কুকুর। কিন্তু আসছে কোথেকে? এটাই আসল সমস্যা। যেভাবে হোক জানতে হবে, আসছে কোথেকে। আমার তো এরকম সন্দেহ হচ্ছে যে এর পেছনে গুট কোনো রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে।’

সন্ধ্যে সাতটার দিকে মোতালেব আমাদের জানাল, কজন নতুন গার্ড উদ্যমের ওপর কড়া নজর রাখছে। জানা কথা, সন্দেহ করা হচ্ছে তাকে, এবং তার ওপর নজর রাখার নির্দেশ এসেছে খোদ জেলারের তরফ থেকে।

উদ্যম বুদ্ধি দিল, রওনা হবার সময় বদলে রাত দশটা করি এসো।

‘কিন্তু দশটাতেই বা সেল থেকে আপনি বেরোবেন কিভাবে?’ জানতে চাইল মোতালেব। ‘আপনাকে না বললাম কজন গার্ড আপনার ওপর নজর রাখছে।’

‘আরে বাবা ওরা যাতে নজর রাখতে না পারে তার ব্যবস্থা করুন!’

মোতালেব বোকার মতো তাকিয়ে থাকল। ‘কি ব্যবস্থা করব?’

‘কে আপনাকে গার্ডদের লিডার বানিয়েছে বলুন তো? এত নগণ্য একটা সমস্যার সমাধান করতে পারছেন না? এক ঘণ্টা পর না খেতে ডাকবে সবাইকে? হাসপাতালের ডাক্তাররা তো আমাদের পক্ষে, তাই না? তাদের কারও কাছ থেকে ঘুমের ট্যাবলেট চেয়ে এনে ডালের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দিন ওদেরকে, ব্যস, মড়ার মতো পড়ে ঘুমাক সব কটা।’

রাত ন’টায় খবর পাওয়া গেল নতুন গার্ডরা যে যার সেলে নাকু ডেকে ঘুমাচ্ছে। এর এক ঘণ্টা পর তিনজন গার্ডকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল আমরা, সবার হাতে একটা করে শক্তিশালী টর্চ। অবশেষে তাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এটা বুঝতে পেরে টাইগারের ফুঁটি আর লক্ষ্যবিন্দু দেখে কে। গার্ড টাওয়ারের লোকজনকে আগেই সব জানানো হয়েছে, শিয়াল মারার ব্যাপারে তাদের উৎসাহও দেখার মতো। তার অবশ্য কারণ আছে। ওই জঙ্গলের ধারে গার্ডরা অনেকে মুরগি পালে, আর প্রতিরাতে শিয়ালরা ওই মুরগি চুরি করতে আসে—কখনও সফল হয়, কখনও ব্যর্থ।

আমাদের সঙ্গী গার্ডদের কাছে রাইফেল থাকলেও, শিয়াল মারার জন্যে গুলি করার অনুমতি দেয়া হয়নি তাদের। রাইফেল ছাড়াও সবার সঙ্গে বেয়নেট আছে, টাইগার যদি কোনো শিয়াল ধরতে পারে তাহলে সেটাকে বেয়নেট চার্জ করে মারা হবে।

জঙ্গলে ঢোকার পর একদম শান্ত হয়ে গেল টাইগার। যেন গর্তে থাকা শিয়ালদের বুঝতে দিতে চাইছে না যে সে এখানে এসেছে। ওদিকে, শিয়ালদের আচরণেও আশ্চর্য্য একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। রাত এগারোটা বাজতে না বাজতে তাদের হুকা হুয়া ডাক শুরু হয়ে যায়, সেটা ভেসে আসে জঙ্গলের চারদিক থেকে। কিন্তু আজ তারা সব কটা একদম বোবা হয়ে গেছে। শিয়ালরা সম্ভবত গন্ধ ঝুঁকে বুঝে ফেলেছে ফক্স টেরিয়ারের অশুভ আগমনের কথা।

গোটা জঙ্গলে থমথম করছে পরিবেশ।

আধ ঘণ্টা পর টাইগারের মধ্যে এই প্রথম অস্থিরতা দেখতে পেলাম আমরা। অনেক আগেই উদ্যম তার মুখবন্ধনী খুলে দিয়েছে, তারপরও এতক্ষণ কোনো শব্দ করেনি সে। রাত বারোটা এক মিনিটে প্রথম ডাক শোনা গেল তার। আমরা অনুভব করলাম সেই ডাক শুনে গোটা জঙ্গল সচকিত হয়ে উঠল। তবে কেউ এতটুকু শব্দ করছে না। শিয়ালরা তো নয়ই।

এতক্ষণ টাইগারকে পথ দেখিয়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল উদ্যম, দৃশ্যটা একদম উল্টে গেল, এখন উদ্যমকেই পথ দেখাচ্ছে টাইগার। দুজনের মাঝখানে টান টান হয়ে আছে লোহার চেইন, টেরিয়ার ছুটছে, তার পিছু নিয়ে ছুটছে উদ্যম, উদ্যমের পিছু নিয়ে ছুটছি আমরা সবাই।

তারপর হঠাৎ করেই প্রচণ্ড এক লাফ দিল টাইগার। উদ্যমের হাত থেকে ছুটে গেল চেইন, চোখের পলকে ঝোপের ভেতর হারিয়ে গেল আমাদের ফক্স টেরিয়ার।

ঝোপটা বেশ বড়। সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে আমরা চারপাশ থেকে ঘিরে ফেললাম, তারপর দুজন গার্ডকে বলা হলো ওটার ভেতরে ঢুকে দেখো কি করছে টাইগার।

ঝোপের ভেতর সাত কি আট মিনিট তল্লাশি চালিয়ে গার্ড দুজন বাইরে বেরিয়ে এসে রিপোর্ট করল, টাইগার ওখানে নেই।

আমরা হতভম্ব হয়ে পড়লাম। সবার চোখের সামনে ওই ঝোপের ভেতর ঢুকেছে কুকুরটা, তাহলে সেটা ওখানে না থাকে কিভাবে?

কি ঘটেছে বুঝতে না পেরে সবাই হতভম্ব হয়ে ছটফট করছি, এই সময় আমাদেরকে চমকে দিয়ে পাশের ঝোপ থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা



শিয়াল, বেরিয়েই খিঁচে ছুটল নাক বরাবর সামনে। এক মুহূর্ত পর ওই একই ঝোপ থেকে তীরবেগে বেরিয়ে এল টাইগার, শিয়ালটাকে ধাওয়া করছে।

বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠে আমরাও ওদের পিছু নিয়ে ছুটলাম। বুঝতে অসুবিধে হলো না, এতক্ষণ গর্তের ভেতর ছিল টাইগার, সেখান থেকে খেদিয়ে বের করে এনেছে শিয়ালটাকে।

এরপর আমাদের দেখার সুযোগ ঘটল শিকারি কুকুর কি কৌশলে তার শিকারকে কাবু করে। টেরিয়ারের গতি শিয়ালের চেয়ে কম তো নয়ই, বরং অনেক বেশি, অথচ টাইগারকে আমরা দেখলাম না শিয়ালকে পেছনে ফেলার চেষ্টা করছে। পাশ কাটিয়ে সামনে না গিয়ে শিয়ালের ঠিক পেছনে থাকছে টেরিয়ার, এবং সুযোগ মতো কখনও প্রতিপক্ষের লেজ বা কখনও তার পেছনের পা কামড়ে ধরছে। ফলে শিয়ালের ছোট্ট গতি হঠাৎ করে অনেক কমে যাচ্ছে। আর তখন আমাদের গার্ডরা শিয়ালটাকে বেয়োনেট চার্জ করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে।

সারা রাতে এই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগল। হঠাৎ করে একটা ঝোপে ঢুকে গায়েব হয়ে যাচ্ছে টাইগার, বেরিয়ে আসছে আরেক ঝোপ থেকে আরেকটা শিয়ালের পিছু নিয়ে।

ভোর চারটের দিকে হিসেব করে দেখা গেল বারোটা শিয়াল মেরেছি। এই অভিযানে আমরা কেউ তেমন পরিশ্রম করিনি, তারপরও সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। অথচ টাইগার ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিয়াল খেদালেও তার মধ্যে ক্লান্তির কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

একটু পরই জেলখানার মসজিদ থেকে আজান শুরু হলো। উদ্যমকে বললাম, ‘এবার ভোরের আলো ফুটবে, তার আগেই যে যার ঠিকানায় ফিরি চলো। জেলারের অনুগত পার্দের ঘুম ভেঙে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।’

ফক্স টেরিয়ারকে আবার মুখবন্ধনী পরানো হলো। ফেরার পথে উদ্যম বলল, ‘টাইগারকে আমি আর লুকিয়ে রাখতে পারব না, কারণ সবার আগে আমার সেলেই তল্লাশি চালানো হবে।’

‘তাহলে গার্ডদের কেউ রাখুক ওটাকে,’ বললাম আমি, ‘তারপর জানতে চাইলাম, ‘আমরা কি কাল রাতেও ওটাকে নিয়ে বেরোব?’

উদ্যমকে উৎসাহিত হতে দেখলাম না, সে বলল, ‘এটা নিয়ে আর বেশি বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না। কি ঘটছে জেলার মধ্যে জানেন না, এ আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই। হঠাৎ করে একটা তুলকালাম কাণ্ড বেঁধে যেতে পারে।’

‘এরপর তাহলে কি?’ জানতে চাইলাম আমি। ‘টাইগারকে নিয়ে কি করবে বলে ভাবছ?’

‘আমি মনে করি টাইগার এপিসোড এখানেই শেষ হোক,’ বলল উদ্যম। ‘সবচেয়ে সহজ উপায় হলো, আমরা যদি চাই যে ওটা বেঁচে থাকুক, জেলখানার বাইরে কোথাও ফেলে রেখে আসা— এত দূরে, পথ চিনে যাতে ফিরে আসতে না পারে।’

তখন বুঝিনি, পরে বুঝেছি, হঠাৎ কেন উদ্যম টাইগারকে বিদায় করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল। যাই হোক, তার কথামতো পরদিনই আমরা টাইগারকে অনেক দূরের একটা জায়গায় ফেলে রেখে আসার ব্যবস্থা করলাম।

এর কদিন পরই কাঠফাটা থেকে পালিয়ে গেল উদ্যম। অনেক চেষ্টা করেও পরে আর তাকে ধরা সম্ভব হয়নি, তাকে আর কোনো দিন ধরা যাবে বলেও আমি মনে করি না। সত্যি কথা বলতে কি, উদ্যম হাসান নামে আর কারও কোনো অস্তিত্বই নেই। কেন এ-কথা বলছি? সে আমাকে একবার বলেছিল, তার এক বন্ধু এবং কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী তার নতুন পরিচয়, নতুন পাসপোর্ট সহ যা যা লাগতে পারে সব কিছুর ব্যবস্থা করে রেখেছে—একবার শুধু বাইরে বেরোতে পারলে হয়, উদ্যম হাসান চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে। তারা এমনকি ইঞ্জিন লাগানো নৌকো করে আন্দামান কি মালয়েশিতেও পৌঁছে দিতে পারবে তাকে। তারপর একটা প্লেন ধরে পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় পৌঁছে যাওয়া সম্ভব।

উদ্যম হাসান দেশে নেই, তবে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে একজন লোক আছে, তার নাম আমি জানি না, তবে যদি কোনো দিন দেখি চিনতে পারব ঠিকই। সে সম্ভবত ছোট একটা হোটেল চালাচ্ছে।

যতটুকু জানি এবং আমার মনের কি ভাবনা, এখন আমি শুধু সেটুকুই বলতে পারি, তাই না?

এগারো.

ধাক্কাটা এমন জোরে লাগল, চেয়ারে বসা মৌলানা রহমান এত জোরে লাফ দিলেন যে মনে শঙ্কা জাগল ছাদ ফুঁড়ে না বেরিয়ে যান।

আমি খুব বিশ্বস্ত সূত্র থেকে এ-সব জানতে পেরেছি। বলাই বাহুল্য যে আমার সূত্রের নাম বাদল মিয়া; জুতো সেলাই থেকে চণ্ডিপাঠ সবই যাকে করতে

হয়। সেদিন প্রশাসনিক ভবনের মেঝেতে তরল জীবাণু নাশক ছিটাচ্ছিল সে। তার ভাষ্য অনুসারে কারও কথা শোনার জন্যে সেদিন তাকে কান দিয়ে কী হালের চারপাশ পালিশ করতে হয়নি, রেকর্ড অ্যান্ড ফাইলস সেকশন থেকে ওয়ার্ডেনের চিৎকার পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিল সে, তিনি যখন গার্ডদের নতুন চিফ পল্টন চাকলার মুণ্ডু চিবিয়ে খাচ্ছিলেন।

‘এ-কথা বলে কি বোঝাতে চান, আপনি সম্ভবত যে জেলখানার ভেতর নেই সে? কি বলছেন আসলে আপনি? বলছেন তাকে আপনি পাননি! ভালো চান তো পান তাকে! নিজের ভালো আপনাকেই চাইতে হবে! কারণ আমার তাকে দরকার! আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? তাকে আমার দরকার!’

কি যেন বলল পল্টন।

‘আপনার শিফটে ঘটেনি? এটা আপনি বলছেন। আমি যতটুকু বুঝতে পারছি, কেউ জানে না ব্যাপারটা কখন ঘটেছে। কিংবা কিভাবে ঘটেছে। কিংবা আদৌ তা ঘটেছে কিনা। এখন কান খুলে শুনুন আমি কি বলি। আজ বেলা তিনটের মধ্যে আমার অফিসে তাকে আমি দেখতে চাই। তা যদি দেখতে না পাই, কিছু মাথা অবশ্যই গড়াগড়ি খাবে। এটা আমার প্রতিশ্রুতি, এবং আমি সব সময় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি।’

পল্টনের মুখ থেকে আবার কিছু বেরোল, তাতে নিশ্চয়ই আরও খোঁচা লাগার উপাদান ছিল, কারণ ওয়ার্ডেন এবার তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।

‘না? তাহলে এটা দেখুন! এটা দেখুন! চিনতে পারছেন জিনিসটা? সেলব্লক পাঁচের টালি খাতা। প্রত্যেক কয়েদিকে উপস্থিত দেখানো হয়েছে এখানে! উদ্যমকে কাল রাত ন’টায় তালা দেয়া হয়েছে, আর তাই তার পক্ষে কোথাও বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব! একেবারেই অসম্ভব! এবার আপনি তাকে খুঁজে বের করুন!’

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যে ছ’টাতোও নিখোঁজ থাকল উদ্যম। মৌলানা রহমান নিজে ঝড় তুলে ছুটে এলেন সেলব্লক পাঁচে, ওখানে সারাটা দিন সবাইকে আটকে রাখা হয়েছিল। আমাদেরকে জেরা করা হয়েছিল কিনা? আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে কম করেও আট-দশবার করে জেরা করা হয়েছে, এবং যারা জেরা করেছে সেই সব গার্ডদের ঘাড়ে সারাক্ষণ গরম নিশ্বাস ফেলছিল ড্রাগন। উদ্যম সবাই একই কথা বলেছি; আমরা কিছু দেখিনি, কিছু শুনিনি। এবং আমরা যতদূর জানা আছে, সবাই আমরা সত্যি কথাই বলছিলাম। আমার অন্তত জগদীশ আছে যে আমি সত্যি কথা বলেছি। আমরা শুধু বলতে পারলাম যে তালা দেয়ার সময় উদ্যম তার সেলেই ছিল, সেলে ছিল এক ঘণ্টা পর আলো নেভানোর সময়ও।

চতুর একজন ধারণা দিল, উদ্যম নিজেকে তালার ফুটোর ভেতর পিচ্ছিল তরলের মতো ঢেলে দিয়েছিল। তাকে সঙ্গে সঙ্গে চারদিনের জন্যে সলিটারিতে পাঠিয়ে দেয়া হলো। ওদের মেজাজ একেবারে সপ্তমে চড়ে আছে।

কাজেই মৌলানা রহমান নিচে নেমে এলেন। আমাদের দিকে এমন কটমট করে তাকালেন, চোখ থেকে যেন আগুনের ফুলকি বেরোতে লাগল, তিনি যেন জানেন আমরা সবাই এটার সঙ্গে জড়িত।

উদ্যমের সেলে ঢুকলেন তিনি, চারদিকে তাকাচ্ছেন। উদ্যম যেভাবে রেখে গেছে সেভাবেই পড়ে আছে সেলটা, বিছানার চাদরে ভাঁজ পড়েনি দেখে বোঝা যায় ওখানে শোয়ানি সে। জানালার গোবরাটে কয়েক সারি পালিশ করা পাথর রয়েছে, তবে সবগুলো নয়। যেগুলো তার বেশি ভালো লাগত বেছে বেছে শুধু সেগুলো সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।

‘পাথর,’ হিসহিস করে উঠলেন আফজালুর রহমান, হাত ঝাপটা দিয়ে গোবরাট থেকে ফেলে দিলেন সব। পল্টন, যার ওভারটাইম চারঘণ্টা ছাড়িয়ে গেছে, চোখ-মুখ কুঁচকে শিউরে উঠল, তবে কিছু বলল না।

এবার রহমান সাহেবের চোখ পড়ল প্রিন্সেস ডায়ানার ওপর, উদ্যমকে সাপ্লাই দেয়া আমার সর্বশেষ পোস্টার ওটা। প্রিন্সেস সাফারি সুট পরে আছেন, মুখে লাজুক হাসি, চোখে বিষাদের ছায়া। রহমান সাহেব এমন আগুন ঝরা দৃষ্টিতে পোস্টারের দিকে তাকিয়ে আছেন, আমার মনে পড়ে গেল ওটা সম্পর্কে উদ্যম একবার কি মন্তব্য করেছিল—তার ইচ্ছে হয় পা বাড়িয়ে পোস্টারের ভেতর ঢুকে পড়ে, ডায়ানার সঙ্গে থাকে ওখানে।

একেবারে বাস্তব অর্থে ঠিক তাই করেছে উদ্যম, এবং একজন মৌলানা রহমান আর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সেটা আবিষ্কার করতে যাচ্ছেন।

‘নোংরা জিনিস!’ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললেন তিনি, তারপর দেয়ালের গায়ে সাঁটা পোস্টারটা এক টানে ছিঁড়ে ফেললেন।

আরে, কি আশ্চর্য! ওখানে আরেকটা পোস্টার দেখা যাচ্ছে। ওটা মধুবালার পোস্টার, উদ্যমকে দেয়া আমার প্রথম পোস্টার। ‘নোংরা মানুষ!’ হিস হিস করে বললেন রহমান সাহেব. তারপর টান দিয়ে মধুবালাকেও ফাট ফাট করে ছিঁড়ে ফেললেন।

আর তাতেই পেছনের নিরেট কংক্রিটের দেয়ালে বিরাট হাঁ করে থাকা গর্তটা বেরিয়ে পড়ল।

সবুজ পল্টন ভেতরে ঢুকবে না।

মৌলানা রহমান তাকে হুকুম করলেন—আল্লাহ্, জেলখানার প্রতিটি কোন থেকে শোনা গেল তার কান ফাটানো চিৎকার। এবং পল্টন কোনও সময় নিল না, সঙ্গে সঙ্গে বলে দিল এটা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

‘এই বেয়াদবির জন্যে আমি আপনার চাকরি খাবো!’ গর্জে উঠলেন ওয়ার্ডেন। তাঁর মাথাটা মনে হলো পুরোটা গেছে। কপালের চামড়ায় ফুলে ওঠা দুটো শিরা দপ দপ করতে দেখছি আমরা। ‘ভাববেন না এটা আমার মিথ্যে হুমকি...এটা আমি করেই ছাড়ব! শুধু তাই নয়, আমি এও দেখব কোনো জেলখানায় আপনার যাতে চাকরি না হয়!

নিজের পিস্তলটা নীরবে মৌলানার দিকে ধরল পল্টন, মুঠোর ভেতর মাজল। সে আসলে শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, আর কোনো ধকল সহ্য করার মতো অবস্থায় নেই।

আকাশ থেকে আলোর রেশ তখন হারিয়ে যেতে বসেছে, ওখানে দাঁড়িয়ে আটাশজন গার্ড মৌলানা রহমানের তর্জন-গর্জন আর লাফ-ঝাঁপ অপলক চোখে দেখছে আর গম্ভীর মুখে শুনছে। এবং খোদার কসম বলছি, আমার পরিষ্কার মনে হলো কোথেকে যেন উদ্যমের হাসির শব্দ ভেসে আসতে শুনছি আমি।

অবশেষে পাটখড়ির মতো রোগা এক লোককে ওই গর্তের ভেতর ঢুকতে রাজি করলেন মৌলানা রহমান, তার নাম মোজু মুন্সি। কাঠফাটায় বুদ্ধিমান বলে তার কোনো পরিচিতি নেই। তার হয়তো ধারণা ছিল কাজটা করলে ভালো কিছু পুরস্কার পাওয়া যাবে। তবে মৌলানার ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে এই কাজের জন্যে শেষ পর্যন্ত তিনি উদ্যমের মতো একই রকম লম্বা আর রোগা একজনকে খুঁজে পেয়েছেন। গার্ডদের কাউকে পাঠালে নির্ঘাৎ ভেতরে আটকে যেত সে। এবং তারপর হয়তো তাকে ওখানেই থেকে যেতে হতো।

এক প্রস্থ নাইলন ফিলামেন্ট রশি নিয়ে ভেতরে ঢুকল মোজু মুন্সি। ওই রশি তার কোমরে পেঁচানো হয়েছে। এক হাতে টর্চ। ইতিমধ্যে পল্টন, যে দায়িত্ব ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত আপাতত বাতিল করেছে, এবং সেই একমাত্র ব্যক্তি যার কিনা চিন্তা-ভাবনার মধ্যে যুক্তি আর স্বচ্ছতা দেখা যাচ্ছে, কোথেকে কে জানে কিছু ব্লুপ্রিন্ট যোগাড় করে এনেছে। আমি ভালো করে জেনি ওগুলোয় কি দেখতে পাবে সে—একটা পাঁচিল, তারপর আরেকটা পাঁচিল, পাঁচিলের পর পাঁচিল, এবং শুধু পাঁচিল আর পাঁচিল—মস্ত একটা স্যান্ডউইচের মতো। এক জোড়া পাঁচিলের

মাঝখানে হয়তো আধ হাত ফাঁক। সব মিলিয়ে পাঁচিলের ওই সমষ্টি দশ ফুট পুরু।

গর্তের ভেতর থেকে মোজু মুন্সির গলা ভেসে এল। ‘স্যার, এখানে খুব খারাপ একটা গন্ধ পাচ্ছি,’ অভিযোগ করল সে।

‘গ্রাহ্য করো না! এগোতে থাকো।’

মুন্সির পায়ের নিচের অংশ আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেল।

তারপর আবার অভিযোগ করল সে, এবার প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা। ‘স্যার, এই দুর্গন্ধ সহ্য করার মতো নয়!’

‘বললাম না, গ্রাহ্য করো না!’ চৈচিয়ে উঠলেন ওয়ার্ডেন।

মুন্সি বলল, ‘একদম শু, স্যার। আমাকে গ্রাহ্য না করতে বলছেন, আপনি কি গ্রাহ্য না করে পারবেন? ও আমার আল্লাহ, এখান থেকে বের করো আমাকে! ও আমার আল্লাহ...’ তারপর আমরা পরিষ্কার শুনতে পেলাম মোজু মুন্সি তার শেষ দু’প্রস্থ ভরপেট আহা হারিয়ে ফেলছে।

ব্যস, আমার ওটাই দরকার ছিল। বিশ্বাস করুন, আমি নিজের কোনো সাহায্যে এলাম না। সারাটা দিন-ধ্যাত্তারিকা, গত ত্রিশটা বছর –সব একসঙ্গে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর আমি হাসতে শুরু করলাম, সে এমন বেদম এক হাসি যে আমাকে পাকা বাড়ির মতো ফাটিয়ে দিতে পারে, সে এমন আশ্চর্য এক হাসি যে যখন মুক্ত মানুষ ছিলাম তখন থেকে একবারও আমি শুনতে পাইনি, এমন এক ধরনের প্রাণসমৃদ্ধ হাসি যে ধূসর পাঁচিলের ভেতর কখনও হাসতে পারব বলে আমি আশা করিনি। আর, কিভাবে ব্যাখ্যা করব কি ভীষণ মজাই না লাগল আমার!

‘ওই লোককে ওখান থেকে বের করো!’ চৈচাচ্ছেন ওয়ার্ডেন। আর আমি এত জোরে হাসছি যে বুঝতে পারলাম না তাঁর চিৎকার আমাকে লক্ষ্য করে, নাকি মোজু মুন্সিকে লক্ষ্য করে। আমি যেমন হাসছিলাম তেমনি হাসছি, চাপড় মারছি উরুতে, হাত দিয়ে পেট চেপে ধরেছি। খোদার কসম বলছি জীবনেও আমি থামতে পারতাম না, মৌলানা সাহেব গুলি করে আমার খুলি উড়িয়ে দেয়ার হুমকি যদি না দিতেন।

‘ওকে বের করো!’

কপাল। যেতে হলো আমাকে।

বারো.

যেতে হলো সোজা সলিটারিতে, এবং ওখানে আমাকে একটানা পনেরো দিন থাকতে হলো। অনেক লম্বা শান্তি। তবে মন চাইলেই আমি অনুজ্জ্বল মোজু মুন্সির করুণ বিলাপ স্মরণ করি, বলছে দুনিয়ার সবচেয়ে নোংরা বস্তু তার শরীরে মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে, গর্ত থেকে বেরোতে পারলে ওয়ার্ডেন স্যারকে জড়িয়ে ধরবে সে; তারপর কল্লনা করি উদ্যম হাসান ইঞ্জিন লাগানো নৌকায় চড়ে আনোয়ারা থেকে রওনা হচ্ছে, পরে আছে ভারি সুন্দর সেলাই করা কালো সুট, এবং এই দৃশ্য আমাকে একা একা হাসতে বাধ্য করে। বলতে পারেন প্রায় নিজের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে ওই পনেরো দিন সলিটারিতে এটাই করেছি আমি। এর কারণ সম্ভবত আমার অর্ধেক উদ্যম হাসানের সঙ্গে রয়েছে; উদ্যম হাসান, যাকে দুর্গন্ধময় বর্জের ভেতর হাঁটতে হয়েছে, অথচ তা থেকে অপরপ্রাপ্তে উঠে এসেছে পরিচ্ছন্ন হয়ে; উদ্যম হাসান, যাচ্ছে মালয়েশিয়া হয়ে বালি দ্বীপের দিকে।

বাকিটুকু আমি সেদিন রাতে অন্তত বারোটা আলাদা আলাদা উৎস থেকে শুনেছিলাম। যদিও, খুব বেশি কিছু না কিন্তু। মোজু মুন্সি সম্ভবত তার লাক্স আর ডিনার খোয়াবার পর, মৌলানা পুরস্কার দেবেন ঘোষণা করায়, নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে, কারণ সে বুঝতে পারে তার আসলে আর খুব বেশি কিছু হারাবার নেই, কাজেই আবার এগোতে শুরু করল সে। সেলব্লক পাঁচিলের ভেতর আর বাইরের অংশের মাঝখানে যে পাইপ-শাফট আছে সেটা ভেঙে পড়ার কোনো আশঙ্কা ছিল না, ওই শাফটের ভেতরটা এত সরু যে মুন্সি নিজেকে ওখানে গুঁজে দিয়ে এগোতে চেষ্টা করল। পরে তার বন্ধুদের বলেছে মুন্সি, মাত্র অর্ধেক শ্বাস নিতে পারছিল সে, এবং বুঝতে পারছিল এখানে তার জ্যান্ত কবর হয়ে যেতে পারে। শাফটের তলায় পাওয়া গেল মাস্টার সুইয়ার-পাইপ, যে পাইপের ভেতর দিয়ে সেলব্লক পাঁচের চোদ্দোটা টয়লেটের মল নামে। ওটা চীনামাটির পাইপ, ত্রিশ বছর আগে বসানো হয়েছে। ওখানে ভাঙা পাওয়া গেল পাইপ, ভেতর দিকে পাইপের টুকরো ছুঁতে হয়েছে, আর তাতে বাধা সৃষ্টি হয়েছে তরল প্রবাহে। আর ওই ভাঙা পাইপের পাশেই উদ্যম হাসানের রক হ্যামারটা পড়ে থাকতে দেখল মোজু মুন্সি।

উদ্যম মুক্তি পেয়েছে, তবে সেটা অর্জন করা সহজ ছিল না। যে শাফটের ভেতর দিয়ে নিচে নেমেছে মুন্সি, পাইপটা এমনকি তার চেয়েও সরু। এত সরু, রোগা কাঠ মুন্সিকে ভেতরে নিচ্ছে না। সে যখন ভেতরে ঢুকতে পারল না, জানা কথা আর কেউও পারবে না। ওখানকার পরিস্থিতিকে আমার বিবেচনায় প্রায় অকথ্যই বলতে হবে। গর্ত আর রক হ্যামারটা পরীক্ষা করছে মুন্সি, পাইপ থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা ইঁদুর। সে কসম খেয়ে বলেছে, ইঁদুরটা কুকুরছানার চেয়ে ছোট ছিল না। লাঠি গাঁথা একটা বাঁদরের মতো উদ্যমের সেলে ফেরত চলে আসে সে।

মোজা মুন্সি যা পারেনি, উদ্যম হাসান তা পেরেছে, ওই পাইপের ভেতর ঢুকেছে সে। তার হয়তো জানা ছিল পাইপের তরল বর্জ্য জেলখানা থেকে পাঁচশ গজ পশ্চিমে জলার মধ্যে গিয়ে পড়ে। আমার ধারণা এটা সে অবশ্যই জানত। জেলখানার ব্রুথ্রিট মোটেও সোনার হরিণ নয়, উদ্যম নিশ্চয়ই চোখ বুলিয়েছিল, আর তখনই পালাবার একটা পথ তার চোখে পড়ে গেছে। নিষ্ঠা আছে তার, কষ্টসহিষ্ণু, ধৈর্যশীল, গুছানো স্বভাব। তার জানা ছিল, ওই পাইপ বসানোর পর কখনো মেরামত বা বদলানো হয়নি।

পাঁচশ গজ। প্রায় পাঁচটা ফুটবল মাঠের সমান দূরত্ব। এক মাইলের কিছু কম। সাপের মতো ক্রল করে এই দূরত্ব পার হয়েছে সে, হাতে হয়তো একটা পেন্সিল টর্চ ছিল, কিংবা হয়তো দু'একটা দেশলাই ছাড়া আর কিছু ছিল না। আমি কল্পনা করতে চাই না, কল্পনা করতে পারি না কি রকম দুর্গন্ধের ভেতর দিয়ে, কি রকম কাদাতে নোংরার ভেতর দিয়ে এগোতে হয়েছে তাকে। হতে পারে ইঁদুরের দল তার সামনে পড়িমরি করে ছড়িয়ে পড়েছে, আবার এমনও হতে পারে যে অন্ধকারে ওগুলো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পাইপ যেখানে বাঁক নিয়েছে, জোড়া লেগেছে, ওপরে উঠেছে বা নিচে নেমেছে, নিশ্চয়ই ওই সব জায়গা পার হতে কাল ঘাম ছুটে গেছে তার।

পাইপের শেষ মাথায়, কাদার ওপর, এক সেট পায়ের ছাপ দেখতে পেল ওরা, দূষিত পানিতে ডোবা জলার কিনারায়। ওখান থেকে দু'মাইল দূরে সার্চ পার্টি তার প্রিজেন ইউনিফর্ম পেলো—একদিন পর।

খবরের কাগজে খুব বড় করে ছাপা হলো এই জেল জেঁও পালানোর ঘটনা। তবে জেলখানার চতুর্দিকে পনেরো মাইল পর্যন্ত কেউ গাড়ি বা কাপড় চুরির ঘটনা রিপোর্ট করেনি, কিংবা চাঁদের আলোয় উল্লস কাউকে দেখা গেছে বলে কিছু রটেওনি। ওদিকে অনেক খামার আছে, কিন্তু কোনো কুকুর সেভাবে ডাকেনি। পাইপ থেকে বেরিয়ে খানিকটা ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে গেছে সে।

তবে আমি বাজি ধরে বলতে পারি সে গায়েব হয়েছে আনোয়ারার দিকে।



ওই স্মরণীয় ঘটনার তিনমাস পর মৌলানা রহমান রিজাইন করলেন। কথাটা বলতে অপার আনন্দ পাচ্ছি আমি যে উদ্যম এই ব্যক্তিকে একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। তাঁর হাঁটার মধ্যে যে ঝাঁকি ছিল সেটা আর কখনও দেখা যায়নি। মাথাটা এমন নিচু করে বিদায় নিলেন তিনি, যেন বেধড়ক মার খাওয়া একজন কয়েদি প্যারাসিটামল ট্যাবলেট আনার জন্যে হাসপাতালে যাচ্ছে। তার জায়গায় দায়িত্ব পেল সবুজ পল্টন, সেটা নিশ্চয়ই মৌলানা রহমানের দৃষ্টিতে অত্যন্ত নির্দয় একটা ব্যাপার বলে মনে হলো। আমার জানামতে একটা মাদ্রাসায় চাকরি নিয়ে ছাত্র পেটাচ্ছেন তিনি, এবং নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন উদ্যম হাসান কিভাবে তাকে ল্যাং মারতে সাফল হলো।

তিনি জিজ্ঞেস করলে উত্তরটা দিতে পারতাম আমি: ‘ব্যাপারটা হলো সহজ-সরল ধরন। কারও ভেতর জিনিসটা আছে, মৌলানা সাহেব। কারও ভেতর নেই, এবং কখনও থাকবেও না।’

এটুকুই আমি জানি। এবার বলব আমি কি মনে করি। খুঁটিনাটি অনেক বিষয়ে আমার কিছু ভুল-ভাল হতে পারে। তবে আমি আমার চেইন আর ঘড়ি বাজি রেখে বলতে পারি যে সাধারণ ছক আমি তৈরি করেছি সেটা নিখুঁত হবারই কথা। কারণ, উদ্যম যে প্রকৃতির মানুষ, আমি তাকে যেভাবে চিনি, তার পক্ষে এক কি দু’ভাবে এই কাজ করা সম্ভব ছিল। ব্যাপারটা নিয়ে আমি যখন চিন্তা করি, প্রতিবার সুবাস চাকমার কথা মনে পড়ে যায়, সেই আধপাগলা আদিবাসী। ‘খুব ভালো লোক সে,’ উদ্যমের সঙ্গে ছয় কি আটমাস একই সেলে থাকার পর চলে যাবার সময় বলেছিল সে। ‘ওখান থেকে সরে আসায় নিজের ওপর আমি খুশি। ওই সেলে খারাপ ধরনের খরা আছে। সারাক্ষণ ঠাণ্ডা। সে কাউকে নিজের জিনিস ছুঁতে দেয় না। সেটা ঠিক আছে। চমৎকার মানুষ, কক্ষনো মজা করতে দেখিনি। তবে খুব বড় খরা।’

পাগলা সুবাস। আমাদের সবার চেয়ে বেশি জানত সে, এবং জেনেছে সবার আগেও। তাকে ভাগিয়ে দিয়ে সেল পুরোটা একার দখলে ফিরে গেলে দীর্ঘ আট মাস সময় লেগেছে উদ্যমের। মৌলানা রহমান আসার পর ওই আটমাস সুভাষ যদি তার সঙ্গে বসবাস না করত, আমার হিসেব বলে আরও অনেক আগে নিজেকে মুক্ত করতে পারত আমাদের উদ্যমী উদ্যম।

এখন আমার বিশ্বাস ব্যাপারটা রক হ্যামার দিয়ে শুরু হয়নি, শুরু হয়েছিল মধুবালায় ছবি দিয়ে। আমি আপনাকে বলেছি ছবিটা চাওয়ার সময় কেমন

নার্ভাস দেখাচ্ছিল তাকে। নার্ভাস এবং উত্তেজিত। ওই সময় তাকে আমার শুধু বিব্রত বলে মনে হয়েছিল। উদ্যম সেরকম একজন মানুষ ছিলও বটে, তার যদি কোনো ফ্যান্টাসি নারী দরকার হয়, সেটা কাউকে জানতে দিতে চাইবে না সে। তবে এখন আমি মনে করি তাকে তখন বুঝতে ভুল হয়েছিল আমার। এখন বুঝি তার তখনকার উত্তেজনার কারণটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তবে শুধু পোস্টার নয়, আরও দুটো জিনিস সাহায্য করেছিল উদ্যমকে। একটা হলো তার ভাগ্য, আরেকটা হলো ব্রিটিশ সরকার তরণ বেকারদের কর্মসংস্থান কর্মসূচির অধীনে জাহাজে করে যে সিমেন্ট পাঠিয়েছিল সেটা।

কাঠফাটা তৈরি করা হয়েছিল ১৯৩৪-১৯৩৭ সালে। এখন ব্যাপার হলো অনেকেরই জানা নেই যে পাউরুটি বানানো যেমন সূক্ষ্ম একটা কাজ, কংক্রিট মিশ্র করাও সেরকম সূক্ষ্ম একটা কাজ। এখানে এটা পরিষ্কার হওয়া দরকার যে ১৮৭০ সালের আগে আধুনিক সিমেন্ট তৈরি করা সম্ভব হয়নি, আর তাই আধুনিক কংক্রিটও পাওয়া যায়নি নতুন শতাব্দী শুরু না হওয়া পর্যন্ত। আপনি বেশি বালি মিশিয়ে ফেলতে পারেন, কিংবা কম মিশিয়ে ফেলতে পারেন; পানি বেশি হয়ে যেতে পারে, কিংবা কম হয়ে যেতে পারে। ১৯৩৪ সালে পদ্ধতিটা এখনকার মতো সফিসটিকেটেড ছিল না।

সেলব্লক পাঁচের পাঁচিল যথেষ্ট নিরেট ছিল, তবে ওগুলো কখনও শুকনো ছিল না, ছিল না উষ্ণ। বরং সব সময় স্যাঁতসেঁতে থাকত। দীর্ঘ একটা মেয়াদে ভেজা ভেজা ভাব ঘামে রূপান্তরিত হতো, এমন কি ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরতও। জায়গামতো উদয় হবার নিজস্ব একটা ধরন আছে ফাটলের, কোনোটা এক ইঞ্চি গভীর, এবং নিয়মিত কংক্রিট খেতে থাকে।

তারপর একসময় সেলব্লক পাঁচে এল উদ্যম হাসান। ভার্টিসি থেকে বিজনেস ম্যানেজমেন্টে অনার্স করেছে সে। তবে দুই কি তিনটে জিওলজির কোর্সও করা ছিল তার। জিওলজি তার প্রধান হবি হয়ে ওঠে। জিওলজি তার নিষ্ঠাবান আর অধ্যবসায়ী প্রকৃতির ওপর আবেদন তৈরি করেছিল বলে মনে হয়। এখানে এটা দশ হাজার বছর আগেকার বরফ যুগের অবশিষ্ট। এখানে ওই পাহাড়ি এলাকা দশ লাখ বছর ধরে তৈরি হচ্ছে। পৃথিবীর ত্বকের গভীর প্রদেশে টেকটনিক প্লেট পরস্পরের সঙ্গে ঘষা খাচ্ছে হাজার হাজার বছর ধরে। প্রেশার। উদ্যম আমাকে একবার বলেছিল জিওলজির সবটাই প্রেশার নিয়ে পড়াশোনা।

এবং অবশ্যই সময়।

ওই পাঁচিলগুলো পাঠ করার সময় পেয়েছিলাম উদ্যম। প্রচুর সময়। সেলের দরজা যখন দড়াম করে বন্ধ হলো আর নিভে গেল সব আলো, তারপর আর

কোনো দিকে তাকানোর দরকার নেই। শুরু করো খোঁড়া। যত ধীরেই খুঁড়ুন, প্রতিদিন খুঁড়ছেন না? তাহলে? একদিন ওটা আপনাকে নেবে। প্রথমে হয়তো একটু, কিন্তু তারপর সবটুকু।

প্রথমবার যারা সাজার মেয়াদ খাটতে আসে জেলখানার বন্দি জীবনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে তাদের খুব কষ্ট হয়। তাদের মনে জন্ম নেয় গার্ড-জুর। মাঝেমধ্যে তাদেরকে বয়ে নিয়ে যেতে হয় হাসপাতালে, বার কয়েক ঘুমের ওষুধ খাওয়ালে আস্তে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসে। এটা কোনো অস্বাভাবিক দৃশ্য নয় যে আমাদের ছোট্ট সুখী পরিবারের নতুন একজন সদস্য লোহার শিকে ঘুসি মারতে থাকে আর গলা ফাটায়: ‘এখান থেকে বের করো আমাকে!’ খুব বেশিক্ষণ চেষ্টাতে হয় না, সেলব্লক জুড়ে কোরাস শুরু হয়ে যায়: ‘তাজা মাছ আইছে রে বাই, তাজা মাছ আইছে, পানিরে ঘুলা বানায় ডাঙ্গায় উইঠঠা কানছে! হালার পুত ঘুঘু দেখছে, অহন ফাঁদও দেখতাছে!’

তিন যুগেরও বেশি দিন আগে উদ্যম যখন প্রথমবার এসেছিল, কেউ তাকে ভয়ে সিটকে থাকতে দেখেনি, তবে তার মানে এই নয় যে নতুনরা যে-সব সমস্যার মুখোমুখি হয় তাকে তা হতে হয়নি। সে হয়তো পাগল হওয়ার কাছাকাছি পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, অনেকেই যায়, আবার কেউ হয়তো হাসতে হাসতে বদ্ধ উন্মাদে পরিণত হয়। চোখের পলকে পুরনো জীবন হারিয়ে যায়, সামনে বিস্তৃত হয়ে আছে দুঃস্বপ্ন, দীর্ঘ নরকবাস।

কাজেই আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করছি, কি করল সে? সে তার অস্থির মনটাকে কিছু একটা ধরিয়ে দিয়ে ব্যস্ত রাখার জন্যে মরিয়া হয়ে তল্লাশি চালাতে শুরু করল। হ্যাঁ, জানা কথা, নিজেকে আপনি অনেক ভাবে আরেক দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারেন, এমন কি জেলখানাতেও। মন সরানোর প্রশ্ন যখন আসে, মানুষের মাথা অসংখ্য টার্গেট নিয়ে হাজির হয় আপনার সামনে। আমি আপনাকে একজন ভাস্কর এবং তাঁর খোদাই করা তিন বয়সে যিশুর কথা মনে করিয়ে দিছি। এমন অনেক মুদ্রা সংগ্রাহক আছে যারা সব সময় চোরাদের কাছে মুদ্রা খোঁজাচ্ছে।

উদ্যমকে আগ্রহী করে তুলেছিল পাথর। আর তার সেলের দেয়াল। ওই দেয়াল যে স্যাতসেঁতে, সেটা নিশ্চয় শুরু থেকেই খেয়াল করে থাকবে উদ্যম। জাহাজ ভর্তি যতই তোমার দুর্ভাগ্য থাকুক, সব ভুলে গিয়ে অসাধ্যসাধনে লেগে পড়ো বাপধন, এই কংক্রিটে চোখ দাও।

এত পুরু দেয়ালে অত বড় গর্ত তৈরি করল, পাথর আর ধুলো গেল কই? ইউনিফর্মে পকেট না থাকলে কি হবে, উদ্যমকে আমি আস্তিনের ভাঁজে পাথর রাখতে দেখেছি। ওই আস্তিনে করেই ধুলো আর পাথরের টুকরো গুলো প্রতিদিন

উঠানে নিয়ে আসত সে, তারপর সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে উঠানের নুড়ি আর ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলত।

আমার ধারণা প্রথমে পালাবার কথা চিন্তা করেনি সে। এটাকে সম্ভবত একটা খেলা হিসেবে নিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে তার চোখ খুলতে শুরু করে। দেয়ালের অবস্থা আর ব্রুপ্রিন্ট দেখে দৃঢ় একটা প্রত্যয় জন্মায় মনে, এটা অসম্ভব নয়, এটা পারা যাবে।

তবে যেটাকে আমরা ভাগ্য বলি, বায়বীয় একটা ব্যাপার, সব কৃতিত্ব ওটাকে দেয়া চলে না। তার টাকা ছিল, এবং সবাই জানে টাকার অঙ্ক ভালো হলে যেকোনো গার্ড ওর পরিশ্রম কমাবার জন্যে খাটতে রাজি হবে। রোজ তার সেলে সময় দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই, সপ্তায় দু'চার রাতও যথেষ্ট।

উদ্যম যে আদর্শ কয়েদি ছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তার অনেক প্রশংসার একটা হলো, সবার সেলে নির্দিষ্ট সময় পর পর তল্লাশি চালানো হয়েছে, শুধু তারটা বাদে।

কি, আপনি প্রশ্ন তুলছেন, সে কি পালাতে পেরেছে? বলছেন জেল থেকে বেরোল, ঠিক আছে, কিন্তু তারপর কি হলো? কি ঘটল, জলায় বেরোবার পর, সারা গায়ে আর কাপড়ে মল মাখামাখি অবস্থায়?

এই দৃশ্যের বর্ণনা দেয়ার ক্ষমতা সত্যি আমার নেই, কারণ প্রায় সমস্ত অর্থে উদ্যম হাসান কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠান। জেল থেকে বেরোবার আগেও তাই ছিল, বেরোবার পরও তাই থাকার কথা, ধারণা করি আরও বহু বছর তাই থাকবে।

তবে এই একটা কথা আপনাকে আমি জানাব। উদ্যম জেল ভেঙে পালাবার তিন মাস পর, ১৫ সেপ্টেম্বরে, আমি একটা পোস্টকার্ড পেয়েছি। সেটা পাঠানো হয়েছে মালয়েশিয়ার ছোট একটা শহর কুয়ালা থেকে। কার্ডের যেখানে মেসেজ লেখা হয়, সেটা একদম ফাঁকা। তবে আমি ধরতে পেরেছি। আমি জানি। আমি যেমন জানি যে আমরা সবাই একদিন মারা যাব, এও তেমনি পরিষ্কার জানি যে ওই কার্ড আমাকে উদ্যম পাঠিয়েছে। আমাকে বলতে চেয়েছে, নিরাপদে আছে সে, আছে বহাল তবিরতে।

তো এই হলো আমার কাহিনি। সবটা লিখে ফেলতে কিছু ব্রেক সময় লাগবে আমার কোনো ধারণা ছিল না, ধারণা ছিল না এটা আসলে কত বড় হতে যাচ্ছে। ওই পোস্টকার্ড পাবার পর থেকে লিখতে শুরু করি আমি। এটা লিখতে তিনটে পেন্সিল লেগেছে আমার, লেগেছে একগাদা কাগজ। আমি আমার পাণ্ডুলিপি খুব সাবধানে লুকিয়ে রেখেছি, কেউ খুঁজে পাবে না।

লিখতে গিয়ে আমি আমার স্মৃতিকে খোঁচা মেরে বসেছিলাম, আমার ধারণাই ছিল না যে এত কিছু হুড়মুড় করে সব আবার মনে পড়ে যাবে। নিজের সম্পর্কে লিখতে যাওয়া আসলে অনেকটা এরকম: নদীর স্বচ্ছ পানিতে একটা ডাল ডুবিয়ে কাদাময় তলাটাকে এলোমেলো করা।

‘না, কই, তুমি তো বাপু নিজের কথা লিখছিলে না, লিখছিলে উদ্যম হাসানের কথা,’ আপনাকে আমি বলতে গুনলাম। ‘নিজের গল্পে তুমি একটা ছোট চরিত্র।’

কি জানেন, আপনার এই কথাটা একদমই সত্যি নয়। এই গল্প আমার গল্প, এবং আমাকে নিয়েই লেখা, এর প্রতিটি অক্ষর আমার প্রতিনিধিত্ব করছে। উদ্যম ছিল আমার একটা অংশ, যে অংশটাকে ওরা কখনোই তালা দিয়ে রাখতে পারেনি; আমার একটা অংশ, এবং সেটা আবার আমার সঙ্গে এক হবে অবশেষে কাঠফাটার গেট খুলে গেলে আমি যখন মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিতে পারব। আমার পরনে থাকবে ছেঁড়া প্যান্ট-শার্ট, পালিশ না করা জুতো, পকেটে থাকবে বিশ কি পঞ্চাশটা টাকা। আমার অস্তিত্বের এই অংশটা যতই মলিন আর নিঃশ্ব হোক, যতই বৃদ্ধ আর অক্ষম হোক, আরেক অংশের সঙ্গে অবশ্যই এক হতে যাচ্ছে।

এই গল্প বলে আমি সন্তুষ্ট, যদিও এর যেন কোনো উপসংহার দেয়া গেল না। পড়ে শেষ করেছেন বলে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। লেখা শেষ হবার পর নিজেকে আরও বুড়ো এবং খানিকটা বিষণ্ণ মনে হচ্ছে। এবং, উদ্যকে বলছি, তুমি যদি সত্যি ওখানে থাকো, আমি জানি তাই আছ তুমি, সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে যে তারাটা আকাশে জ্বলজ্বল করে আমার হয়ে ওটার দিকে তাকাও একবার তুমি, স্পর্শ করো বালি, পানি কেটে এগোও, এবং অনুভব করো মুক্তি আর স্বাধীনতা।

## অবশেষ

ভাবিনি আবার আমাকে লিখতে বসতে হবে। বেশি না, আর মাত্র ক’পাতা নেব। আগের মতো এখন আর আমি কাগজে পেন্সিল ঘষছি না। একটা ট্যাবলেট কিনেছি, নিজের ঘরে চেয়ারে বসে কম্পোজ করছি।

আমার জীবনের কি পরিণতি হলো? কেন, আপনি আন্দাজ করতে পারছেন না? না, আমারই ভুল হচ্ছে, আপনার আসলে আন্দাজ করতে পারার কথা নয়।

আমি বিশেষ বিবেচনায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমা পেয়ে জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমি নিজের স্ত্রীকে খুন করতে চেয়েছিলাম, গাড়ির ব্রেক ফেল করানোর মাধ্যমে। কিন্তু নিজের শিশুসহ আমাদের এক প্রতিবেশিনীও মারা যান ওই বানোয়াট কার অ্যাক্সিডেন্টে। কাজেই মহামান্য বিচারক আমাকে শুধু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেননি। তিনি তাঁর রায়ে বলেছিলেন একটা সাজার মেয়াদ শেষ হলে আরেকটা সাজা শুরু হবে। তারমানে যতদিনই আয়ু থাকুক, শেষ দিন পর্যন্ত আমার জেলে থাকার কথা—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ক্ষমা না করলে তাই থাকতে হতো আমাকে, উদ্যমের মতো পালাতে না পারলে আর কি।

প্রথমে আমি ভাবিনি কত কালের অচেনা বাইরের জগতের সঙ্গে নিজেকে আমি মানিয়ে নিতে পারব। কিন্তু বাইরে প্রথমে যেটা আবিষ্কার করলাম, আমাকে নিয়ে কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। তারপর খেয়াল করলাম আমি যে বাইরের জগত চিনতাম তার প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই। মানুষের গতি অসম্ভব বেড়ে গেছে। তারা এমনকি কথাও বলে দ্রুত। এবং জোরে।

সত্যি কথা স্বীকার করতে আমি কুণ্ঠিত নই, নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, অন্তত কিছু জিনিসের সঙ্গে। এই যেমন ধরুন, মহিলাদের সঙ্গে। মানবজাতির অর্ধেকই তারা, প্রায় চল্লিশ বছর হতে চলল সেটা আমার প্রায় জানাই ছিল না। হঠাৎ করে আমি এমন একটা দোকানে কাজ করছি যেখানে প্রায় সবাই মেয়ে। বৃদ্ধারা আছেন, আছেন টি-শার্ট পরা গর্ভবতী, ছাপা তীরচিহ্ন নিচের দিকে চিহ্নিত করছে, লেখা রয়েছে: ‘এখানে শিশু আছে।’ আছে রোগা কাঠ মেয়ে, তাদের জোড়া বাঁটা শার্টের গায়ে ফুটে থাকে। বুড়ো শয়তান, নোংরা মিনসে বলে গাল দিচ্ছি নিজেকেই, কারণ নিজেকে দেখতে পাচ্ছি সব সময় আধা শক্ত অবস্থায় চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে চাকরি করলে কি হবে, বেতন খুব কম। না খেয়ে, কম খেয়ে টাকা জমাতে হবে আমাকে। মনটা প্রায়ই বিদ্রোহ করতে চায়। কতদিনে প্রয়োজনীয় টাকা জমবে শুনি? কোথাও থেকে কিছু চুরি করতে পারলে হতো। তারপর ভেবেছি চুরি যদি করতে হয় নিজের চাকরির জায়গা থেকেই করা ভালো। সব কিছু আমার চেনা, গা বাঁচানো সহজ হুঁশ।

উদ্যম হাসানকে যদি না চিনতাম, আমি হয়তো সত্যি এই কাজটা করতাম। তা না করে আমি শুধু তার কথা ভাবতে থাকি, কি করে এই অতগুলো বছর ঠুক ঠুক রক হ্যামার ঠুকে একটু একটু করে কংক্রিট ভেঙেছে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে যাতে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। চুরি করার চিন্তা যখনই আসে, লজ্জিত বোধ করি আমি, এবং আইডিয়াটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিই। ও, আপনি

বলতে পারেন, মুক্ত হতে চাওয়ার ব্যাপারে আপনার চেয়ে তার অনেক বেশি কারণ বা যুক্তি ছিল—বাইরের দুনিয়ায় তার একটা নতুন পরিচয় এবং প্রচুর টাকা রাখা ছিল। সেটা কিন্তু আসলে সত্যি নয়, জানেন আপনি। কারণ তার জানা ছিল না নতুন পরিচিতি তখনও সেখানে আছে কিনা, আর ওই নতুন পরিচয় ছাড়া টাকা বলুন সম্পত্তি বলুন সব তার নাগালের বাইরে থেকে যাবে। না, তার যেটা দরকার ছিল, শুধুই মুক্ত হওয়া। কাজেই আমার যা কিছু আছে, তা যত সামান্যই হোক, আমি যদি তা লাখি মেরে ফেলে দিই তাহলে যুদ্ধ করে মুক্তি পাবার জন্যে সে যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছে তার মুখে শ্রেফ থুথু ছিটানো হবে।

কাজেই আমি আমার ছুটির সময়টা টাকা বাঁচিয়ে গাড়ি ভাড়া যোগাড় করে মাঝেমধ্যে আনোয়ারায় আসা করছি, খুঁজছি সেই মসজিদ আর বটগাছ—বলা উচিত এমন একটা মসজিদ, যেটার পেছনে একটা বটগাছ আছে। আপনি হয়তো ভাবছেন, এই লোক পাগল নাকি! কিসের আশায় আনোয়ারায় আসা যাওয়া করবে সে! সেখানে কি আছে?

সত্যি, কিসের আশায় আসা-যাওয়া করছি সেটা পরিষ্কার আমিও জানি না। তবে একটা কথা। উদ্যম আমাকে একদিন বলেনি যে ‘সিদ্ধান্ত যদি কোনোদিন বদলাও ভেবে তোমার ব্যবস্থা আমার করা থাকবে—?’ কথাটা বলে ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছিল সে?

এটা নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি। উদ্যম আমাকে এরকম কোনো জিনিস দিয়ে যায়নি যেটা সার্চ করলে কিছু বেরোবে, যা পেলে আমি আমার ব্যবস্থা করতে পারব, অর্থাৎ তার কাছে যাবার একটা উপায় আমি পেয়ে যাব। তাহলে? আমি তার বাড়ির ঠিকানা জানি না। কেন জানি না? সে আমাকে বলেনি, তাই। তাহলে তার সম্পর্কে এমন কিছু কি জানি আমি, সেটার সাহায্যে জানতে পারব আমার জন্যে কি ব্যবস্থা করে রেখে গেছে সে? কিছু একটা নিশ্চয় আমাকে দিয়ে গেছে, তাই না?

তারপর মনে পড়ল। আনোয়ারায় কবরস্থান সংলগ্ন মসজিদের পেছনে একটা বটগাছের কথা বলেছিল উদ্যম। এটাকে যদি একটা ঠিকানা মনে করি, তাহলে মাত্র এই একটা ঠিকানাই আমাকে দিয়ে গেছে সে। সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওই বটগাছের গোড়া, পুর্বদিকটা, খুঁড়ব আমি। জানি কাজটা দীর্ঘতর অন্ধকারে করতে হবে। আমার জন্যে কিছু যদি কিছু রেখে গিয়ে থাকে, তাহলে শুধু ওই ঠিকানাতেই সেটা পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস। দেখা যাক। আগে তো জায়গাটা খুঁজে বের করি।

কি? বোকামি করছি আমি? হতে পারে। ভেবে দেখুন সেটাও কিন্তু বোকামি ছিল, নিরেট কংক্রিটের গা থেকে বালির কণা খসানো একটানা আটাশ বছর ধরে।

মাত্র তিনবার খুঁজতে গিয়েই ওরকম একটা কবরস্থান পেয়ে গেলাম আমি। পাহাড়ি এবং একদম নির্জন একটা এলাকা, আমার গা ছমছম করতে লাগল। বাস থেকে নেমে মাইল দেড়েক হেঁটে পৌঁছেছি ওখানে, কাজেই বিশ্রাম নেয়ার জন্যে উদ্যমের বটগাছ তলায় খানিক বিশ্রাম নিতে বসেছি। দেখলাম আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে উদ্যম। হকচকিয়ে গেলাম আমি। তারপর বুঝতে পারলাম, তন্দ্রা মতো এসেছিল, তার মধ্যে স্বপ্ন দেখছিলাম।

পরের সপ্তায় প্রস্তুতি নিয়ে গেলাম। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসতে বটতলার মাটি খুঁড়ছি। খুব বেশি খুঁড়তে হলো না, পেন্সিল টর্চের আলোয় একটা পাথর দেখতে পেলাম। ভাবলাম উদ্যম আমার জন্যে কিছু যদি রেখে গিয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয় ওই পাথরের তলায় চাপা দিয়ে রেখে গেছে। এটা চিন্তা করার পর পাথরের দিকে আর আমি হাত বাড়াতে পারছি না। ভয় লাগছে, পাথরের তলায় কিছু যদি না পাই? তাহলে কি হবে? তখন কি করব আমি!

ভয় আর দ্বিধা কাটাতে তিন মিনিট বেরিয়ে গেল। যতই নির্জন এলাকা হোক, মানুষজন এখানকার মসজিদে নামাজ পড়তে আসে, তাদের কেউ যদি আমাকে দেখতে পায়, আমার অভিযান তো ভুল হবেই, লোকজনের হাতে মারও খেতে হতে পারে। আর যদি ধরে পুলিশে দেয়, সাবেক একজন কয়েদির সঙ্গে তারা কি ব্যবহার করবে নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারেন আপনি।

তিন মিনিট পর পাথর সরালাম। ছাঁৎ করে উঠল বুক। দেখলাম পলিথিনে মোড়া একটা স্বাস্থ্যবান এনভেলাপ রয়েছে ওখানে। ধরা পড়ার ভয় আছে জানি, অথচ এনভেলাপটা দেখার পর আমি পঙ্গু হয়ে গেছি, এক চুল নড়ার শক্তি পাচ্ছি না শরীরে।

আরও সময় লাগল, তবে শেষ পর্যন্ত এনভেলাপটা আমি বের করলাম গর্ত থেকে, পাথরটা যেখানে ছিল সেখানে রেখে দিলাম। ওই পাথর ওখানে এভাবে রেখেছিল উদ্যমও, তার পর রেখেছিল তার বন্ধুও।

এনভেলাপে একটা চিঠি পেলাম। তাতে উদ্যম কি লিখেছে তা বোঝা গেল। এখানে:



প্রিয় সদয় জাহান,

এই চিঠি তুমি যদি পড়ো, তাহলে তুমি বেরিয়ে এসেছ। এভাবে বা ওভাবে, যেভাবেই হোক বেরিয়েছ। আর সূত্র ধরে তুমি যদি এত দূর এসে থাকো, তোমার তাহলে আরেকটু আসারও ইচ্ছে হবে বলে মনে করি। তুমি তো ওই জায়গার নাম জানো, যেখানে আমার যাবার কথা, তাই না? আমার প্রজেক্টের চাকা ঘোরানোর জন্যে তোমার মতো দক্ষ একজন লোক সত্যি খুব দরকার আমার।

বিষয়টা একটু চিন্তা করে দেখো। তোমার জন্যে একটা চোখ খোলা রাখব আমি। মনে রেখো আশা নিয়েই মানুষ বাঁচে, তাই আশাবাদী হওয়াটা খুব জরুরি। আশা ভালো একটা জিনিস, সদয়, হয়তো সব কিছুর চেয়ে ভালো, আর কোনো ভালো জিনিস কখনোই মরে না। আমি খুব আশা করি এই চিঠি যেন তোমাকে খুঁজে পায়, খুঁজে পায় বহাল তব্বিতে।

তোমার বন্ধু  
নীল আকাশ

চিঠিটা আমি ওখানে বসে পড়িনি। আমাকে একটা আতঙ্ক পেয়ে বসেছিল, কারও চোখে ধরা পড়ার আগে ওখান থেকে সরে আসার দরকার ছিল আমার। চিঠিটা আমি আমার মেসে ফিরে পড়েছি। ভাগ্যিস সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল, তা না হলে আমাকে ওভাবে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে দেখলে কি ভাবত কে জানে। চিঠির সঙ্গে ওই এনভেলাপে হাজার টাকার পঞ্চাশটা নোট ছিল। আর ছিল বালিতে পৌছাতে হলে আমাকে কিভাবে কি করতে হবে তার লিখিত বিবরণ। কি করব সে সিদ্ধান্ত আগেই নিয়ে রেখেছি। উদ্যমের কাছ থেকে এখন জানলাম কিভাবে তা করতে হবে।

দেখলাম আমি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। উপলব্ধি করলাম এ-ধরনের উত্তেজনা শুধু একজন মুক্ত মানুষই অনুভব করতে পারে, শুধু একজন মুক্ত মানুষই দীর্ঘ একটা যাত্রায় বেরিয়ে পড়তে পারে যে যাত্রার উপসংহার অনিশ্চিত।

আমি আশা করি উদ্যম ওখানে আছে।

আমি আশা করি আমার পক্ষে ওই দ্বীপে পৌঁছানো সম্ভব।

আমি আশা করি বন্ধুর সঙ্গে আমার সত্যি দেখা হবে, এবং আমি তার সঙ্গে হাত মেলাব।

আমি আশা করি ভারত মহাসাগর ততটাই নীল যতটা নীল আমি স্বপ্নে দেখেছি।

-----

আমি কি হত্যাকারী

## এক

ভাঁজ ভাঁজ অন্ধকারে, ভাঁজ ভাঁজ কালচে অন্ধকারে, এই ঢেউ খেলানো মায়াময় আলো-আঁধারিতে প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি শুধু একটি মুখ। শুধু একটি আলোকিত মুখ। যেন সাদাটে, স্বল্প উজ্জ্বল মুখোশ-পরা একটি মুখ। নিখুঁত, সুশ্রী, সুন্দরী যুবতীর একটি মুখ। সর্বত্র ভেসে ভেসে, যেন সাঁতরেসাঁতরে বেড়াচ্ছে। ভাঁজ ভাঁজ আলো-আঁধারিতে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে একাকী।

কোথা থেকে বলতে পারব না, স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোথাও থেকে এক টুকরো রহস্যময় আলো নিরবচ্ছিন্নভাবে ওর মুখে এসে পড়েছে। নিচের দিক থেকে উঠে এসে ওর মুখটায় পড়েছে সেই আলো। অদ্ভুত,

মায়াময়, আশ্চর্যজনক সুন্দর দেখাচ্ছে। বৈচিত্র্যময়, রহস্যময় এবং সেই সাথে অবাস্তব মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এ সবকিছুই আমার কাছে অত্যন্ত পরিচিত। আর আমার বুক ভীষণভাবে দুলছে।

আমি ভয় পাচ্ছি। কিন্তু ভয় কোথাও দেখছি না। শুধুমাত্র লম্বাপানা, সাদাটে আর স্বল্প উজ্জ্বল মুখোশ-পরা মুখটা সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আশপাশে কোথাও না কোথাও যেন রক্ত হিম করা বিকট একটা বিপদ ওৎ পেতে রয়েছে, আমি অনুভব করতে পারছি পরিষ্কারভাবে, যে দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট। এবং সেই বিপদের হাত এড়িয়ে যাওয়া যেন আমার সাধের অতীত ব্যাপার। উপলব্ধি করছি এই মূহূর্তে কি করা উচিত আমার, কি করতে হবে আমাকে। যেন সেটা না করে বিকল্প কিছু করার উপায় নেই। তা সত্ত্বেও সেটা করছি না—ভয়ে!

আমি একান্তভাবে চাইছি ঘুরে দাঁড়াতে। দৌড়তে। অদৃশ্য হয়ে যেতে। পালাতে। আমি চাইছি প্রাণপণে চীৎকার করে উঠতে। পড়িমরি করে এসব কিছু থেকে বেমানুম উবে যেতে।

সেই চেষ্টাই, সেই পালাবার চেষ্টাই করলাম। অবশিষ্ট ইচ্ছাশক্তি এবং দৈহিক শক্তি ব্যবহারকরে ঘুরে দাঁড়াবার প্রয়াস পেলাম। ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই দেখতে পাচ্ছি একটা নয়, অনেকগুলো দরজা। মোট চারজোড়া, ছাটটা দরজা। একটার পর একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, মাঝখানে কোনোরকম

জায়গা নেই, দেয়াল নেই—যেঁষা-যেঁষি করে রয়েছে দরজার ফ্রেমগুলো। অথচ এই ঘরে প্রবেশ করবার সময় একটা মাত্র দরজা দেখেছিলাম আমি। সেটা দিয়ে ঢুকেছিলাম, অনায়াসেই।

একটা দরজা খোলার চেষ্টা করলাম, তারপর দ্বিতীয়টা, তৃতীয়টা। না, এতোগুলো দরজার কোনোটাই খোলা যাচ্ছে না। আমার সব চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। এখন উপায়!

সেই লুক্কায়িত ওৎ পেতে থাকা বিকট বিপদের ভয়টা একচ্ছত্রভাবে গ্রাস করে ফেলেছে আমাকে। কিন্তু কি তার প্রকৃত রূপ, অনুভব করতে পারলেও, তা অজ্ঞাত এখনো।

চঞ্চল আলোচ্ছটায় স্বল্প উজ্জ্বল মুখোশ-পরিহিতা যুবতীকে এই খানিক আগে পর্যন্ত দেখাছিল কালো, ঘন কালো আকাশের গায়ে উজ্জ্বল একটি স্বভাবসুন্দর নির্বিরোধী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নক্ষত্রের মতো। নক্ষত্রের সকল গুণ বিসর্জন দিয়েছে সে অকস্মাৎ। আস্তে আস্তে কুণ্ঠিত আকার নিচ্ছে তার মুখাবয়ব। আমার আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখের সম্মুখে হিংস্র হয়ে উঠল সেই মুখাবয়ব। কর্কশ, প্রতিশোধ পরায়ন কণ্ঠস্বর ঢুকল আমার কানে। চোখ দু'টো থেকে ওর বর্ষিত হচ্ছে গলিত অনল। চড়া গলায় বলে উঠল ও কারো উদ্দেশে 'ওই যে লোকটা! ওই যে, তোমার পিছনে! সামলাও ওকে!'

যুবতীর নিচের সারির দাঁতের সাথে উপরের সারির ঘর্ষণে কটকট শব্দ হলো।

আলোর টুকরোটা প্রসারিত হচ্ছে। যেন কোনো ইলেকট্রিশিয়ান মঞ্চের নায়িকার উদ্দেশে ট্রিক-সুইচ হাতে নিয়ে নানাভাবে আলো নিষ্ক্ষেপ করছে।

আলোটা ঘোর অস্পষ্ট। রঙটা নীলচে সবুজ দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে, অনেকটা পানির নিচে যেমন দেখায় তেমনি। আর এই রহস্যময় ভৌতিক ভাঁজ ভাঁজ আলো-আঁধারিতে সেই বিকট বিপজ্জনক, ভীতিপ্রদ বিভীষিকাময় ভয়াল বস্তুটা, যার ভয় অনুভব করছিলাম, ধীরে ধীরে তার মাথা উঁচু করতে আরম্ভ করল। পানির নিচে মানুষ যেমন অস্বচ্ছন্দে নড়েচড়ে ঠিক তেমনি নড়তে চড়তে দেখলাম সেই অলৌকিক ভীষণকে। মস্তুর গতি। নড়ছে তো নড়ছেই।

পিছনে এলিয়ে পড়ছে মাথাটা। ওই যে, আবার উঠছে সীজা হয়ে। যমের মতো নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে প্রকাশিত হচ্ছে ওটা আমার সামনে।

যম পুরুষ, বুঝতে পারছি ওটাও পুরুষ।

প্রথমে জিনিসটাকে, মানে ওকে, দেখাচ্ছিল একরাশ গোবরের মতো, বা কঠিনভূত ধোঁয়ার মতো। ক্ষুদ্র যুবতীর পায়ের কাছে অবস্থান করছিল ওটা। তাল

পাকানো স্তূপ করা দড়ির অবস্থা থেকে কুণ্ডলী ছাড়াতে ছাড়াতে মাথা তুলে উঁচু হচ্ছিল ক্রমশ। মাথা খাড়া করছিল, লম্বা হচ্ছিল, বিশেষ আকৃতি লাভ করছিল সেই সাথে। তারপর ছোটো হয়ে যেতে লাগল। আমার সামনে সরে এল। নিশ্চয়, নিজীব কোনো জড়পিণ্ড নয় ওটা আর এখন। যদিও সত্যিকার আকার এবং পরিচয় এখনও অজানা আমার, তবু যেন ধারণা হচ্ছিল, ও একটা বিশালকায় মানুষ। পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে সামনে। পিছনে গাঢ় নীল রঙের পটভূমি।

আসছে ওটা। আমার দিকে এগিয়ে আসছে আরো। শিকারি বিড়ালের মতো ধুরন্ধর মন্তরগতিতে চলে আসছে সিধে। পালাতে চাইলাম এবার আমি। চাইলাম ঘুরে দাঁড়াতে। চাইলাম দৌড়তে। একমিনিট, আধমিনিট, পনের সেকেন্ড—মাত্র পনের সেকেন্ড আর সময় আমার হাতে। তারপরই ধরে ফেলবে এটা আমাকে। এই কয়েকটা সেকেন্ডের মধ্যেই বাঁচাতে হবে নিজেকে। কিন্তু আমি যেন জীবন্ত মানুষ নই এখন। বালি, সিমেন্টে দিয়ে কেউ গঁথে রেখেছে আমাকে।

কেন আমি ভয় পাচ্ছি জানি না, কেন আমি পালাতে চাচ্ছি জানি না, জানি না ওটা আমার কি ক্ষতি করবে, কোনো কিছুই পরিষ্কার বুঝতে পারছি না। শুধু রক্ত হিম করা কঠিন একটা ভয় আমার বুকে।

মধ্যবর্তী দূরত্ব ক্রমশ ছোটো হয়ে আসছে।

কাছে এসে দাঁড়াল আমার সাক্ষাৎ-ভীতি। কিছুটা আবছা, যেন থকথকে কাদা দিয়ে তৈরি কোনো বস্তু, কোনো মানুষ। দৃষ্টি এড়াল না, চিংড়ি মাছের মতো ওর দু'পাশে সংযুক্ত ছুঁটো হাত। হাত দু'টো উঠে আসছে।

ভয়াবহভাবে অনুভব করছি দু'টো হাতের বজ্র-কঠিন পেষণ আমার সম্পূর্ণ কর্ণ জুড়ে। আমার গলার সম্মুখভাগের চেয়ে দু'পাশের অংশে অধিকতর শক্তিতে চাপ দিচ্ছে। গলা টিপে মেরে ফেলার বদলে ভেঙে ফেলে নিষ্ঠুরতা চরিতার্থ করার প্রয়াস পাচ্ছে। হাতের অস্বাভাবিক লম্বা লম্বা নখযুক্ত আঙুলগুলো সাঁড়াশীর মতো ঠিক আমার চোখের নিচের নরম মাংসে সঁধিয়ে যাচ্ছে। চোখ জোড়া উপড়ে ফেলবে যেন। চোয়ালের নিচেও প্রবেশ করছে দু'টো আঙুল। সঁধিয়ে পড়তে পড়তে মাথা ঘুরিয়ে মুক্তি পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছি আমি। অস্ত্রোপাশের মতো অমোঘ দু'টো হাত খুঁজে বেড়াচ্ছে চোখের নিচের নরম মাংস জায়গাটুকু আবার। আঙুল দু'টো স্থানচ্যুত হয়ে গেছে একটু আগের দিককণ্ঠে।

কৃপাহীন অমোঘ দু'টো হাতে নখ বসিয়ে দিয়েছি আমি। একটা হাত ছাড়িয়ে ফেললাম গলা থেকে। কিন্তু সেই হাতটাই আমার হাতের কজি ধরে নখ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। জ্বালা করে উঠল কজির কাছে। চামড়া ছড়ে গেছে। দাউ দাউ করে জ্বলে

উঠল হঠাৎ আমার সর্বশরীর। কজির কাছের জ্বালাটা বিদ্যুদবেগে ছড়িয়ে পড়ল প্রতিটি লোমকুপে। বিপুল বেগে ঝাড়া দিলাম নিজেকে। নিষ্ঠুর দু'টো হাতই ছেড়ে দিল আমার গলা এবং হাত। স্বস্থানে ফিরে গেল সে মুহূর্তের জন্যে। আবার নড়ে উঠছে। বিশালকায় থামের মতো শরীরের নিচে থেকে ধাক্কা মারলাম অন্ধের মতো। তারপর দুর্বল হয়ে পড়লাম আবার। নিঃশেষে সব শক্তি যেন চুষে নিয়েছে কেউ আমার শরীর থেকে। কোথা থেকে যেন এতটুকু শব্দ এসে ঢুকল আমার কানে। হাত দু'টো তুললাম। জোরে ধাক্কা মারার শক্তি নেই আর। আস্তে আস্তে ঠেলা দিচ্ছি। হঠাৎ একটা বোতাম বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার মুঠোয় চলে এল। প্রাণপণে নাছোড়বান্দার মতো বোতামটাকে মুঠো করে ধরে আছি আমি। এটাই যেন শেষ পর্যন্ত রক্ষা করবে আমাকে! মুমূর্ষু হাল আমার। চেতনা আছে, কিন্তু অচেতন হয়ে পড়ছি। চেষ্টা করছি বোতামটাকে আরো শক্তভাবে মুঠোর মধ্যে চেপে রাখতে।

সহজতম মস্তুর ভঙ্গিতে কিভাবে যেন আমাকে মেরে ফেলছে দুশমনটা, টের পেলাম। গলা বন্ধ হয়ে আসছে। আমার শরীর খাড়া হয়ে দুলছে। তারপর আমি হঠাৎ পড়ে গেলাম। একটু একটু করে নড়তে নড়তে উঠে বসলাম শেষ পর্যন্ত। তারপরই শুনতে পেলাম তার কণ্ঠস্বর। আমার কাণে তার কথার প্রতিটি শব্দ গম্ভীর দৈব আদেশের মতো শোনাল। সাদাটে ঈষৎ উজ্জ্বল মুখোশ-পরিহিতা যুবতীর উদ্দেশ্যে সে বলে উঠল কুড়ুলটা দাও আমার হাতে, ওই যে চকচকে ধারালো নতুন কুড়ুলটা পড়ে রয়েছে মেঝেতে—দাও আমাকে, তা না হলে এই জুলুম চলবে সারারাত!

বোবা বনে গিয়ে দু'টো হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরে অসহায় পশুর মতো নাড়তে নাড়তে আপত্তি প্রকাশ করছি। প্রায় সাথে সাথেই আমার কাঁপা হাতে কি যেন ভারী একটা বস্তু ঠেকল। কে যেন ধরিয়ে দিল সেটা আমার হাতে। অনুভব করলাম, বস্তুটার লম্বাপানা শক্ত হাতল। মাথার ভিতরে একটা ধারণা বিদ্যুতের মতো দ্রুত খেলে গেল—মুখোশ-পরিহিতা যুবতীটি বিশালকায় দৈত্য-বিশেষ শত্রুটির পরিবর্তে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছে ধারালো নতুন কুড়ুলটা। সর্বশক্তি দিয়ে সেটার হাতল কষে ধরে ফেলেছি আমি। তুললাম সেটাকে উপর পানে। তারপরই আমার শত্রুর উপর সজোরে ধাক্কা মারলাম সেটা দিয়ে! তার শরীরে অস্ত্রটা গেঁথে যাবার ফল পলককোণেই ভিতরে যেন আমার সর্বশরীরে ছড়িয়ে পড়ল। মুহূর্তের জন্যে অবশ্য হয়ে গেল সর্বশরীর। কিন্তু গেঁথেছে অস্ত্রটা শত্রুর শরীরে, আমার শরীরে নয়, আমি শুধু চমকে উঠেছি। গেঁথেছিল অস্ত্রটা খুব সহজেই, বের করার সময় কঠিন মনে হলো।

আমার ভীতি, আমার প্রাণের দুষ্মন চিত হয়ে পড়ে আছে। হামাগুড়ি দিয়ে তার কাছে সরে গেলাম এবার। বহু দেৱী হয়ে গেলেও এখন বেশ দেখতে পাচ্ছি আমি তার মুখটা। যেন মৃদু, অথচ পরিষ্কার আলো খেলা করছে তার মুখের উপর। মুহূর্তের মধ্যে আবিষ্কার করলাম দৈত্য নয়, বিশালকায় কোনো জানোয়ার নয়, এমনকি কাদার এবড়ো-থেবড়ো কোনো মূর্তিও নয় বা কঠিন-ভূত ধোঁয়াও নয়—সে আমারই মতো একজন মানুষ। নিরীহ, অসহায়, শক্তিহীন। তার সারা মুখ করুণ এবং সেই সাথে ঘৃণামিশ্রিতভাবে আমার দিক তাকিয়ে যেন সে বলছে, ‘কেন তুমি এমন সর্বনাশ করলে আমার!’—সহ্য করতে পারলাম না, ধাতুর তৈরি অস্ত্রটা সিঁধে সামনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। পর মুহূর্তে লাফ দিয়ে পিছিয়ে এলাম আমি।

মুখোশ-পরিহিতা যুবতী এখনো রয়েছে কালো পটভূমির উপর। অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ গলায় আতঙ্কিত চীৎকার করে উঠে সে তুমুল ঝড়ের বেগে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দরজাবন্ধ হবার শব্দ আমার কানে ঢুকল। দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকালাম আমি। কোন্ দরজা দিয়ে যুবতীটি ঘর থেকে বের হয়ে গেল? দরজাটা চিনতে পারলে আমিও পারব ঘরের বাইরে বের হতে। কিন্তু, সব ব্যাপারের মতোই এবারও দেৱী হয়ে গেল আমার। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। একটার পর একটা দরজার গায়ে ধাক্কা মারলাম। কিন্তু আসল দরজা কোনোটাই নয়। বাইরে বের হতে পারব না আমি। ফাঁদে পড়েছি, বন্ধ ঘরে আটকে গেছি, আর ঘরের ভিতর শোয়ানো রয়েছে ওই যে ওঠা-লাশটা! যেটা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে অবিরাম। যখন ওটা আমাকে আক্রমণ করেছিল তার চেয়েও ভীষণ আতঙ্কে জড়সড় করে দিচ্ছে এখন।

প্রায়শ্চিত্ত করার আর কোনও উপায় আমি রাখিনি, যা করবার করে ফেলেছি, এই মুহূর্তে ভুল সংশোধন করা যাচ্ছে না। কোনো মড়াকেই বাঁচিয়ে তোলা যায় না, জানি। ওটাকে বাঁচিয়ে তোলার চেয়ে ওটার একটা ব্যবস্থা করার ভাবনাই এখন আমার মাথা-ব্যথার কারণ।

লাশটাকে লুকিয়ে ফেলা একান্তভাবে দরজার। ঢাকা দিয়ে আঁড়াল করতে হবে যেভাবেই হোক।

ধাক্কা মারলাম আমি অনেকগুলো দরজা একটার গায়ে। দু’টো পাল্লাই খুলে গেল। আয়না লাগানো কবাতের পিছনে বাইরে বের হবার পথ দেখা যাচ্ছে না, ঘরের পূর্বোক্ত সেই নীলকান্ত মণির মতো বিকৃত আলোয় দেখতে পাচ্ছি ছোট গহ্বর মতো একটা ফাঁকা জায়গা। হঠাৎ সন্দেহ করলাম, দরজার ভিতরে

এই ফাঁকা স্থানটা আগের মুহূর্তটিতেও ছিল না, যেন এখুনি, যেন আমার প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই তৈরি হয়েছে এটা। মেঝে থেকে তুলে ফেললাম আমি আমার সেই ভীতির মূর্তিমান কারণটাকে। অতি সহজেই তুলে ফেললাম আমি তাকে। খুব হালকাই বোধ হচ্ছে। যেন হালকা কার্পেট বা মাদুরবিশেষ। ফাঁকা গহ্বর মতো জায়গায় চুকিয়ে দিলাম সেটা আমি। ভিতরে আর বিশেষ জায়গা রইল না।

এবার আয়না লাগানো পাল্লা দু'টো দিলাম বন্ধ করে। কবাটের এখানে-সেখানে হাতের চাপ দিয়ে ভালোভাবে ঠেলে দেবার কাজে লেগে গেলাম আমি। ফ্রেমের উপরে-নিচে হাতের থাবা চেপে চেপে, আয়নার গায়ে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে কাজটা সুচারুভাবে সমাপ্ত করবার চেষ্টা করছি। কিন্তু বারবার মনে হচ্ছে, ভালোভাবে বন্ধ হয়নি পাল্লা দু'টো, যে কোনো মুহূর্তে খুলে যেতে পারে। ভয়ে কেঁপে উঠছে বুকের ভিতরটা। আরো ভালো কোনো ব্যবস্থা করা দরকার। এভাবে দরজাটা বন্ধ করে রাখা যাবে না, খুলে যাবেই।

নিচের দিকে তাকালাম। দরজার নবের নিচেই একটা চাবি মাথা বের কার রয়েছে, দেখতে পাচ্ছি। চাবির যে দিকটা তালায় ঢোকানো হয় না সে অংশটাকেই মাথা বলছি আমি। এই চাবিটার মাথার দিকটা বড় অদ্ভুত। পাশাপাশি তিনটে গোল রিং দেখতে পাচ্ছি মাথার দিকটায়। চকচক করছে রিং তিনটে, ঠিক যেন এখুনি কেউ পালিশ করে রেখে গেছে। কোনো হলুদাভ ধাতু দিয়ে তৈরি চাবিটা। এই ধরনের চাবি জীবনে আর কখনো দেখেছি বলে স্বরণে আসছে না। এ ধরনের চাবি, আমার মনে হয়, খুব কম তৈরি হয় এবং খুব কমই ব্যবহার করা হয়। অবশ্য আদৌ এ রকম চাবি ব্যবহার করা হয় কিনা তা আমার সত্যি সত্যি জানা নেই।

চাবিটা আঙুল দিয়ে ধরে ঘুরিয়ে নিলাম আরো খানিকটা। তারপর ধীরে ধীরে টানতে শুরু করলাম। কি ভীষণ লম্বা চাবিটা, কী-হোল থেকে বের হচ্ছে তো হচ্ছেই। অবশেষে অবশ্য বেরিয়ে, এল অস্বাভাবিক লম্বা চাবিটা। নিচের দিকে দু'টো দাঁত দেখতে পাচ্ছি, দাঁতের অগ্রভাগগুলো তীর চিহ্নের মতো দেখতে।

চাবিটা দেখলাম মনোযোগ দিয়ে, তারপর পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম, এবং পরক্ষণে দেখতে পেলাম দরজার হাতলটা ধীরে ধীরে, দৃঢ় ভঙ্গিতে ঘুরছে। দরজাটা ধীরে ধীরে খুলছে। নিশ্চিতভাবে খুলছেই একটানা। খুলছে, খুলছে... খুলে যাচ্ছে...!

এমন সময় ঘুম ভেঙে গেল আমার।



## দুই

ঘুম ভাঙতে দেখি বিছানা থেকে বালিশটা ফেলে দিয়েছি মেঝেতে। আমার মাথাও ঝুলে পড়েছে খাট থেকে। শরীরটাও আধাআধি ঝুলছে। সারামুখে ঘাম, ভিজে গেছি। স্বস্তির শ্বাস ত্যাগ করে আপন মনেই বললাম যাক বাবা, শেষ পর্যন্ত তাহলে ভীষণ ব্যাপারটা দুঃস্বপ্নই ছিল।

মাথাটা ঝাড়া দিলাম দুঃস্বপ্নের পরের অবশিষ্ট আচ্ছন্নতা বোধটুকু ঝেড়ে পরিষ্কার করে ফেলার জন্যে। ঘড়ি দেখলাম। বিছানা ছাড়ার সময় হয়েছে অবশ্যই। সময় না হলেও কে আর অমন দুঃস্বপ্ন দেখার পর আবার ঘুমোবার প্রয়াস পেত?

পা দু'টো নামিয়ে দিয়ে বসলাম বিছানার কিনারায়। মোজা জোড়া তুলে নিয়ে সোজা করলাম উল্টে দিয়ে।

সত্যি, স্বপ্ন দেখা বড় অদ্ভুত আর মজার ব্যাপার। কোথা থেকে আসে ওগুলো? যায়ই বা কোথায় মিলিয়ে?

বাথরুমে গিয়ে ঠাণ্ডাজলে মুখ ধোয়ালো সময় ঘড়িটা খুলে রাখলাম। মুখ ধোয়ার পর সবটুকু ক্লান্তিবোধ দূর হয়ে গেল। স্বাভাবিক, সহজ, পরিচিত এবং নিশ্চিত পরিবেশ অনুভব করছি। চিরঞ্জীর অভ্যস্ত কামড়, পানির সুপরিচিত স্বাদ, সিগারেটের চেনা আকৃতি—সবই ঠিক আছে। সব স্বাভাবিক ঠেকছে। হাত-ঘড়ির বেল্ট লাগাচ্ছি। বেল্টের দুই প্রান্ত ঝুলছে কজির দু'দিকে।

ঘড়ির বেল্টটার একটা অংশ কাটা দেখছি।

হঠাৎ কেমন যেন ভয় জেগেই মিলিয়ে গেল বুক থেকে।

হাতের আস্তিন কজি পর্যন্ত নামিয়ে বোতাম লাগিয়ে দিলাম।

কাটা বেল্টের দিকে তাকিয়ে থাকাটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সে কোনো কাজের কথা নয়। কিন্তু কেন, কিভাবে ঘড়ির বেল্টটা ওভাবে কাটল? এর কোনো সঠিক উত্তর আমার জানা নেই, স্বীকার করছি। কিন্তু এর আবার উত্তর কি? না হয় বেল্টটা কেটেছে, কোনো না কোনোভাবে কেটে গেছে, অথচ বিশ্বস্ত হবার কি আছে?

“ভাবো বাস্তব স্বপ্নটার ব্যাপারখানা!”—আমি মনে মনে বললাম, “আমার ধারণা, হাতঘড়ির বেল্টটা আমার অপর হাতে বন্ধ দিয়ে আমি নিজেই কেটে ফেলেছি স্বপ্নের ঘোরে।”

কজির হাড়ের উপরের চামড়ায় আঁচড়ের দাগও দেখতে পাচ্ছি। লাল হয়ে গেছে দাগগুলো। এগুলোও আমি স্বপ্নের ঘোরে করেছি, অবিশ্বাস করার উপায় নেই। অন্য কিছুতেই হতে পারে না।

কাজ সারতে লাগলাম একটা একটা করে। দৈনন্দিন ঝক্কি-ঝামেলা নেই আমার। একা থাকি। খাওয়া-দাওয়া করি বাইরে! বাবা-মা থাকেন ঢাকায়। চিটাগাংয়ে আছি বেশ কিছুদিন থেকেই। পাঁচটা পাণ্ডুলিপি তৈরি করার প্ল্যান নিয়ে এসেছি। তারমধ্যে তিনটেই বাকী এখনো। চিন্তা নেই, প্রকাশক টাকা নিয়মিতই পাঠাচ্ছেন। সময় নিয়ে লিখব।

আপনজন বলতে আমার বোন রাহেলা থাকে এখানে, তাও এ বাড়িতে নয়, স্বামীর সাথে শহরের শধ্যভাগে একটা দোতলা ফ্ল্যাট নিয়ে। হাসান বয়সে আমার চেয়ে বছরখানেকের বড়, রাহেলার সাথে বিয়ে হবার আগে থেকেই জানাশোনা আমাদের। বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক। বোনটিও অবশ্য আমার চেয়ে বড়। ওদের দু'জনার বয়স প্রায় সমান সমান।

চিটাগাংয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে ওরা। পুলিশবিভাগে চাকরি করে হাসান। বড় অফিসার। কর্তব্যপরায়ণ এবং দায়িত্বশীল। ব্যক্তিগত জীবনে তো বটেই, চাকরি-জীবনেও। ওদের ছেলেমেয়ে হয়নি, ঝামেলা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমাকে থাকতে বলেছিল ওদের সাথে। রাজী হইনি। প্রায় অকারণেই একা থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছি এখানে। দেখা-সাক্ষাৎ প্রায়ই করি অবশ্য সুযোগ মতো।

আয়নার সামনে এসে দাঁড়িলাম। আজ আর লাল টাই নয়, নীল টাই নেব। একদিন পর পর বদলাই। শার্টের কলার উল্টে দিয়ে আবার ফেলে দিলাম যথাযথ...

একি, আমার গলায় ক্ষতচিহ্ন কোথা থেকে এল! কখন হলো...?

আমার হাত স্থির হয়ে গেল সেভাবেই। গলার কাছে ধরে আছি কলারের দুই প্রান্ত। আমার মাথার একটা অংশপ্রস্তুত হয়ে উঠেছে ভয়ের আঘাতের আশঙ্কায়। আয়নার দিকে বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। একি কণ্ঠস্বর! একি অবাক কাণ্ড! কি হতে পারে এই ক্ষতচিহ্নগুলোর মানে? গতরাতে ঘুমে ঘাবার সময় এই দাগগুলো দেখিনি। হালপ করে বলতে পারি, গতরাতে ঘুমে ঘাবার আগে এই ক্ষত চিহ্নগুলো ছিল না আমার গলায়। দাগগুলোর রঙ খয়েরী হয়ে গেছে।

পরীক্ষার বুঝতে পারছি, শক্তিশালী কোনো মস্তিষ্কের হাত দিয়েই এই রকম গভীর দাগের সৃষ্টি সম্ভব। নিষ্ঠুর আঙুলের আঁচড়, চাপ, পেষণ।

ধৈর্য হারিয়ে ফেলাছি আমি। চঞ্চল এবং উত্তেজিত হয়ে উঠতে চাইছে মন। কি ব্যাখ্যা দেব এগুলোর? একমাত্র ব্যাখ্যাটি শোনালাম নিজেকেই স্বপ্নের ঘোরে আমি স্বয়ং স্বহস্তে নিজের গলা টিপে ধরেছিলাম।

তবু সরে আসতে পারছি না আয়নার সামনে থেকে, তবু চোখ ফেরাতে পারছি না গলার ক্ষতচিহ্নগুলোর দিক থেকে, তবু দূর হচ্ছে না বুকোর অস্বস্তি গলায় আঙুলের যে লম্বা লম্বা দাগগুলো দেখছি সেগুলো মিলিয়ে দেখতে গিয়ে ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়ছি ক্রমশ। বাঁ পাশের গলার দাগগুলো ডান হাতের আঙুলের দাগ। আর ডান দিকেরগুলো বাঁ হাতের। মানুষ কি ঘুমুলে অমন ভঙ্গিতে অবস্থান করে? আমি কি ওই ভাবে শুয়েই নিজের গলা টিপে ধরেছিলাম? হয়ত তাই...।

কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে মেনে নিতে হচ্ছে আমাকে ব্যাপারটা। গলার দাগগুলো একটা হাতের নয়, নিঃসন্দেহে। বাঁ দিকে যে ক'টা দাগ, ডানদিকেও সেই ক'টা। এবং প্রতিটি হাতের বুড়ো আঙুল বিপরীত দিকের চামড়া ছেঁচে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে।

সবচেয়ে অস্বস্তিতে ফেলছে ক্ষতগুলোর ব্যথা। বেশ ব্যথা বোধ হচ্ছে। গলাটা ঘোরালাম। চমকে উঠলাম এবার। ব্যথায় প্রায় ককিয়ে উঠলাম আমি। এতক্ষণ গলা নাড়িনি বলে বুঝতে পারিনি টাটানিটা। প্রশ্ন জাগছে—যেভাবেই হোক না কেন ক্ষতগুলো, আমার ঘুম ভাঙলো না কেন?

কিন্তু এতসব ভাবলে চলবে না। সন্দেহবাতিক মন আমার। এবং স্বপ্নটাও ছিল সত্যি সত্যি ভয়ঙ্কর। যা দেখছি তাতেই ভয় পাচ্ছি। কাজে মন লাগাবার প্রয়াস পেলাম। বাধ্য করলাম নিজেকে। শার্টের বোতাম আঁটলাম, টাই পরে নিয়েছি। ক্ষতচিহ্নগুলো ঢাকা পড়লো, কিন্তু সবটুকু নয়। কোট পরলাম। ঘড়িতে ছ'টা দশ। দেরী হয়ে গেল বড়। ছবি আঁকতে যাবার প্রোথাম আজ। আমি আর আমার দুই বন্ধু দূরবর্তী পাহাড়ের দিকে যাব। ফিরে আসব সন্ধ্যার দিকে।

আমি তৈরি। এবার ঘরে তালা মেরে বের হয়ে পড়লেই হয়। মুখটি কেমন যেন খুঁতখুঁত করছে। টাকা-পয়সা নিয়েছি তো?

বুক-পকেটে হাত ঢোকালাম। নিয়েছি। কিন্তু খুচরো টাকা নেই দেখছি একটাও, সব দশ টাকার নোট। খুচরো পয়সা আছে তো, প্যান্টের পকেটে হাত ভরে দিলাম।

কয়েকটা সিকি-আধুলি বের করে আনলাম পকেটের ভিতর থেকে। খুচরো পয়সাগুলোর মাঝখানে একটা বোতাম দেখা যাচ্ছে। চমকে উঠলাম আমি।

কেঁপে উঠল হাতটা। সিকি-আধুলিগুলো পড়ে গেল হাতের মুঠো থেকে।  
বোতামটাও।

মেঝেয় পড়ে থাকা বোতামটা দেখছি বিস্ফারিত নেত্রে। সর্বশরীরে ভয়ের  
ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

বোতামটা তুললাম। স্পর্শ করলাম। মুঠোর মধ্যে ভরে শক্ত করে ধরে  
রইলাম। সেই অনুভূতি। সেই স্বপ্নের মধ্যকার অনুভূতি। অনুভব করছি, স্বপ্নের  
মধ্যে বোতামটাকে মুঠো করে ধরার সময় যেরকম স্পর্শবোধ করেছিলাম এখনও  
ঠিক তেমনি করছি।

তার মানে, কোনো সন্দেহ নেই আর, এটা সেই বোতামটাই। সেই একই  
বোতাম। স্বপ্নে যে বোতামটা দেখেছিলাম এটা সেটাই।

অস্বাভাবিক এর আকার, অদ্ভুত এর রং। এ বোতাম আমার নয়। তবু  
আমার সব পোশাক পরীক্ষা করলাম। কোনো বোতামের সাথেই মিল খেল না  
বোতামটা। এমন কি আমার কোনো পোশাকের বোতাম হারিয়েও যায়নি। না,  
এটা আমার বোতামই নয়।

নিরাশায়, ভয়ে, আতঙ্কে চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছে আমার। ভয়  
পাচ্ছি, ভীষণ ভয় পাচ্ছি। জীবনে এমন ভয় আর কখনো পাইনি।

স্বাভাবিক দৈনন্দিন নিয়মমাত্রিক সময় কাঠানো এরপর আর সম্ভব নয়  
আমার পক্ষে। এখন আর নিজেকে প্রবোধ দিয়ে বলতে পারছি না—“স্বপ্নের  
ঘোরে কজি আর গলার ক্ষতচিহ্নগুলোর মতো বোতামটাও সংগ্রহ করেছি স্বয়ং  
আমি।” এটা অন্য কোথাও থেকে আমদানি হয়েছে। সূতো গলাবার চারটে ছিদ্র  
এর মাঝখানে। কালো একটা সূতোও ঝুলছে বোতামটার গায়ের সাথে।  
বোতামটা সলিড ফাঁপা নয়।

কিন্তু মাঝ সমুদ্রে পড়ে গেছি আমি। পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। না পাচ্ছি কূলের  
নিশানা, না মেনে নিতে পারছি পরাজয়। যদি মেনে নিই, বোতামটা স্বপ্নের মধ্যে  
থেকে এসেছে, এসেছে বাস্তবে, তাহলে পরাজয় বরণ করতে হয় আমাকে। কিন্তু  
কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না এমন অসম্ভব কল্পনাকে। মেনে নিলেই তো হচ্ছে  
না, যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা পেতে হবে তো? কিন্তু এ ব্যাপারে কি ব্যাখ্যা আছে  
আমার? বর্তমান যুগের মানুষ হয়ে শ্রেফ ভৌতিক ব্যাপারটাকে স্বীকার করে নেব  
কিভাবে, নেবই বা কেন? কিন্তু এ ছাড়া আর উপায়ও দেখছি না। প্রবোধ অবশ্য  
দেয়া যায় নিজেকে একভাবে—“বোতামটা আমি হঠাৎ কুড়িয়ে এনেছিলাম  
কোনো সময় রাস্তা থেকে। এবং এই মুহূর্তে সে কথাটা মনে পড়ছে না  
আমার।”—কিন্তু তা তো নয়। তা যে নয় সে কথা আমার চেয়ে ভালো আর কে

জানে? রাস্তা থেকে কখনও কোনো বোতাম আমি কুড়িয়ে আনিনি।—“কিন্ধা আমার পোশাক তৈরি করেছে যে দর্জি সে হয়ত অন্য কোনো লোকের পোশাকের বোতাম অসাবধানতাবশত আমার পোশাকের পকেটে রেখে দিয়েছিল।”—আসলে হয়ত ওই রকম কিছুই হয়েছে, আর—আমার নার্ভগুলো কতটুকু উত্তেজনা সহিতে পারে আজ তার পরীক্ষা হবার পালা।” কিন্তু মন সায় দিচ্ছে না একথা। তা না দিক, হয়ত ভুল করছে আমার মন-ই।

ঘরে নয়, ঘরে থাকা উচিত নয় আর। মাথাটা বিম্বিম্ব করছে। মাথাধরার কোনো ট্যাবলেট খেয়ে নেব এক কাপ চায়ের সাথে?

কোটটা পরে নিলাম। দরজার দিকে পা বাড়লাম। দরজার দিকে এগোতে এগোতে ভাবলাম, চারদিক কেমন নিস্তব্ধ। চারদিকের নিস্তব্ধতা আমাকে যেন ব্যঙ্গ করছে। আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। জোরে জোরে পা ফেলে এগোলাম দরজার দিকে। শব্দ উঠল জুতোর। দরজার পাল্লা দু’টোর গায়ে সজোরে ধাক্কা মারলাম। সশব্দে খুলে গেল পাল্লা দু’টো। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়লাম।

বাইরে বের হবার সময় সর্বশেষ কাজটি হলো পকেটে ঘরের চাবি আছে কি না পরীক্ষা করে দেখা। দরজার পাল্লা ভেজিয়ে দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছি। কোটের পকেটে হাত ভরে দিলাম চাবি আছে কি না দেখার জন্যে। চাবি ঘরের ভিতরে থেকে গেলে মুশকিলে পড়ব পরে।

কোটের পকেট থেকে আমার চাবির গোছাটা বের করে আনলাম। মুঠো খুলে দেখলাম।

আমার নিজস্ব চাবির গোছার সাথে সেই, সেই অদ্ভুত চাবিটা পকেটের ভিতর থেকে উঠে এসেছে মুঠোর মধ্যে। চাবিটার দুই প্রান্ত দেখা যাচ্ছে। মাঝখানটায় আমার অন্যান্য চাবি পড়ে রয়েছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে হাঁ হয়ে গেল আমার মূখ, যেন প্রচণ্ড তৃষ্ণায় হাঁপাচ্ছি আমি। ঠোঁট দু’টো ফাঁক হয়েই রয়ে গেল, বন্ধ হচ্ছে না আর।

এটা সেই অত্যাশ্চর্য চাবিটাই। এটার মাথার দিকটা বড় অদ্ভুত। পিগ্গাপাশি তিনটে গোল রিং দেখতে পাচ্ছি মাথার দিকে। চকচক করছে রিং তিনটে, ঠিক যেন এখুনি কেউ পালিশ করে রেখে গেছে। কোন হলুদাভ রঙ দিয়ে তৈরি চাবিটা। এই ধরনের চাবি জীবনে আর কখনো বা আকস্মিকভাবে দেখেছি বলে স্মরণে আসছে না। গত রাতে স্বপ্নে দেখেছি বটে। স্বপ্ন থেকে আমার বাস্তব জীবনে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে এই ব্যাখ্যাসহী বিষয়টা। এ ধরনের চাবি, আমার মনে হয়, খুব কম তৈরি হয় এবং খুব কম ব্যবহার করা হয়।

বাইরে বের হবার জন্যে তৈরি হয়েছি বটে, কিন্তু এরপর আর কোথাও যাওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। দরজা খুলে ঘরের ভিতরে ফিরে এলাম আবার। দরজা বন্ধ করে দিলাম ভিতর থেকে। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম মেঝের উপর। ভয় লাগছে আমার। আমি যেন ভয়ানক ভয়ঙ্কর ব্যাপারগুলো টের পেয়ে যাচ্ছি। মানুষ পাগল হবার আগে নিজেই তার লক্ষণগুলো বুঝতে পারে কিনা জানা নেই আমার। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি। এ ঠিক ব্যাখ্যা করে লেখা যাবে না। পরিষ্কার টের পাচ্ছি, পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি। ভয় পাচ্ছি সেই জন্যেই। চমকে উঠছি নিজের পদশব্দেই। বাতাসে ক্যালেভারের পাতা নড়ছে, শিউরে উঠছে আমার সর্বশরীর। নিজেরই নিশ্বাস পতনের শব্দে চোঁচিয়ে ওঠবার উপক্রম করছি।

আস্তে আস্তে, দিশেহারার মতো, টলতে টলতে, হাঁপাতে হাঁপাতে বিছানার ধারে ধাপাস করে নিজের অজান্তেই বসে পড়লাম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম কোথায় বসে পড়েছি, যেন বুঝতে পারিনি আগে পর মুহূর্তেই সবগে উঠে দাঁড়িলাম, ভয়ে গলা শুকিয়ে যাচ্ছে বিস্ফারিত চোখ মেলে আয়নার সামনে, আয়নার গায়ে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িলাম। চিনতে পারছি নিজেকে। কোনো সন্দেহ নেই, কোনে ভুল নেই—আয়নার গায়ে যে প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে সে আর কেউ নয়, জল-জ্যাস্ত আমি। অর্থাৎ বেঁচে আছি আমি এবং চিনতে পারছি নিজেকে অর্থাৎ পাগল হয়ে যাইনি তখনো। তবু চোখের নিচের একটা পাতা আঙুল দিয়ে নামিয়ে চোখের মনিটা দেখলাম একান্তভাবে। জানি না এমন কেন করছি, জানি না এমন করে কি বুঝতে চাইছি। অবশ্য কিছু অনুভব করছি না।

তারপর চিমটি কাটলাম নিজেকে। ব্যথা লাগছে। হাতে আঙুল মটকালাম। পরিষ্কার পর্বাস্ফোটের শব্দ শুনছি—ফট, ফট ছুটে গেলাম জানালায় পাশে। যেন সন্দেহ হচ্ছিল, বাইরের পৃথিবী বলে কিছু আছে কিনা।

পৃথিবী আছে। আছে আগের মতোই। রাস্তার পাশের বাড়িগুলো

ঠিক তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেমন গতরাতে ঘুমুতে যাবার আগে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। ঠিক বিপরীত দিকের বাড়ির বৃদ্ধ ছাদের রেলিংয়ে লেপ-তোষক শুকাতে দিচ্ছে। খবরের কাগজওয়ালা যাচ্ছে সাইকেলে চোপে। একজন আইসক্রিমওয়ালা বাচ্চা ছেলেদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আইসক্রিম বিক্রি করছে। বাচ্চা একটা ছেলে বই খাতা বগলে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। একটা ইটের টুকরো জুতোর ডগা দিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে যাচ্ছে যাবার পথে।

পার্থিব জীবনযাত্রায় কোথাও কোনো ছেদ পড়েনি। কোথাও কোনো রকম অস্বাভাবিকতা নেই। অস্বাভাবিকতা শুধু আমাতেই।

সিদ্ধান্ত নিলাম, প্রোথ্রাম অনুযায়ী বন্ধুদের সাথে ছবি আঁকাতেই যাব। হয়ত ভুলে থাকতে পারব ভয়গুলো। নরক থেকে বেরিয়ে পড়লাম, অর্থাৎ ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। ক্ষিদে পেয়েছে, কিন্তু কোথাও বসে খেতে ইচ্ছে করছে না। ক্ষিদে হয়ত পায়নি, খাবার ইচ্ছে জাগছে না, দৈনন্দিন অভ্যাসটার কথা মনে পড়ছে শুধু।

রাস্তা দিয়ে লক্ষ্যহীনভাবে হাঁটতে হাঁটতে স্মরণ হলো, বন্ধুরা সবাই চলে গেছে অনেক আগেই প্রোথ্রাম অনুযায়ী। আমার জন্যে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল নিশ্চয়, পৌঁছুইনি দেখে রওনা হয়ে গেছে ওরা। সাড়ে ন'টা বাজে। সময় পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। অবশ্য এখন মনে হচ্ছে, বন্ধুদের সান্নিধ্যে কোনো ফল পাব না, সম্ভবও নয় পাওয়া।

## তিন

সারাটা দিন রোদে রোদে ঘুরে বেড়ালাম। সূর্যের আলো ছাড়া হাঁটলাম না। যে রাস্তায় উত্তম সূর্যালোক দেখলাম না, সে রাস্তায় পা বাড়ালাম না। শীতের দিন, রোদে তেজ নেই তেমন। গরম হলো না।

\*\*\*

জানালাম। হাসান রেহানার উদ্দেশ্যে বলল : না, বাইরে চা খেতে যাচ্ছি না। তুমি চা পান কর, আসছি আমরা।

বাড়ি থেকে বের হয়ে এলাম আমরা। ফুটপাথ ধরে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলাম। হাসান কোনো কথা জিজ্ঞেস করছে না স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। গম্ভীর প্রকৃতির, স্বল্পবাক মানুষ ও। পুলিশ বিভাগে চাকরি করে তার উপর। কথা কম বলাই স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে ওর। অবশ্য কিংবদন্তি অনুযায়ী কড়া মেজাজের দাস নয় ও। মৃদুমন্দ সমীরণের মতো প্রকৃতি ওর। আমার প্রতি তাঁর কোনো কোনো অভিযোগ ছিল না। নেইও। আমাকে ভালোবাসে ও স্বপ্ন দেখে না আমিও ওকে। পুলিশ বিভাগে চাকরি করে বলেই সব কথা বলব বলে সিদ্ধান্ত নিই। এমনতেও বলতাম ওকে, ওর প্রতি আমার আস্থা আছে। তাছাড়া পুলিশ বিভাগের কর্মচারী বলেও আমার বিপদের কথা ওকে জানানো দরকার।

কি ব্যাপার হে? তোমাকে এমন নির্জীব মনে হচ্ছে কেন?

অবশেষে জানতে চাইল হাসান।

হাসান, গতরাতে স্বপ্নে আমি একজন মানুষকে খুন করেছি। লোকটাকে আমি চিনি না, জায়গাটাও আমার অজানা। লোকটার নখ আমার হাতের কজির উপর দাগ বসিয়ে দিয়েছে। গলার দু'দিকে তার আঙুলের চাপে দাগ বসে গেছে, রক্ত জমে গেছে। তার পোশাকের কোনো জায়গা থেকে একটা আশ্চর্য রকমের বোতাম ধস্তাধস্তির সময় আমার মুঠোয় চলে আসে। তারপর, যখন আমি খুন করে ফেলেছি অর্থাৎ সে যখন নিহত হলো, তাকে, তাকে মানে তার লাশটাকে একটা দেয়াল আলমারির ভিতরে ঢুকিয়ে রাখলাম। তালা বন্ধ করে চাবিটা আমার পকেটে রেখেছিলাম। আর, তারপরে, যখন ঘুম ভেঙে গেল আমার.... আচ্ছা, এই যে দেখো, নিজের চোখের সব দেখ তুমি হাসান।

আমরা একটা ল্যাম্প-পোস্টের নিচে, ফুটপাতের উপর দাঁড়িয়ে-ছিলাম। হাসানের মুখোমুখি হলাম আমি। শার্টের আস্তিন সরিয়ে কজিটা দেখালাম।

দেখছ, হাসান?

হাসান মাথা নেড়ে জানাল, সে ক্ষতচিহ্নগুলো দেখতে পাচ্ছে। শার্টের কলার সরিয়ে গলার দাগগুলো দেখালাম এবার।

দেখতে পাচ্ছ? রক্ত জমে গেছে, কালচে হয়ে গেছে দাগগুলো।

আবার মাথা নেড়ে হ্যাঁ বাচক উত্তর দিল হাসান।

আর, যে বোতামটার কথা বললাম তোমাকে, সেটা স্বপ্নে যেরকম দেখেছি, যেমন আর, যেমন আকৃতি, যেমন রং—ঠিক তেমনি আকারে, তেমনি আকৃতিতে, তেমনি রঙে, ঘুম ভাঙার পর পকেটের ভিতর থেকে আবিষ্কার করেছি একটা বোতাম। পকেটে খুচরো পয়সার সাথে মিশে ছিল ওটা। তুমি যদি আমার সাথে যেতে পার দেখাতে পারি সেটা। ঘরে রেখে এসেছি বোতামটাকে। কিন্তু অদ্ভুত চাবিটা সাথে করে আনতে ভুলিনি। চাবিটা অদ্ভুত রকমের। স্বপ্নে এটাকে দেখার সময়ও অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল। ঘুম ভাঙার পর এটাকেও আবিষ্কার করেছি। আমার চাবির সাথেই ছিল, একই পকেটে, যেখানে আমার চাবি থাকে। দেখো তুমি চাবিটা। সারাদিন সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি।

পকেট থেকে চাবিটা বের করতে অস্বাভাবিক বেশি সময় লেগে গেল। আমার হাত কাঁপছিল। তার উপর পকেটের এক কোণায় লুকিয়ে পড়েছিল শয়তানটা।

হাসান চাবিটা আমার হাত থেকে নিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করল কৌতূহলী চোখে। কিন্তু কোনো মন্তব্য করল না।

ঠিক এই চাবিটাই স্বপ্নে দেখেছি আমি। সেই একই রং, একই গড়ন, একই আকার, এমন কি ঘুম ভাঙার পর হাতে নিয়েও দেখেছি আমি—সেই একই ওজন।



হাসান মাথাটা সরিয়ে আনল চাবি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে। একটু ঝুঁকে পড়ে মনোযোগ সহকারে তাকাল আমার মুখের দিকে। কথা না বলে অমন করে তাকিয়েই রইল ও। তারপর আমার কাঁধে 'ভারী' একটা হাত রাখল ও। সহানুভূতি দেখতে পাচ্ছি ওর চোখের দৃষ্টিতে।

খুব বেশি গোলমালে ঠেকছে, না? কিন্তু ব্যস্ত হয়ে না। কাহিল হয়ে পড়াটা স্রেফ বোকামি। ব্যাপারটাকে তুমি যেভাবে দেখছ সেভাবে না দেখে...।

এসব কথায় ফল হতে পারে না। আমি যা চাই তা কখনো সহানুভূতি নয়। ব্যাখ্যা দরকার, ব্যাখ্যা চাই আমি। বুঝতেই হবে আমাকে এর রহস্য। তা না হলে আমার স্বস্তি নেই, শান্তি নেই, সন্তুষ্টি নেই, নিশ্চয়তা নেই...কিছু নেই।

ব্যস্তভাবে বললাম হাসান, তুমি আমাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাও। এই একমাত্র উপায় আমাকে সাহায্য করবার। তুমি জান না, সারাদিন কি ভয়ঙ্করভাবে কেটেছে আমার। মানুষ নেই আমি আর, আজব একটা প্রাণী বলে অনুভব করছি নিজেকে। পিছন থেকে তাড়া করছে সারাক্ষণ একটা আতঙ্ক। কিছু একটা বলো, হাসান।

হাতের তালুতে চাবিটা ফেলে ওটার ওজন পরীক্ষা করতে করতে হাসান জিজ্ঞেস করল: তুমি কোথা থেকে এটা পেয়েছ, রহমান? মানে, আমি বলতে চাচ্ছি, সর্বপ্রথম কোথায় দেখেছিলে এটা স্বপ্নে দেখার আগে?

দু'হাত দিয়ে জোরে চেপে ধরলাম আমি হাসানের একটা হাত। কিন্তু হাসান, তুমি কি বুঝতে পারনি একটু আগে যেসব কথা তোমাকে শোনালাম? স্বপ্নে এটাকে দেখার আগে, আগে কখনো দেখিনি আমি। স্বপ্নেই প্রথম দেখেছি। তারপর ঘুম ভাঙার পর দেখতে পেয়েছি। ঘুম ভাঙার পর স্বপ্নে দেখা চাবিটার বাস্তব অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছি আমি।

তাহলে বোতামটার বেলাতেও তোমার বক্তব্য এই-ই?

হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম।

হাসান মাথা নেড়ে বলে উঠল স্থিরভাবে ভাবনা-চিন্তা করতে পারছ না তুমি, আমার সন্দেহ হচ্ছে রহমান। না না, দাঁড়াও, শেষ করতে দাঁড়াও আমার কথা। ভালো কথা, ঠিক কোন্ ব্যাপারে দূর্শিস্তা হচ্ছে তোমার? নিশ্চয় আঁচড়ের দাগ, বোতাম আর চাবিটার ব্যাপারে নয়, নয় কি? কিন্তু, তুমি সত্যি সত্যি দেখেছ বলে ভয় পাচ্ছ?

ওর কথা শুনে বুঝতে পারছি, আমার বক্তব্য উপলব্ধি করতে পারেনি এখনও। বুঝতে পারেনি আমাকে। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নদেখা জিনিসগুলো বাস্তবে সত্য বলে আবিষ্কার হয়েছে বলে প্রাণ ওষ্ঠাগত নয় আমার। ভয়ের কারণ অন্যত্র

স্বপ্ন এবং জাগরণের পরবর্তী ঘটনাগুলোর পিছনের অন্তর্নিহিত অর্থই আতংকের কারণ। যদি স্বপ্নে দেখা চাবিটা আমার পকেট থেকে না পেতাম তাহলে এ সমস্যা নিয়ে আবির্ভূত হতাম না হাসানের কাছে। একটা খবর হিসেবে পরিবেশন করতাম। কিন্তু আমি ভাবছি, এবং আমার ভাবনার পিছনে ব্যাখ্যা আছে—যদি স্বপ্নে দেখা চাবিটার বাস্তব অস্তিত্ব থাকা সম্ভব তাহলে আয়না লাগানো দেয়াল আলমারিও কোথাও না কোথাও থাকা সম্ভব। সম্ভব নয়, আছে, থাকতে বাধ্য। এবং সেই দেয়াল-আলমারির ভিতরে থাকা সম্ভব একটি লাশ। এক্ষেত্রেও শুধু সম্ভব নয়, আছেই, থাকতে বাধ্য। বাস্তব। ভয়ঙ্কর বাস্তব। বাস্তব সত্য। সেই লাশটা, যেটা জীবিত অবস্থায় আমাকে আঁচড়ে দিয়েছিল, আক্রমণ করেছিল। তারপর আমি তাকে হত্যা করেছি।

হাসানকে উপরোক্ত কথাগুলো বলবার প্রয়াস পেলাম। ওকে নাড়া দিতে খুব বেশি দুর্বলতা রয়েছে আমার কথার মধ্যে। কিভাবে বোঝাব, বুঝে উঠতে পারছি না। তবু বোঝাবার চেষ্টা করলাম ব্যগ্রভাবে।

আমার কথাগুলো বুঝতে পারছ না তুমি? এই চিটাগাং শহরে কোথাও না কোথাও ঠিক এই মুহূর্তে একটা ঘর আছে, এবং চাবিটা সেই ঘরেরই। সেই ঘরের ভিতরে একজন মৃত মানুষ না থেকেই পারে না। যদিও আমি জানি না সেটা কোথায়। জানি না, চিনি না লোকটা কে। কিম্বা জানি না, কেন আর কেমন করে ঘটল এমনটি। কিন্তু কোনোই সন্দেহের অবকাশ নেই এতে, সেই জায়গায় আমি উপস্থিত ছিলাম, নিঃসন্দেহে আমি করেছি কাণ্ডটা, তা না হলে অকারণে কেন ঘুমন্ত অবস্থায় আমার মাথায় ব্যাপারটা প্রবেশ করবে?

তুমি দেখছি সত্যি সত্যি মহা ফাঁপরে পড়েছ।

ঠোট কামড়ে চিন্তিত স্বরে বলল এবার হাসান। যোগ করল You need a drink. এসো, কোথাও গিয়ে বসে বরং আলোচনা করে বিষয়টা তোমার সিস্টেমের বাইরে আনার চেষ্টা করা যাক।

হাসান শক্ত করে চেপে ধরল আমার একটা হাত। বললাম: কফি ছাড়া অন্য কিছু নয়। Let's go where the lights are good and bright.

হোটেল এ্যান্ড রেস্টুরেন্ট ডি প্যালেস এ গিয়ে বসলাম আমরা।

আমার মুখোমুখি চেয়ারে বসে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে হাসানই প্রথম কথা বলে উঠল: ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যাপার—এবার যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা যাক। রহমান, স্মরণে তুমি আর একবার বলো তো দেখি?

আমি বললাম আবার।

মাথা নাড়তে নাড়তে হাসান মন্তব্য করল স্বপ্নের ভিতর থেকে কোনো ব্যাখ্যা পাচ্ছি না। যাই হোক, তুমি কি চিনতে মেয়েটাকে বা মেয়েটার মুখটাকে; বা জিনিসটা যাই হোক না কেন—মেয়ে, মেয়েটাকে বা মেয়েটার মুখটাকে; বা জিনিসটা যাই হোক না কেন—মেয়ে, মেয়েটার মুখ বা অন্য কোনো বস্তু যা মেয়ের মতো দেখতে—চিনতে?

আমি টেবিলে আঙুল ঠুকে শব্দ করে বলে উঠলাম—না, এখনও আমি চিনি না, স্বপ্ন দেখার আগেও চিনতাম না। চিনেছিলাম কেবল স্বপ্ন দেখার সময়। ওকে দেখে কেমন যেন মানসিক আঘাত পেয়েছিলাম আমি। যেন, যেন আমাকে ঠকিয়েছে ও, যেন...

হাসান জেরা করল—স্বপ্নে তাকে চিনেছিলে, বলছ। বেশ। স্বপ্নে সে কে ছিল তাহলে?

তা জানি না। স্বপ্নে তাকে জানলাম, চিনলাম। কিন্তু এখন জানি না। চিনি না।

আচ্ছা, মেয়েটা কোনো সিনেমা অভিনেত্রী বা ওই রকম কিছু নয়ত? কোনো সিনেমার পর্দায় বি পত্র-পত্রিকার পাতায় ওই রকম মুখ তুমি দেখে থাকতেও পার। সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না, রহমান। কিংবা, রাস্তা-ঘাটে, মাঠে, পার্কে পলকের জন্যে হয়ত চাক্ষুষ দেখে থাকতে পার মেয়েটাকে। এবং হয়ত মেয়েটার ছবি তোমার অবচেতন মনে ছাপ রেখে গিয়েছিল, ঘুমন্ত অবস্থায় সেটাই স্বপ্নে দেখেছ। এরকম সম্ভবত ঘটতে পারে।

জানি না, আমি জানি না, তেমন কিছু মনে পড়ছে না আমার। কিন্তু, আসলে পরিচিতিবোধটা প্রগাঢ় হয়ে দেখা দিয়েছিল ওকে দেখা মাত্রই। এবং কেমন যেন একটা আঘাত পেয়েছিলাম মনে মনে। কিন্তু এখন পরিচিতিবোধটুকু আর অবশিষ্ট নেই, আঘাত পাবার কোনো যৌক্তিকতাও দেখছি না।

লোকটা সম্পর্কে বল তো আবার?

লোকটা যেই হোক, যে জিনিসই হোক, আমি তার মুখ দেখতে পাইনি। একেবারে শেষ মুহূর্তে হয়ত দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু তখন পাল্লা দিয়ে ধীরে ধীরে খুলে যেতে লাগল, তখন হঠাৎ কেন যেন আশঙ্কা করলাম আমি, অনুভব করলাম আমি যে, ভয়ঙ্কর আতঙ্কজনক কিছু একটা আবিষ্কার করতে যাচ্ছি তার সম্পর্কে। কিন্তু আর সময় পাইনি। ঘুমভেঙে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গেই।

হাসান স্থিরকণ্ঠে প্রশ্ন করল আবার আচ্ছা, এবার বলো দেখি আবার জায়গাটা সম্পর্কে? তুমি বলছ, তোমার আশেপাশে দরজা ছাড়া আর কিছুই দেখনি। এর আগে, অর্থাৎ স্বপ্নের আগে ওই ধরনের কোনো জায়গায় কখনো

গিয়েছ তুমি? কিংবা সিনেমায়, কোনো ম্যাগাজিনের ইলাস্ট্রেশনে দেখেছ? অথবা তোমার পড়া কোনো গল্পে ওইরকম কোনো ঘরের বর্ণনা ছিল বলে মনে পড়েকি? না, না, না!

হাসান হাত নেড়ে যেন সরিয়ে দিল সম্পূর্ণ সমস্যাটা। বলল তাহলে ভুলে যাও, ভুলে যাবার চেষ্টা কর স্বপ্নটাকে। ত্যাগ কর ও সম্পর্কে সবরকম দুশ্চিন্তা। এখন দেখছি আমিও প্রভাতি হয়ে পড়ব বলে সন্দেহ হচ্ছে তোমার মতো। শোনো, গতরাতে কি কি করেছে তুমি—স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন, যা-ই বলো তুমি, দেখার আগে বা ঘটীর আগে?

কিছুই না। রোজ রাতে যা যা করি তাই করেছে। বিশেষ কিছুই না, কোনো নতুন চিন্তা না, কোনো নতুন কাজ না। রোজ যেখানে খাওয়া-দাওয়া সারি সেখানেই খেয়েছি। বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি সন্ধ্যার পরপরই।

হাসান বলে উঠল এখন শোনো রহমান, চাবিটার ব্যাপারে অতি সরল একটা ব্যাখ্যা দেয়া যায়। ব্যাখ্যা এর একটা আছেই, না থেকেই যায় না। এবং সেটা তুমি যা ভাবছ, আল্লাই জানে তুমি কি ভাবছ, তেমন কখনোই নয়। আর যাই হোক না কেন, চাবিটা তোমার কাছে সরাসরি স্বপ্ন থেকে আসেনি। হয় তুমি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এটা দেখতে পেয়েছিলে, এবং এর অদ্ভুত গড়ন দেখে লোভ সামলাতে পারনি কুড়িয়ে নেবার...।

দু'হাতে নিজের মুখ ঢাকলাম আমি। বললাম: না,-না। ওভাবেই নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম আমি সকালবেলা। ফল হয়নি ভাই কোনো। অমন স্বভাব আমার কোনোদিনই ছিল না, নেইও। যদি তাই হতো, তাহলে চাবিটা আমার পরিচিত, অন্তত একটুকু ভুলে যেতে পারতাম না, হয়ত কুড়িয়ে আনার ঘটনাটা ভুলে গেলেও যেতে পারতাম। কিন্তু চাবিটাই যে আমার অপরিচিত। এরকম চাবি, মানে এই চাবিটা জীবনে একবারই দেখেছি আমি। এবং সেটা স্বপ্নে। তার আগে নিঃসন্দেহে দেখিনি।

তার মানে, তুমি বলতে চাইছ, জীবনে কখনো কোনো জিনিস প্রথমবার দেখার পর ভুলে যাওনি, যাও না?

: না, তা বলছি না।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উত্তর দিলাম। আমার উত্তর শুনেও প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল হাসান। বললাম কিন্তু তা সত্ত্বেও জোর করে বলতে পারি, এই চাবিটা স্বপ্নে দেখার আগে আমি দেখিনি, চিনতাম না, চিনার প্রশ্নই ওঠে না। এটাকে আমি কুড়িয়েও আনিনি। এটা সম্পূর্ণ পরিত্যক্তভাবে একটা অজানা, অপরিচিত চাবি আমার কাছে।

হাত নেড়ে হাসান বলে উঠল অধৈর্যভাবে—ঠিক আছে, এই ব্যাখ্যাটা না হয় সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু আরো ডজন ডজন উপায়ে চাবিটা তোমার পকেটে প্রবেশ করতে পারে তোমারই অজ্ঞাতে। হয়ত তুমি কোনো হ্যাঙ্গারে বা সেলফে ঝুলিয়ে রেখেছিলে কোটটা, সেই হ্যাঙ্গারে বা সেলফে ঝুলছিল এই চাবিটা; যেভাবেই হোক নাড়া খেয়ে চাবিটা পড়ে যায়, পড়ে ঠিক তোমার কোটের পকেটেই।

কিন্তু আমার কোটের পকেটে ক্যাপ আছে দেখছ না? চাবিটার কি প্রাণ আছে, বোধ-শক্তি আছে, যে মোড় নিয়ে ঢুকে পড়বে পকেটের ভিতর?

এমনও তো হতে পারে যে, পকেটের ক্যাপটা তখন বাইরে যেমন পড়ে থাকে তেমনি না থেকে ভিতরে ঢুকে গিয়ে ছিল। কিংবা হ্যাঙ্গারের নিচে পড়েছিল চাবিটা। কেউ দেখতে পেয়ে ঢুকিয়ে রেখেছিল তোমার পকেটে, তোমার চাবি মনে করে।

কিন্তু গতকাল অসংখ্যবার পকেটে হাত ঢুকিয়েছি আর বের করেছি। কোথায় ছিল তখন চাবিটা? অসম্ভব। ঘুমুতে যাবার আগে পর্যন্ত ওটা ছিল না। ছিল আজ সকালে। স্বপ্নে দেখার পর ঘুম ভেঙে যেতে পেয়েছি। তার আগে ছিলই না, পাবার প্রশ্নই ওঠে না।

ধরো, তোমার পকেটে চাবিটা ঠিকই ছিল, আসলে কোনো কারণবশত টের পাওনি তুমি। টের পেয়েছ আজ সকালে। দ্যাট উড বিফিজিক্যালি পসিবল।

মেনে নিতে পারলাম না। কেননা হাসানের যুক্তি মেনে নেবার কোনো কারণ নেই। বললাম আমার চাবির সাথেই এটা ছিল। আমার চাবির গোছা গতকাল রাত্রে গুতে যাবার আগেও বের করেছি আমি পকেট থেকে, তখন কোথায় ছিল এটা?

হাসান সত্যি সত্যি থমকে গেছে এতক্ষণ ধরে ব্যর্থ যুক্তি দেখাতে দেখাতে। চুপ করে রইল ও খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে। তারপর বলল: বেশ, ভালো কথা। না হয় স্বীকার করা গেল, চাবিটা তোমার পকেটে গতরাতে গুতে যাবার আগে ছিল না। কিন্তু এতে করে প্রমাণিত হয় না যে, স্বপ্নটা স্বপ্ন নয় সত্যি।

নয়?

চৌচিড়ে উঠলাম প্রায়। বললাম—বরং উল্টোটাই কি সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে না?

শোনো রহমান, এ ব্যাপারে কোনো অসম্পূর্ণ বক্তব্য থাকতে পারে না। এর একটা না একটা যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা থাকতে বাধ্য। হয়ত তুমি স্বপ্নটা দেখেছ, নয়ত দেখইনি। স্বপ্নে নয়, যা ঘটেছে তা বাস্তবে ঘটেছে। ছাব্বিশ বছর বয়েস তোমার, ছেলেমানুষ বলা চলে না তোমাকে। চিন্তা করো না বা ভয় পেয়ো না, তুমি

ভবিষ্যতে সবই বুঝতে পারবে, ব্যাপারটা শুধু সময় সাপেক্ষ। যদি তোমাকে কেউ আঁচড়ে দিয়ে থাকে, যদি সে তোমার গলা টিপে গলায় দাগ বসিয়ে দিয়ে থাকে, এবং তাকে যদি তুমি কুড়ল দিয়ে নিহত করেই থাক—স্বপ্নে যেমনটি ঘটেছে—তাহলে এসব ঘটনাই একদিন না একদিন তোমার মনে পড়ে যাবে। স্বপ্ন যদি দেখে থাক তাহলে চাবিটা তুমি অন্য কোথাও থেকে নিয়ে এসেছ বা অন্য কেউ দিয়ে গেছে, এটা মেনে নিতে হয়। স্বপ্ন থেকে চাবিটা বাস্তবে আত্মপ্রকাশ করেছে, এটা হয় না। সে ক্ষেত্রে তুমি যা দেখেছ তা স্বপ্নে দেখোনি, বাস্তবে করেছে, এবং সে কথা তোমার স্মরণে আসছে না এই মুহূর্তে, পরে আসবে। আমি সেই বহুকথিত কিংবদন্তি মেনে নিতে পারি। কিন্তু তোমারটা তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। লোকে স্বপ্নের ঘোরে বা ঘুমের ঘোরে বিছানা থেকে উঠে হাঁটাহাঁটি করে, শোনা গেছে। কিন্তু এই কিংবদন্তি নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যায়নি কখনো। যে লোক ঘুমের ঘোরে হাঁটে তার সাথে কোনো বস্তুর ধাক্কা লাগা মাত্র সে ঘুম থেকে জেগে ওঠে।

আমি বললাম কিন্তু ঘুমের ঘোরে হাঁটিনি আমি। তাহলে জুতো জোড়া আমার ভিজে থাকত। গতরাতে বৃষ্টি হয়েছে। রাস্তা দুপুর পর্যন্ত ভিজে ছিল। আমি জুতো পরীক্ষা করে দেখেছি।

হাসান গম্ভীর হয়ে উঠল। বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল দেখো দেখি স্মরণ করতে পার কিনা, তা সে যতই তুচ্ছ হোক, যতই অনুল্লেখযোগ্য হোক, গতরাতে তুমি ঘর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও বের হয়েছিলে কিনা, কিংবা কেউ তোমাকে আঁচড়ে দিয়েছিল কিনা, অথবা কাউকে লক্ষ্য করে কিছু ছুঁড়ে মেরেছিলে কিনা।

: না। পরিষ্কার মনে আছে আমার, প্রতিদিনের মতো বিছানায় শুয়েছি। তার আগে কোথাও বের হইনি। বিছানায় শোবার অনেকক্ষণ পর ঘুমিয়েছি এবং শোবার পর বাইরে বের হইনি।

চাবিটা আমার কাছ থেকে নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল হাসান। দিলাম আমি। আলাপের সমাপ্তি টেনে এবার ও বলে উঠল তাহলে যা বললাম তাই। ব্যাপারটা আদৌ ঘটেনি।

আবার যোগ করল হাসান : হয় তুমি নিছক স্বপ্ন দেখেছ, নয়ত সত্যি সত্যি কাজগুলো তুমি নিজে, তুমি স্বয়ং করেছে। দু'টোর একটা। দু'টো একই সাথে সত্য হতে পারে না।

ধৈর্য হারিয়ে ফেলে মাথা নেড়ে আমি শুধু বললাম : এক বিন্দুও সাহায্য করতে পারলে না তুমি।

হাসানসাথে সাথে উত্তর দিল : অবশ্য তুমি যদি চাও, স্বপ্নে একজন মানুষকে হত্যার অপরাধে তোমাকে গ্রেফতার করাটা তোমার কাম্য, তাহলে সত্যিই কোনোরকম সাহায্য করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। স্বপ্নের ভিতরে যে অপরাধ করে তাকে গ্রেফতার করা যেতে পারে স্বপ্নের ভিতরেই। বিচারও হবে স্বপ্নে। সাজা ভোগের ব্যাপারটা, সেটাও স্বপ্নের ভিতরেই ভোগ করানো উচিত।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরোবার সময় আমি বললাম তোমাদের বাড়িতেই রাতটা কাটাব আমি। উজ্জ্বল দিনের বেলা ছাড়া আমি আমার ঘরে ফিরে যাচ্ছি না। রাহেলাকে এ সম্পর্কে কিছু বলো না, কেমন?

বলব না, তোমার যখন ইচ্ছা নয়। কিন্তু আমার কথা শোনো, সব দুশ্চিন্তা ভুলে থাকার চেষ্টা কর। সব ঠিক হয়ে যাবে।

উঁহ, শেষ অবধি দেখব আমি। সন্তুষ্ট হবার মতো কোনো ব্যাখ্যা না পেলে স্বস্তি নেই আমার।

কথাটা বললাম, কিন্তু আমার কণ্ঠের আশাহীনতা অনুভব করলাম নিজেই।

## চার

ঘুম হলো না ভালো। তবে হয়েছে যে কিছুটা এটাই আশ্চর্য। প্রায় ঘণ্টাখানেক তন্দ্রার মতো অবস্থায় কেটেছে। ঘুমোবার একটা প্রতিক্রিয়া থাকে। কিন্তু এক ঘণ্টার ঘুমে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। তবে খুব স্বাভাবিক ভাবেই কেটেছে ঐ এক ঘণ্টা সময়। আর আর দিনের মতোই শুধু পরশুদিনের রাতটা বাদ।

হাসান এল কাপড়-চোপড় বদলে। সোফায় বসল ও। লেপ সরিয়ে বিছানার উপর উঠে বসলাম আমি।

কেমন কাটল?

ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল ও, রাহেলা যাতে শুনতে না পারে।

আর স্বপ্ন দেখিনি। কিন্তু তাতে ইতর-বিশেষ কিছু প্রমাণিত হচ্ছে না। যদি পরিষ্কার, নিঃসন্দেহ ধারণা করতাম যে পরশুরাতে যা করেছি, যা দেখেছি তা স্বপ্নেই করেছি বা দেখেছি তাহলে গতরাতে তোমাদের এখানে থেকে যেতাম না, ফিরে যেতাম নিজের আস্তানায়, এমন কি আবার ভয়ঙ্কর স্বপ্নটা দেখবার আশঙ্কা মনে জাগলেও। কিন্তু এখনও নিশ্চিত হতে পারছি না আমি। যাক, এখন বলো, তুমি কি সাহায্য করতে চাও আমাকে?

আমার দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল হাসান। বলল-কি রকম সাহায্য আশা করো তুমি আমার কাছ থেকে?

কি উত্তর দিতে পারি আমি, সাহায্য আমি চাই বটে, কিন্তু কি রকম সাহায্য? কিছুই যে জানা নেই আমার। সমস্যাটা যে কি, তাই যে ছাই পরিষ্কার নয়। তবু বললাম : তুমি পুলিশ বিভাগের অফিসার। চাবিটা তোমাকে দিয়েছি। বোতামটা আমার ঘরে আছে, সেটাও দেব তোমাকে। তোমার কাজ কি হতে পারে এ বিষয়ে, তা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে কেন? খুঁজে বের করো তুমি চাবিটা আর বোতামটা কোথা থেকে এসেছে। কেন এসেছে।

অধৈর্য হয়ে পড়ল হাসান। রীতিমতো বিরক্তিবোধ করছে ও। আমার প্রতি ওর প্রচুর ভালোবাসা আছে, তাতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু বারবার একই কথা শুনে শুনে এবং আমার সমস্যার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে না পেয়ে নিজের উপরও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে ও। বলল-দেখো রহমান, এবার তুমি বন্ধ করো তোমার স্বপ্নের কথা। বেমালুম ভুলে যাবার চেষ্টা কর সব কথা, শুনছ? তোমার চাবি আর তোমার সেই বোতাম, এ দু'টোর কথা আর শুনতে চাই না আমি। চাবিটা আমার কাছে আছে, আমার কাছেই থাকবে, তুমি আর ওটাকে একবারের জন্যেও দেখতে পাচ্ছ না। এরপরও যদি আবার ঘ্যানঘ্যান করো তাহলে সাহায্য না করে উপায় থাকবে না। যেক্ষেত্রে তোমাকে আমি একজন ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব সাথে করে।

আমি ছোটো একটা আয়না সেল্ফ থেকে তুলে নিয়ে মুখোমুখি ধরলাম। নিজের গলার দাগগুলো দেখলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর হাসানের দিকে তাকালাম।

আমরা দু'জন দু'জনার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলাম। কারো মুখে কথা নেই কোনো। নিস্তব্ধ ঘর। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে না। কথা না বলে তাকিয়েই রইলাম আমি হাসানের দু'চোখের দিকে। আমার এই চিন্তাকুল দৃষ্টি ভাষায় কোনো বক্তব্য পেশ করার চেয়ে ঢের অর্থবহ।

আমার দৃষ্টির অর্থ বুঝতে বাকী রইল না হাসানের। কিছু বলবার জায়গা তৈরি হলো ও। কিন্তু বলা ওর হলো না। রাহেলা নাস্তা সামনে নিয়ে ডেকে উঠল পাশের ঘর থেকে।

নাস্তা শেষ করলাম আমরা। রাহেলা আমার সম্পর্কে কিছুই টের পায়নি। হাসান ওকে কোনো কথা শোনায়নি। কিন্তু হাজার হোক মেয়ে মানুষের মন, কিছু যেন সন্দেহ করছে বলে ধারণা হলো আমার। আমার শরীর খারাপ করেছে কিনা, জানতে চাইল ও বারবার। সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলাম না। উৎকণ্ঠা



বেড়ে গেল ওর তাতে করে। গায়ে-মাথায় হাত দিয়ে দেখল। শঙ্কিত দৃষ্টিতে বারবার তাকার হাসানের দিকে।

হাসান নির্বিকার। অফিসের উদ্দেশ্যে বের হবার প্রস্তুতি নিতে নিতে ঠাট্টা করে রাহেলার শঙ্কা দূর করার প্রয়াস পেল ও-রহমান একটা দেড় হাজার পাতার উপন্যাসের প্লট নিয়ে ভাবছে, নাম করে ফেলবে রাতারাতি।

কাজ হলো। রাহেলা মনে মনে নিজেকে প্রবোধ দেবার মতো একটা কারণ খুঁজে পেল হয়ত এতক্ষণে।

হাসান বেরিয়ে যাবার আগেই বিদায় নিলাম আমি। রাহেলা ছাড়তে চায়নি। কিন্তু আমার দিকে চেয়ে ও বোধ হয় বুঝতে পারল, অনুরোধ করলেও ফল হবে না কোনো।

ওদের বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তায় নামতেই সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল আমার। যেমন হয়েছিল ওদের বাড়ি যাবার আগের সারাটা দিন।

রাস্তায় লোক চলাচলের কমতি নেই। কিন্তু কোনো লোককেই আমারমতো মনে করতে পারছি না। ওরা যেন মানুষ সব, আমি নই। আমি যেন আজব এক জীব। ভীত। আতঙ্কিত। শঙ্কিত। অসুস্থ।

অসহায় বোধ করছি দুর্বলতা চেপে ধরছে। নিজেকে ছাড়া আর কিছু যেন অনুভব করতে পারছি না, আমি নিজে আর আমার নিজের ছায়া।

অনেক ভেবে-চিন্তে একটা দৈনিক পত্রিকা অফিসে গেলাম। বিজ্ঞাপন বিভাগের কর্মচারীদের সাথে আলাপ করলাম একটা বিজ্ঞাপন ছাপার ব্যাপারে। অ্যাডভান্স করলাম দশ টাকা। তারপর ফর্ম নিয়ে লিখতে বসলাম বিজ্ঞাপনটা।

আমি ঠিক যেমনটি ছাপাতে চাই তেমনটি লেখা প্রচুর সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। ডজনখানেক ফর্ম নষ্ট করলাম। মন সায় দিল না, কিন্তু কাজ চলবার মতো হয়েছে বলে বোধ হলো। লিখলাম :

### আবশ্যক

শৌখিন পার্টি কর্তৃক বিশেষ ধরনের কক্ষবিশিষ্ট একটি বাড়ি ভাড়া নিতে বা কিনতে আত্মহী। বিশেষ কক্ষ-বিশিষ্ট অর্থে আটটি আয়না লাগানো দেয়াল আলমারি সম্বলিত কক্ষ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অবস্থান আয়তন ইত্যাদি জরুরি তথ্যসহ সত্ত্বর যোগাযোগ করুন। যোগাযোগের ঠিকানা দৈনিক খবর, বক্স নং ক, ৩২৫১।

প্রথম দু'দিন প্রতিক্রিয়াহীনভাবে কাটল। তবে অবাক কাণ্ড বলা চলে না এটাকে। মনে মনে যুক্তি খুঁজে দেখলাম। কোনো বিজ্ঞাপন একবার মাত্র দেখে

কৌতূহলী বা আগ্রহী হওয়া যায় না। দ্বিতীয় দিন দেখলে বিশ্বাস জন্মাবে। দ্বিতীয় দিন যদি চিঠি লেখে কেউ তাহলে তৃতীয় দিনের আগে সে চিঠি পত্রিকা অফিসে পৌঁছবেই না।

তৃতীয়দিন পত্রিকা অফিসে গেলাম। দু'টো চিঠি পেলাম। একটা হাবিব ওসমানী নামে এক ভদ্রলোকের। রাঙামাটিতে ভদ্রলোকের বাড়ি। তিনি সেটা বিক্রি করতে চান। তাঁর বাড়ির একটি মাত্র ঘর, তিনি স্বীকার করেছেন, আটটি আয়না লাগানো দেয়াল-আলমারি সম্বলিত নয়—চারটি।

বাতিল করা গেল হাবিব ওসমানীর প্রস্তাব।

দ্বিতীয় বাড়িটা চাটগাঁ শহরের উপকণ্ঠে। মালিকের নাম মিয়া মোহসীন। তাঁর ডাইনিং-রুমটা আটটি কাচের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দেয়াল আলমারি নেই বটে, কিন্তু ভদ্রলোকের ধারণা, আমি সেই দেয়াল ঘেরা ডাইনিং-রুম দেখে পছন্দ না করে পারব না।

আটটি আয়না লাগানো দেয়াল-আলমারিসহ একটি ঘর খুঁজছি আমি, আটটি কাচের দেয়ালসহ কোনো কিছু নয়। সুতরাং বাতিল হলো দ্বিতীয়টারও।

চতুর্থ দিনে কোনো চিঠিপত্র পেলাম না।

পঞ্চম দিনে পেলাম আধ ডজন চিঠি। চিঠিগুলো খুলে পড়া শুরু করার আগে একটা চিন্তা জাগল মনে—চিটাগাং শহরে আটটি কাচের দেয়াল আলমারিওয়ালা ঘর আছে এমন বাড়ি এতো বেশি সংখ্যক? চিঠিগুলো খোলার পর অবশ্য চিন্তার গুরুত্ব হারাল। না, অতোগুলো বাড়ি নেই। ছয়টা চিঠির মধ্যে পাঁচটাই লেখা হয়েছে কন্ট্রাক্টরদের তরফ থেকে। প্রস্তাব দিয়েছে, কিস্তিবন্দি টাকার ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা চুক্তিতে আসা সম্ভব হলে তাদের ফার্ম তৈরি করে দিতে পারে পছন্দ এবং আবশ্যিক মতো বাড়ি, বিশেষ ধরনের দেয়াল আলমারিসহ কক্ষ সমেত।

সর্বশেষ চিঠিটা একজন প্রকৃত বাড়িওয়ালা লিখেছেন। ভদ্রলোক একজন সিনেমা অভিনেতা। তিনি লিখেছেন, তাঁর একটি ডেসিংরুম আছে। সেটা আটটি আয়না লাগানো দেয়াল আলমারি নয়, আটটি স্বয়ংক্রিয় আয়নার স্ক্রিন ফিট করা ড্রেসিংরুম। স্ক্রিনগুলো ইচ্ছামতো সরানো যায়। ফলে চার, ছয়, আট বা তারও বেশি কোণ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

ফোন নাম্বার দেখে ডায়াল করলাম ভদ্রলোককে। ভদ্রলোক থাকেন হোটেলে। পাওয়া গেল সময়মতো। কথাবার্তা হলো। নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে নিলাম আমরা। বাড়িটা আমি দেখতে চাই।

পরদিন ভদ্রলোকের হোটেলে গেলাম। চা-টা খাওয়ালেন। তারপর নিজের গাড়ি করে নিয়ে চললেন বাড়িটা দেখাতে।

বাড়িটা শহরের উপকণ্ঠে। অনেকটা গ্রামীণ পরিবেশ। বিরাট নয়, ছোটো-খাটো বাড়ি। নিয়ম রক্ষা করার জন্যে বাড়িটার বহিরাংশ দেখা শেষ করলাম অল্প সময়ের মধ্যেই। তারপর প্রবেশ করলাম অন্দরে। সর্বপ্রথম দেখতে চাইলাম ড্রেসিংরুমটাই।

ভিতরে পা দিয়েই থমকে গেলাম আমি। ধ্বক করে উঠল বুকের ভিতরটা। ড্রেসিংরুমটা বড় বড় আয়নার দেয়াল দিয়ে ঘেরা। গুণে দেখলাম, ছয়টা ভাগে ভাগ করা। ভদ্রলোক বললেন আপনি যদি চান তাহলে আয়নাগুলো আট বা ততোধিক ভাগে ভাগ করে সাজিয়ে দেওয়া যাবে।

ধরাধরি করে তাই করলাম আমরা। ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে অস্ফুটে বলে উঠলাম : না।

ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন না আমার কথা। কিন্তু শব্দটা তিনি শুনতে পেয়েছেন। প্রশ্ন করলেন—কিন্তু আপনি আট কোণ-বিশিষ্ট রুম চান, তাই না? এটা তো এখন আট কোণ বিশিষ্টই।

আমি লক্ষ্য করেছি ইতিমধ্যে যে, আটটি কোণ-বিশিষ্ট আয়নার দেয়ালগুলোর কোনটাতেই এমন কোনো ছিদ্র নেই যাতে একটা চাবি প্রবেশ করতে পারে। বিশেষ করে সেই দিন সকালে যে চাবিটা আমার পকেট থেকে পেয়েছিলাম, সেটা ঢোকান মতো কী-হোল কোথাও নেই। আমার ‘না’ বলার সবচেয়ে বড় কারণ এটাই। কিন্তু ভদ্রলোককে বলা চলে না ব্যাপারটা। তাই বললাম—পরে জানাব আমি আপনাকে।

ফিরে এলাম আমি ভদ্রলোককে নিরাশ করে।

বিজ্ঞাপনটা দৈনিক খবরে নিয়মিত প্রকাশ হতে থাকল। কিন্তু কোনো ফল পাওয়া গেল না আর। অবশেষে বাতিল করে দিলাম বিজ্ঞাপনটা নিরাশ হয়ে।

ইতোমধ্যে হাসান বিজ্ঞাপনটা নিশ্চয় দেখেছিল এবং কাজটা যে আমারই তাও বুঝতে পেরেছিল নিশ্চয়। খবরের কাগজ পড়া কোনো দিনই বাদ দেয় না ও। সারাদিনের কাজের শেষে সন্ধ্যার সময় সবক’টা কাগজ নিয়ে বসে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে সব খবর।

বিজ্ঞাপনটা প্রকাশিত হচ্ছে না দু’দিন থেকে। আজ বুধবার। সকাল।

বেলা দশটায় আমার ঘরে আবির্ভাব ঘটল হাসানের। ওকে দেখেই ধারণা হলো, কোথায় যেন যাবার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছে ও।

বললাম: এসো, বসো।

না।

হাসতে হাসতে দরজার কাছ থেকেই যোগ করল ও-ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি আর রাহেলা গাড়ি নিয়ে সারাটা দিন শহরের বাইরে ঘুরে ঘুরে কাটাতে যাচ্ছি। রাহেলা বুদ্ধিমতির মতো খাবার-দাবার সাথে নিয়েছে মোট তিনজনের মতো।

কারণটা জিজ্ঞেস করলাম। বলল-তোমার কথা স্মরণ করেই ওর এই ব্যবস্থা। তাই, এবং আমি তোমার সঙ্গে পেলো দেদার সিগারেট আর চা পান করার সুযোগ পাব বলে সর্বান্তকরণে কামনা করছি যে, তুমি আমাদের সাথে যেতে আপত্তি করবে না.....।

রীতিমতো বক্তৃতা জুড়ে দেবার ভাবভঙ্গি শুরু করে দিল হাসান। আসলে রাহেলার যতটুকু ইচ্ছা তারচেয়ে কম নয় ওর আমাকে সাথে নিয়ে যাবার। বললাম: দেখো, আমার চার দিকের আবহাওয়া এখনো দূষিত হয়েছে বলে মনে হয় না। বেশ আছি আমি। ঘুরে বেড়িয়ে মুক্ত বায়ু সেবনের মাধ্যমে দূর হবে না আমার সমস্যা। কিংবা ভুলে থাকতে পারব না সেই অদ্ভুত ঘটনার কথা। সুতরাং আমি যাচ্ছি না। ক্ষমাপ্রার্থী হচ্ছি এবং ধন্যবাদান্তে।

এবার হাসান আর বক্তৃতার মহড়া দেবার চেষ্টা পেল না। রীতিমতো বক্তৃতা ঝাড়তে শুরু করল। আর, একজন গুপ্তচর বিভাগের লোক যখন যুক্তিবিদ্যার এবং দর্শনের সাহায্য নিয়ে কাউকে কাবু করার প্রয়াস পায় তখন সে বেচারার অবস্থা অসহায় পশুর চেয়েও করুণ না হয়ে কোনো উপায় থাকে না। আমারও সেই দশা হলো। রাহেলা গাড়িতে বসে আছে আমাদের জন্যে। হাসান নাছোড়বান্দা, আমাকে না নিয়ে একা সে ফিরে যাবে না গাড়িতে। আমার কোটটা হাতে নিয়ে একরকম জবরদস্তি করেই বের করে নিয়ে এল আমাকে ঘরের ভিতর থেকে। নিজেই তালো দিল ঘরের। তারপর আগে আগে হাঁটতে শুরু করল। অগত্যা অনুসরণ করতে হলো ওকে।

শুরু থেকেই জগাখিচুড়ি-মার্কী ঠেকল ওদের প্ল্যানটা। কোথায় যাবে তাই-ই জানে না। তার উপর গাড়ি চালাচ্ছে হাসান নয়, রাহেলা। অন্ধের মতোই অচেনা অজানা রাস্তা দিয়ে চালাতে লাগল ও গাড়ি। গল্পে পেয়েছে হাসানকে ঠিকমতো যে-ক'টা কেস নিয়ে মহা ঝামেলায় দিন কাটছে ওর সেগুলোর প্রত্যেকটা সম্পর্কে পুংখানুপুংখ জ্ঞান অর্জন হলো আমার।

রাহেলা সমস্যাটা বুঝতে পেরেছিল বেশ খানিকক্ষণ আগেই। প্রায় পাঁচ-ছয়বার ঘাড় ফিরিয়ে জানতে চেষ্টা করেছে সে। এবার কোনদিকে যাওয়া যায় বলো তো? সামনে দেখছি বহুদূর বিলম্বিত পিচকারী পথ, বাঁ-দিকেও তাই, ডানে সরু একটা গলি। কোনদিকে গেলে ভালো হয়?

আমরা ওর কথার গুরুত্ব বুঝতে পারিনি। আমরা নয়, আমি। হাসানেরই গুরুত্ব দেবার কথা। আমি তো নিজীব, বলা চলে প্রাণহীন। রাহেলার কথা শুনছিলাম অর্থাৎ কানে আমার কথাগুলো প্রতিবারই ঢুকছিল, কিন্তু মনোযোগ দিছিলাম না। মনোযোগ দেবার কথা হাসানের। কিন্তু ও মশগুল গল্প করতে। গল্প করা আর হলো না, রাহেলা সজোরে ব্রেক কষে দাঁড় করিয়ে ফেলল গাড়ি। তারপর নাকি স্বরে বলে উঠল : এবার? সামনে যে রাস্তা নেই?

এবার গল্প বাদ দিয়ে হাসান আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকাল সামনের দিকে। ধীরে ধীরে বিস্ময়ভাবে ফুটে উঠল ওর চোখে। বলল : আরে, এ কোথায় এসে পড়েছি আমরা! সামনে পাহাড়, আর তো যাওয়া যাবে না! ঘোরাও, গাড়ি ঘোরাও।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিল রাহেলা। আবার ফিরতি পথে চালাল গাড়ি। গল্প নতুন করে শুরু করার কোনো প্রবণতা আর দেখা দিল না হাসানের মধ্যে। এদিক-ওদিক চোখ ফেলে জায়গাটার পরিচয় জানার চেষ্টা করছিল ও। মিনিট তিনেক পর রাস্তার তে-মাথায় এসে পড়ল গাড়ি। রাহেলা জিজ্ঞেস করল কোনদিকে যাব এবার?

হাসান পাল্টা প্রশ্ন করল যে রাস্তা দিয়ে এসেছি সে রাস্তা দিয়েই আপাতত এগোনো যাক। চেনা রাস্তায় না পড়া অবধি কোনদিকে যাব বুঝব কেমন করে?

রাহেলা শঙ্কিত কণ্ঠে বলল : কিন্তু তিনটে রাস্তার কোনটা দিয়ে এসেছি, ভুলে গেছি যে?

সর্বনাশ! করেছ কি!

আঁতকে উঠল হাসান। চঞ্চল চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে আবার বলে উঠল : মানুষজনের দেখা নেই, এ জায়গার নাম কি ছাই। কোনদিন এসেছি বলে তো স্মরণ হয় না।

ঘড়ি দেখল ও। রাহেলা ছেলেমানুষের মতো উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বলল : অচেনা জায়গা বটে, কিন্তু আর সব চেনা জায়গার মতোই ঠেকছে আমার চোখে। উফ্, আমার কিন্তু ভয় লাগছে না...হারিয়ে যাবার দারুণ একটা আনন্দ আছে, তাই না?

হাসান বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে রাহেলার আনন্দে বাদ সাধার চেষ্টা পেল : তোমার আনন্দ হচ্ছে, না? ঝাড়া এক ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে এই অপ্রিচিত, নির্জন জায়গায় নিয়ে এসেছে। ফিরতে লাগবে কমপক্ষে চারগুণ সময়। আজকের সারাটা দিনের প্রোগ্রামই মাটি করে দিলে!

রাহেরা উত্তর দিল আমার দোষ দিচ্ছ কেন? বারবার করে জিজ্ঞেস করেছি, কোন্‌দিকে যাব। উত্তর দাওনি, গল্পে মেতেছিলে কিনা। এখন সামলাও।

হাসান আমার দিকে ফিরে জানতে চাইল চুপ করে আছো কেন হে, চেন নাকি এলাকাটা? ছবি আঁকতে তো বহু জায়গা ঘুরতে হয় তোমার?

না ভাই, এদিকে কখনো এসেছি বলে তো মনে পড়ছে না।

আমার উত্তর শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল রাহেলা। রাস্তার উপর থেকে পার্শ্ববর্তী মাঠের দিকে চালিয়ে দিল ও গাড়ি। মাঠের উপর থামানো হলো গাড়ি। উচ্ছল হাসিতে লুটিয়ে পড়তে পড়তে রাহেলা নামল গাড়ি থেকে। নামল হাসানও। আমার দিকে তাকিয়ে ও বোকার মতোই জানতে চাইল আচ্ছা, এতো হাসবার কি আছে, বলো দেখি?

রাহেলা আমাকে চুপ করিয়ে দিয়ে বলে উঠল এই জায়গা আমাদের তিনজনেরই অপরিচিত। অর্থাৎ আমরা সত্যিসত্যি হারিয়ে গেছি।

হাসিটা সংক্রামক। রাহেলার হাসির কথা বলছি। হাসান আর গাঙ্গীর্ঘ বজায় রাখতে পারল না। হাসতে হলো আমাকেও।

আমাদের হাসি ফুটতেই নিভে গেল রাহেলার মুখের হাসি। খাবারের আয়োজনে লেগে গেল ও। সব তৈরি করা খাবার। ঝামেলা একেবারে হলো না। ফ্লাস্কের গরম কফি দিয়ে আহর-পর্ব সমাপ্ত করা হলো। সিগারেট ধরালাম আমরা। হাসি-ঠাট্টা চলল কিছুক্ষণ। কফি হলো আবার একবার। সিগারেটও।

দ্বিতীয় পালার সিগারেট শেষ হবার আগেই বেজে গেল চারটের মতো। এবং চারটে বাজার সাথে সাথেই প্রায় আকাশে মেঘের আকস্মিক ঘনঘটা দেখা দিল।

শীতকাল। এরকম মেঘ করা সচরাচর দেখিনি। মেঘ তো করেছেই, সেই সাথে ঝড়ের পূর্বাভাস দামাল বাতাসের ঝাপটায়। শঙ্কিত বোধ করলাম। বৃষ্টি না এসেই পারে না। তার আগে আমাদের অবস্থা কাহিল। শীতে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছি।

ড্রাইভিং-সিটে বসল এবার হাসান স্বয়ং। ফিরতি পথে শুরু হলো যাত্রারম্ভ। কিন্তু ফিরছি কি ফিরছি না, বোঝা মুশকিল। রাস্তা চেনা মনে কোন্‌দিকে এগোচ্ছি, খোদা মালুম।

গাড়ি বেশ জোরেশোরেই চালাচ্ছে হাসান। রাহেলাকে একঘরে করা হয়েছে শান্তিস্বরূপ হাসানের পাশে বসেছি আমি। রাহেলাকে পাঠানো হয়েছে পিছনের সিটে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছি মাঝে মাঝে ওর দিকে। হাসির ছিটেফোঁটাও নেই এখন ওর চোখে-মুখে। ভয় পাবার পূর্বাভাস, মূখ থমথমে।

বৃষ্টি শুরু হবার আগেই বজ্রপাতের শব্দ শোনা যেতে লাগল। তার পরপরই শুরু হলো বৃষ্টি। সেই সাথে প্রবল গতিশীল বাতাস। স্পিড কমিয়ে দিল হাসান। সামনের দিকটা পরিষ্কার দেখতে অসুবিধে হচ্ছে। এখনও নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞাত আমরা।

আশপাশে কোনো বাড়ি-টাড়ি দেখতে পেলে সেদিকেই নিয়ে যাও।

রাহেলা ভীত কণ্ঠে যোগ করল : এই ঝড়-বৃষ্টি, বজ্রপাতের মধ্যে গাড়ি না চালানোই ভালো। বিপদ একটা ঘটবেই।

হাসান বলে উঠল : আমি উইন্ড-শীল্ড দিয়েও দেখতে পাচ্ছি না কিছু।

কাচের সামনে ঝুঁকে পড়ে রাস্তা দেখার চেষ্টা করছে ও।

পাশের দু'ধারের রাস্তার দিকে চোখ ফেললাম আমি। বা পাশে একটা পানির ট্যাঙ্ক। তার পাশেই পেট্রল-পাম্প একটা। পর পর তিনটে বটগাছ—ডানদিকে। তারপর একটা ছোটোমতো মাঠ। মাঠের মাঝখানে শিমূলগাছ বেশ কয়েকটা।

আমি হাসানের উদ্দেশ্যে বলে উঠলাম আরো খানিকটা এগিয়ে গেলে বাঁ দিকে একটা গলি মতো পাবে, হাসান। ওই গলি দিয়ে গেলে, বেশ খানিকটা যেতে হবে, দেখতে পাবে বিরাট এক বারান্দাওয়ালা বাড়ি। আমরা আশ্রয় নিতে পারি ওখানে ঝড়-বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত।

ওরা দু'জন প্রায় একই সাথে প্রশ্ন করে উঠল অবাক কণ্ঠে।

হাসান জানতে চাইল : কিভাবে জানলে তুমি?

রাহেলা জিজ্ঞেস করল : তুমি কি এদিকে আগে কখনও এসেছ?

হাসানের প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। ওর প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। রাহেলার প্রশ্নের উত্তরে বললাম : না।

এবং আমার উত্তরটা মিথ্যে নয়।

হাসান একটু পর বলে উঠল এমনিতে কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছি তার মাথা-মুণ্ড বুঝতে পারছি না কিছু, তার ওপর তুমি আবার গলি-টলির ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে আরো গোলমালে করে ফেলবে না তো?

না, থেমো না তুমি, এগোতে থাক।

আমি আশ্বাস দিয়ে যোগ করলাম আবার : সরু মতো গলিটা তুমি পাবেই। গলিটার দু'পাশে, গলির মাথায় আর কি, দু'টো ল্যাম্প-পোস্ট আছে...দেখলেই চিনতে পারবে।

হঠাৎ চুপ করে গেলাম, যেমন হঠাৎ কথা বলতে শুরু করেছিলাম। কারণটা আর কিছু নয়, হাসান ঘাড় ফিরিয়ে অদ্ভুত এক নিমিষ দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে স্বগতোক্তি করলাম আমি : খোদা! জানি না, আমি জানি না কেমন করে জানভে পারছি এসব কথা...।

মাঝ পথে থেমে গেলাম।

হাসান একেবারে চুপ মেরে গেছে। নিশ্বাসও বুঝি নিঃশব্দে ফেলছে, শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। আমার ধারণা হলো, ও বুঝি ভাবছে আমার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে প্রমাণিত হবে। নিশ্চয় সামনে কোনো গলি নেই।

রাহেলা আমাদের দু'জনার কাঁধের মাঝখান দিয়ে মাথা গলিয়ে দিয়ে ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। হঠাৎ চোঁচিয়ে উঠল ও : ওই তো ল্যাম্প-পোস্ট, দু'টোই তো। বাহ বা, রহমান দেখছি গুণতে শিখেছ!

গাড়ি মোড় নিল। গলির ভিতর ঢুকে গেলাম আমরা। একটা শব্দও উচ্চারণ করল না হাসান। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ও শুধু তাকিয়ে আছে আমার দিকে। রিয়ার-মিররের দিকে যতবার তাকাছি ততবারই দেখছি, ওর চোখ জোড়া আমার চোখের দিকে চেয়ে আছে স্থিরভাবে। যেন পাথরের চোখ—নিম্পলক।

এক মিনিট কেটে গেল। দেখা দিল বাড়িটা। বিরাট বড় বাড়ি। ছাদওয়ালা প্রকাণ্ড বারান্দা বাড়িটার সম্মুখে। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে সেই বারান্দার সামনে গিয়ে দাঁড় করালো হাসান গাড়ি।

গাড়ি থেকে নামার আগে রাহেলা প্রত্যেকের হাতে কিছু কিছু জিনিস-পত্র দিল। ফ্লাস্ক আর বিস্কুটের টিন পড়ল আমার ভাগে। ছুটলাম আমি গাড়ি থেকে নেমে। বারান্দা আর গাড়িটার মধ্যবর্তী স্থানটুকুতে কোনোরকম আড়াল নেই, ফলে ভিজতে হলো সামান্য। হাসান ও রাহেলাও ভিজে ভিজে এল বারান্দাটার উপর।

আমার সর্বশরীর হিম হয়ে আসছে। বৃষ্টির ফলে নয়, এমনিতেই। কপালের জল মুছে ফেলেছি, তা সত্ত্বেও বিন্দু বিন্দু জল জমে উঠছে কপালে। জল নয়, ঘাম। ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দিতে শুরু করেছে আমার কপালে। শুধু কপালে বললে অসম্পূর্ণ হবে, ঘাম দেখা দিয়েছে আমার সারা শরীরেই।

বারান্দাটা জরিপ করে নিলাম আমরা মিনিটখানেকের মধ্যেই। বৃষ্টির ছাঁট আর বাতাসের ঝাপ্টা থেকে পুরোপুরি রক্ষা পাবার উপায় নেই। ঠকঠক করে কাঁপছে রাহেলা। হতবাক চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে হাসান স্বর্ণে স্বর্ণে। ওর সে দৃষ্টির অর্থ আমার কাছে অতি পরিচিত। ঠোট দু'টো সজোরে কামড়ে ধরে উত্তেজনা, আতঙ্ক দমন করে আছি আমি। রাহেলা শীতের কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠল : কোনো ঘরের ভিতরে ঢোকবার চেষ্টাকরলে হুজু!

হাসান বলে উঠল বসতে পেলো শুতে চাও দেখছি। ঘরে ঢুকবে কেমন করে, দেখছ না তালা মারা দরজায়?



জানালার পাশে ওই লম্বাপানা বাক্সের ভিতরে চাবি আছে।

বলে ফেললাম আমি।

চমকে উঠল হাসান। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। লম্বাপানা একটা কাঠের বাক্সের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিল। কাঁপছে ওরা হাতটা খরখর করে। দেখতে দেখতে বের করে আনল চাবিটা।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে মর্মর-মূর্তিতে পরিণত হলো হাসান। বিমূঢ় হয়ে পড়েছে ও। আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে বিস্ফারিত চোখে। অসহায় ভঙ্গিতে বোবার মতো তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। আস্তে আস্তে একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। কী-হোলে চাবিটা ঢুকিয়ে ঘোরাতে লাগল। হাতটা ওর কাঁপছে সজোরে।

খুলে গেল দরজা। ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে আবার দেখল হাসান।

ঘরের ভিতরে ঢুকলাম আমি সকলের শেষে টলতে টলতে, আচ্ছন্নের মতো।

আমাদের চারদিকে সন্ধ্যা সমাগতকালীন আবছা আবছা অন্ধকার। অথচ সময়টা এখন বৈকাল মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি বদলে ফেলেছে দিনের মৌলিক চেহারাটা। দেখলাম, রাহেলা দরজার ডান দিকের বোর্ডে আঙুল ঠেকিয়ে সুইচ খুঁজছে। বললাম না না, ওটা নয়। তুমি যে বোর্ডে হাত রেখেছ তাতে হলের বাতির সুইচ নেই। বারান্দার বাতির সুইচ অবশ্য আছে। বাঁ দিকে দেখ হলের বাতির সুইচ-বোর্ড আছে।

হাসান দরজার বাঁ দিকের পাল্লাটা ভেজিয়ে দিল। সুইচ-বোর্ড দৃষ্টিগোচর হলো এবার, এতক্ষণে আমরা বোর্ড দেখতে পাচ্ছিলাম না। হাত বাড়িয়ে দিয়ে সুইচ অন করল হাসান। জ্বলে উঠল আমাদের কয়েক গজ দূরে মাথার উপর উজ্জ্বল ইলেকট্রিক বাতি।

রাহেলা সম্ভবত আমার কথার যথার্থতা পরীক্ষা করার মানসেই ডান দিকের বোর্ডের সুইচটা টিপে দিল। জ্বলে উঠল বারান্দার আলো। আবার অফ করল সুইচ। অন্ধকার হয়ে গেল বারান্দা। দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল ও আমার দিকে মুখ করে। প্রায় চোঁচিয়ে উঠেই প্রশ্ন করল : ব্যাপার কি বলো তো? এতো কখনো তুমি জানলে কিভাবে এই জায়গা সম্পর্কে?

হায়, রাহেলা! তুমি বাস করছ তোমার শান্ত, স্বাভাবিক, সুস্থ পৃথিবীতে।

রাহেলা দৃষ্টি বিনিময় করল হাসানের সাথে। হাসান বলে উঠল আন্দাজী ভবিষ্যদ্বাণী করার ব্যাপারে রহমান দেখছি সার্থক সৌভাগ্যবান।

হাসান চায়, রাহেলা রহস্যটা সম্পর্কে কিছু যেন না জানতে পারে।

আলো জ্বলে উঠতে দেখলাম, বিরাট বড় এবং সজ্জিত একটা হল-ঘরে অবস্থান করছি আমরা। এক পাশ দিয়ে উঠে গেছে সুদৃশ্য সিঁড়ি। রেলিং দিয়ে দু'ধার ঘেরা। দামী সেগুন কাঠের রেলিং।

রাহেলা এদিক-ওদিক চোখ ফেলতে ফেলতে বলে উঠল হল-ঘরের অটোমেটিক তালা তো ভিতর বার দু'দিক থেকেই খোলা বা বন্ধ করা যায়। বাড়ির ভিতরে মানুষ জন থাকতেও পারে, কি বল?

হাসান সিঁড়ির উপরপানে তাকিয়ে জোর গলায় ডাক ছাড়ল বাড়িতে কেউ আছেন কি?

তিন-চার বার ডাকা হলো। নেই কেউ। সাড়া পাওয়া গেল না কোনো। হাসানের প্রতিবারের ডাকার পরপরই রুদ্ধ কণ্ঠে আমি বলে উঠলাম অমন করো না, হাসান।

আমার কথায় কান দেয়নি ও। নিরাশ হতে হলো ওকে অবশেষে। রাহেলা আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল : তোমাকে শীতে কাবু করে ফেলেছে? জোরে শোরে কাঁপছ যে?

হলঘর থেকে একটা বেডরুমে গিয়ে ঢুকল ও। আমি আর হাসান দু'জনাই খোলা দরজা দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু পা বাড়লাম না। আমাদের মাথার ভিতর এই মুহূর্তে অন্য এক চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। রাহেলা গরম কোনো জায়গা বা তেমনি কিছু একটা খুঁজছে প্রচণ্ড কনকনে শীতের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। বেডরুমের পাতা কার্পেট দেখতে পাচ্ছি। আর সব আসবাবপত্র রাখার মাধ্যমগুলো খালি করা। সব জিনিসপত্রই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। খোলা আলমারি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তাকে জিনিসপত্র কিছু নেই। আসবাবপত্র স্থানান্তরিত করা হয়েছে সাময়িকভাবে, বোঝা যায় পরিষ্কার। পিয়ানো, সোফাসেট এবং চেয়ারগুলোর গায়ে ধুলোর আন্তরণ জমে আছে।

কোনো ডাকার বা বড় অফিসারের বাড়ি বলে মনে হয়।

রাহেলা সবজাতার ভাব বজায় রেখে বলে উঠল আবার : সম্ভবত রুদ্ধ হয়ে গেছেন অন্যত্র, তাই এমন ধূলো জমেছে। কিন্তু তালা-চাবির ব্যবস্থা মোটেই নিরাপদ নয়। ইলেকট্রিসিটিও চালু। আশ্চর্য বটে। তুমি পুলিশের লোক বলে বাঁচোয়া, তা না হলে এমনভাবে বিনা অনুমতিতে কারো বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়লে সমূহ বিপদের আশঙ্কা।

ঘরের ভিতর কোথাও থেকে বৈদ্যুতিক চুলো স্রাবিকার করে চেষ্টা করে উঠল রাহেলা পরক্ষণেই। প্লাগ লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিল সেটা। হাত-পা গরম করার

জন্মে এরচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা আপাতত কল্পনাতিত। সাময়িকভাবে ও আমাদের উপর থেকে মনোযোগ হারিয়ে ফেলল।

হাসানের দিকে তাকালাম আমি। পরপরই পিছিয়ে এলাম দরজা দিয়ে। সিঁড়ির দরজা অতিক্রম করে ধীরে ধীরে উঠে যেতে শুরু করলাম উপর পানে। নিঃশব্দে।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, হাসানও পিছিয়ে এসে দরজা অতিক্রম করছে আমার মতো। আমারই মতো নিঃশব্দে। নড়তে চড়তে ভয়ানক স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছি। আমরা দু'জনাই।

একটা বেডরুমে ঢুকলাম উপর তালায় উঠে। নিচের তালার মতোই অন্তঃসারশূন্য। মধ্যবর্তী দরজা অতিক্রম করে দু'মুখো বাথরুমে পৌঁছলাম। সেটা ছেড়ে প্রবেশ করলাম আর একটা বেডরুমে। দ্বিতীয় দরজা অতিক্রম করে তৃতীয় বেডরুমে পা দিলাম। সম্মুখস্থ উন্মুক্ত দরজা-পথে আমি দেখতে পাচ্ছি হলওয়ার বহিরাংশ। অপর একটা দরজা-পথে নির্বাধায় আমি দেখতে পাচ্ছি নিজেকে-আমাকে। আমার প্রতিচ্ছবিকে।

তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করল আমাকে সিমেন্ট করা মেঝে। অস্বস্তি-ভরা আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে উঠলাম। মর্মর-মূর্তির মতো জড় পদার্থে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু এগিয়ে যেতে হবে আমাকে। যেতেই হবে। পা উঠালাম।

এগিয়ে এসেছি। কাছে চলে এসেছি। ঝুঁকে পড়ে পা বাড়াচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি এক নম্বর আমাকে। দু'নম্বর আমাকে। তিন নম্বর আমাকে। চার, পাঁচ, ছয়, এবং সাত নম্বর আমাকে। দরজা পেরিয়ে এসেছি এখন আমি। দরজাটা চওড়া দেয়ালের সাথে চমৎকারভাবে খাপে খাপে মেলানো। দু'টো পাল্লাই আপনা-আপনি বন্ধ করে দিল দরজাটা আমার ধাক্কায়। সেই সাথে ঘাড় বাঁকিয়ে ভেজানো দরজার দিকে তাকালাম। দেখতে পেলাম আট নম্বর আমাকে। দরজার পাল্লায় নিখুঁতভাবে লাগানো আয়নায় আপাদমস্তক প্রতিবিম্ব।

থরথর করে কোঁপে উঠলাম আমি। বিস্তৃতকিমাকার হয়েছে আমার অবয়বের চেহারা। মাথার ভিতরে শুরু হয়েছে প্রচণ্ড প্রলয়কাণ্ড। টলে টলে পড়ে যাচ্ছিলাম— নয় নম্বর আমি।

হাসানের পদশব্দ সৃষ্টি হলো আমার পিছনে। সেই সাথে লক্ষ্য করলাম, আমার আট নম্বর প্রতিবিম্ব অদৃশ্য হয়ে গেল দরজার পাল্লা দু'টো দু'ফাঁক হবার সাথে সাথেই। এই মুহূর্তে সাতটি প্রতিবিম্ব। শুনতে পেলাম আমারই বিমূঢ়, কম্পিত, অস্ফুট আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর : এই সেই জাফিয়া! খোদার কসম ভাই, এই সেই জায়গাটা। ভুল হতে পারে না।

হঁ।

গলার ভিতর থেকে ছোট্ট একটা শব্দ বেরিয়ে এল হাসানের। এক মুহূর্তের অস্বস্তিকর নীরবতা। হাসান বলে উঠল আবার কপালের ঘাম মুছে ফেল, রহমান। তুমি শান্ত হবার চেষ্টা...।

কি ভেবে জানি না, হয়ত কথা বলতে ভীষণ ভয় লাগছে বলে অথবা কিছু একটা করে অস্বস্তি দূর করার জন্যে আন্তিন দিয়ে মুছে ফেললাম কপালের ঘাম। আমি বা হাসান কেউই এ-ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছি না এই মুহূর্তে।

তোমার সঙ্গে সেটা আছে, না নেই?

হাসান জানে আমার কথার অর্থ। মাথা কাত করল ও। সেটা 'হ্যাঁ' কি 'না' তা বোঝার মতো সচেতনতা ইতিমধ্যে খুইয়ে বসেছি আমি।

হাসান পকেটে হাত ঢোকাচ্ছে দেখে শিউরে উঠল আমার সর্ব-শরীর। পকেট থেকে ওর নিজের চাবির গোছাটা বের করে আনল ও। ওর চাবিগুলোর মধ্যে থেকে সেই চাবিটা খুঁজে বের করল ও। সেই চাবিটাই। সেই অত্যাশ্চর্য, অদ্ভুত চাবিটাই। পাশাপাশি তিনটে গোল রিং এর মাথার দিকটায়।...এই ধরনের চাবি, আমার মনে হয়, খুব কম তৈরি হয় এবং খুব কমই ব্যবহার করা হয়।

দরজা মাত্র একটা। যে দরজাটা দিয়ে ঢুকেছি আমরা। অবশিষ্ট সাতটার মধ্যে চারটেই এক একটা ড্যামি, নগ্ন ওয়াল-প্লাস্টারের সাথে আঁটা সু-আকৃতি বিশিষ্ট আয়না। খুব সহজেই বোঝা যায় ব্যাপারটা, কেননা চারটির কোনোটাতেই কী-হোল নেই। প্রতিটিই চারটে কোণকে বিভক্ত করে সুষমভাবে অবস্থান করেছে।

বাকি থাকে তিনটে।

হাসান তিনটির একটির কী-হোলে প্রবেশ করাল চাবিটা। সুষ্ঠুভাবে, সহজে প্রবেশ করল সেটা। যেন চাবিটা তৈরিই করা হয়েছে এই কী হোলের জন্যে এবং মাপে। কাঠের ফ্রেমের পিছন থেকে ভেসে এল একটা শব্দ-ক্লিক। খুলে গেল আয়না ফিট করা দরজা।

আমার মেরুদণ্ড বেয়ে খেলে গেল ভয়ের শিহরন। শূন্য মনে হলো তলপেটের ভিতরটা।

ভিতরে কিছু নেই। আয়না লাগানো দেয়াল আলমারিটা শূন্য। বাকী থাকে দু'টো।

রাহেলার বিরজিকর কণ্ঠস্বর উঠে এল নিচে থেকে : কি কাজে মেতেছ শুন তোমরা ওপরে?

রাহেলা জানে না, আমরা কোন্ জগতে বিচরণ করছি। বলে উঠলাম হাসানের উদ্দেশ্যে : ওকে খানিকক্ষণ অন্তত নিচেই রাখতে হবে, হাসান।

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে আমার। রাহেলার কাছ থেকে সবটুকু ব্যাপার লুকিয়ে রাখতে মনস্থ করেছিলাম কেন সে কথা এই মুহূর্তে স্মরণে নেই। কিন্তু মনে হচ্ছিল, ওকে কিছু না জানতে দেয়াই ভালো। মেয়েলোক বলেই সম্ভবত।

হাসান রাহেলার উদ্দেশ্যে হাঁক ছেড়ে বলল একটু অপেক্ষা কর, রহমান ওর প্যান্টটা গুতোতে চেপ্টা করছে।

রাহেলা উত্তরে বলে উঠল : ক্ষিদে পাচ্ছে যে আমার? জলদি এসো তাহলে।  
আচ্ছা।

রাহেলা সংক্রান্ত ঝামেলা চুকিয়ে দ্বিতীয় কী-হোলে চাবি প্রবেশ করালো হাসান। আমি ভাবছি, কামনা করছি সর্বান্তকরণে, 'ক্লিক' শব্দটা আর শোনা যাবে না। কিন্তু শব্দটা ঠিকই হলো। আমার কানেও তা পশল। এবং পরক্ষণে চোখ দুটোর পাতা শক্ত করে বন্ধ করে ফেললাম মৃত্যুস্পর্শী আতঙ্কে।

চীৎকার করেই বলা যায়, কিন্তু চাপা এবং আতঙ্কিত, উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে হাসান উচ্চারণ করল : দেখো!

চীৎকারের শব্দে চমকে উঠে চোখের পাতা খুলে গেল আমার। দেখলাম, খোলা দেয়াল-আলমারির ভিতর ঠিক মধ্যখানে কালো কি যেন একটা বস্তু। পরমুহূর্তের জন্যে আমি ভাবলাম...

জিনিসটা একটা ভাঙা আয়রণ-সেফ। রঙটা কালো, কিন্তু শুধু-মাত্র ডায়ালটার রং এখনো অবশিষ্ট দেখা যাচ্ছে। ভাঙা হয়েছে, না বলে বলা চলে কাটা হয়েছে। ফলে খাঁজ খাঁজ কাটার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

এটার আড়ালেই সে মাথা নুইয়ে ছিল প্রথম দিকে...সেই রাতে, তখন তাকে কাদার পিণ্ড বলে ভুল হচ্ছিল আমার।

নিজের স্বর শুনতে পেলাম আমি। আবার যোগ করলাম : এবং তার সামনে মেঝেতে নিশ্চয়ই একটা টর্চ ছিল। যার ফলে নীলচে আলোর সৃষ্টি হয়েছিল। এবং সেই মেয়েটার মুখে নীলচে আলোর প্রতিফলনে সৃষ্টি হয়েছিল অদ্ভুত একটা দৃশ্য, যেন মুখোশ পরিহিতা দেখাচ্ছিল তাকে।

থরথরিয়ে কেঁপে উঠল আমার ঠোঁট জোড়া। আমি পুনর্বার নিজস্ব কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম : এবং হাসান, হাসান ভাই, ঐ দেয়াল-আলমারিটা, একমাত্র যেটা অবশিষ্ট রয়েছে, যেটা এখনো তুমি খুলে দেখোনি, নিশ্চয়ই ওটাতেই তার লাশ ঢুকিয়ে রেখেছি আমি...

সিধে হয়ে দাঁড়াল হাসান এবং তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়াল। পা বাড়াল ও দৃঢ়ভাবে সেটার দিকে। যেন কথাগুলো বললাম ওর মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যেই। কিন্তু তা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।

ভীষণ তৃষ্ণা পেয়েছে আমার। ককিয়ে উঠে করুণ স্বরে অনুরোধ করলাম: কথা শোনো হাসান, থামো। এখন না। একটুখানি সময় দাও, আমাকে সুযোগ দাও একটা।

বাজে বকো না!

বিরজিভরা কণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠল হাসান, আমার হাতটা সরিয়ে দিল ঝাড়া দিয়ে। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ও চাবিটা ঢুকিয়ে দিল কী-হালের অভ্যন্তরে, তারপর বাঁ দিকে ঘোরাল। দরজা পাল্লা দু'টো ফাঁক হয়ে ভিতর দিকে ক্রমশ সরে সরে যেতে লাগল। উনুজ হচ্ছে দরজা। ধড়ফড় করছে, ছটফট করছে আমার বুকের মাঝখানটা।

হাসান দরজাটার একপাশে, অন্যপাশে আমি, মাঝখানে দরজাটা, হাতের ঠেলা দিয়ে পুরোটা খুলে ফেলল ও।

আমার চোখ দু'টো আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেছে।

নেই!

আমার অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তর দিল হাসান। চোখ মেলে তাকলাম। দেয়াল-আলমারিটার ভিতর থেকে গড়িয়ে কোনো কিছুই পড়েনি মেঝের উপর। না, একটা খড়-কুটোও পড়েনি। অথচ ভিতরে কিছু নেই-ও। একেবারে ফাঁকা। খালি। শূন্য। কিছুই নেই!

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল হাসান। দেয়াল-আলমারির গহ্বরস্থ চতুষ্পার্শ্বে জ্বলন্ত কাঠিটা ওঠাতে নামাতে লাগল ও, যদিও বৈদ্যুতিক আলো রয়েছে আমাদের পিছনে। কিন্তু বাল্বটা খুব কাছে নয় বলে পরিমাণ মতো আলোর অভাব দেখা দিয়েছে। দেশলাইয়ের কাঠিটা যখন হাসানের হাতে স্থির হয়ে জ্বলতে লাগল ঠিক তখনই প্রথম দৃষ্টিগোচর হলো দাগটা। অনুজ্জ্বল, অস্পষ্ট, পুরনো দাগ। বলে দেবার দরকার পড়ে না ওটা কিসের দাগ হতে পারে। পুরনো রক্তের দাগ, নিঃসন্দেহে। দেয়াল আলমারির গহ্বরস্থ কাঠের রং যেখানে হালকা মতো সেখানে রক্তের প্রকৃত বর্ণ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল, স্পষ্ট কিন্তু খুব বেশি নয় পরিমাণে। একটা লাশের পিঠের ক্ষতস্থানের রক্ত শাট ভিজিয়ে দিয়ে ছাপ মেরেছে মসৃণ কাঠের গায়ে।

হাসান মেঝেটাও দেখল, কিন্তু মেঝেতে রক্তের দাগ পাওয়া গেল না।

নিভে গেল দেশলাইয়ের কাঠিটা। মিলিয়ে গেল রক্তের দাগ।

আহত কোনো লোক ছিল এর ভিতরে।

টোক গিলে, কপালের ঘাম মুছে ফিসফিস করে বলে উঠল হাসান।

নিহত কোনো লোক ছিল।

কেঁপে উঠে সংশোধন করলাম হাসানের কথাটা।

## পাঁচ

অবশেষে নামতে হলো নিচে। রাহেলার জ্বরদন্তি।

খাবার-দাবার কেন যে সাজিয়েছে ও, বুঝতে পারলাম না। দুপুরের আহার-পূর্ব তো সমাধা হয়েই গেছে। এখন হয়ত বিকেল। কিন্তু আহার্য-সম্ভার দেখে সে কথা মনে হলো না। যেন জীবনে শেষ-বারের মতো খেয়ে নিতে হবে আমাদেরকে। হয়ত ঝড়-বৃষ্টির দুর্ভোগ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে রেহাই পেয়ে এবং উপরি পাওনা হিসেবে এতোবড় আরামপ্রদ বাড়িটা সাময়িকভাবে দখল করে মনের আনন্দ উপচে পড়ছে রাহেলার। তাই এই বাড়াবাড়ি।

রাহেলা ঠাট্টা-তামাশা করবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। ভারী মুশকিল ওকে সামলানো, যদিও সে চেষ্টা আমরা কেউই করছিলাম না। অনর্গল বকবক করছিল, অনর্গল খিলখিল হাসছিল। হাসান বিরক্ত হচ্ছিল স্বভাবতই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, রাহেলার কারণে বিরক্ত হয়ে বিরক্ত প্রকাশ করছিল ও রাহেলার উপর নয়, আমার উপর। ওর চোখ-মুখের ভাব-ভঙ্গি দেখে সেকথা বুঝতে কারো বাকী থাকার কথা নয়। রাহেলার কথা আলাদা, নিজেকে নিয়েই মাতোয়ারা ও।

রাহেলার তরল ঠাট্টা তামাশা করার প্রচেষ্টায় কাজ হচ্ছে না কোনো। পরিবেশটা স্বাভাবিক নেই এখন আর। ভয়ানক অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এই অস্বাভাবিকতা টের পাচ্ছি আমি। হাসান তো পাচ্ছেই। ওরই মুষ্টি এই পরিবেশ। ব্যঙ্গভরা চোখে বিদ্রূপ করছে ও আমাকে। হঠাৎ, হঠাৎ করে আমার দিকে তাকিয়ে ঠোট কামড়ে ধরে ঝট করে নামিয়ে নিচ্ছে মাথাটা। এই ভঙ্গিটুকুর পরিষ্কার অর্থ ‘হুঁ, বুঝেছি তোমারই চালাকি।’

আমার ধারণা, রাহেলা যদি মাঝে মাঝে মাথা তুলে আমাদের দু’জনার দিকে না তাকাত তাহলে হয়ত ও দাঁতে দাঁত চেপে জেদ করতে শুরু করত বা আমার শার্টের কলার চেপে ধরে কাণ্ড বাধিয়ে দিত একটা না একটা।

রাহেলা হঠাৎ বলে উঠল কি ব্যাপার বলো দেখি, তোমরা দু'জনাই কিছু মুখে তুলছ না যে!

হাসান উত্তর দিল আমি তো খাচ্ছি। ওরা ক্ষিদে নষ্ট হয়ে গেছে, কি করে মুখে তুলবে?

উচ্চারণে ঠাট্টার সুর পরিষ্কার বটে, কিন্তু বাক্য-বিন্যাসে পরিষ্কার ব্যঙ্গ।

খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ হতেই বেডরুমে এসে বসলাম তিনজনা। ঝড়-বৃষ্টির দাপট তুমুল হয়ে দেখা দিয়েছে ইতিমধ্যে বাইরে। ক্ষান্ত হবার কোনো আশা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। গা এলিয়ে দিল রাহেলা। তার আগে টেপ-রেকর্ডারটা চালু করে দিয়েছে। ফেরদৌসীর ভাওয়াইয়া, সুচিত্রার রবীন্দ্র-সঙ্গীত, ফিরোজার নজরুল-গীতি পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় না রেখেই বেজে চলেছে একের পর এক। এদিকে তন্দ্রায় ঝুঁজে আসছে রাহেলার চোখ জোড়া।

শেষ পর্যন্ত সোফা-সেটের উপর ঘুমিয়েই পড়ল রাহেলা। হাসান এই সময়ের অপেক্ষাতেই ছিল। উঠে চলে গেল ও হল-ঘরে। সেখান থেকেই, আমার দিকে ফিরেও না তাকিয়ে, মাথা নেড়ে নির্দেশ দিল নিঃশব্দে। তারপরও আমার দিকে তাকাল না। ও জানত, তাকাবার দরকার নেই। জানত, আমি ওর দিকেই চেয়ে আছি, ওর প্রতিটি ভাব-ভঙ্গি লক্ষ্য করছি ভয়ে ভয়ে। এবং সেই সাথে, আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি ওর মনের কথা, আমার ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ আছে বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে ও।

আমি ওকে সত্যিসত্যি ভয়ে ভয়ে অনুসরণ করলাম। হল-ঘরে এসে দাঁড়লাম আমি। সিরিয়াস কণ্ঠে ফিসফিস করে উঠল ও দরজাটা বন্ধ করে দাও। রাহেলা এর মধ্যে মাথা গলাক তা আমি চাই না।

দরজা বন্ধ করে দিলাম যন্ত্রচালিতের মতো। ওকে আবার অনুসরণ করে প্রবেশ করলাম কিচেনরুমে। বাড়ির সর্বশেষ প্রান্তে এই কিচেনরুম।

হাসান আমার দিকে ফিরে তাকাতেই চমকে উঠলাম আমি। ওর এই দৃষ্টি আমার অচেনা নয়। কিন্তু ওর এই দৃষ্টি কোনোদিন আমার উপর পতিত হবে তা দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি। হাসান ওর পেশাদারী ভঙ্গিতে, পুলিশী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। এ রকম দৃষ্টিতে হেড-কোয়ার্টারে ধরে আনা সব অপরাধীর দিকে তাকায় ও।

এটা সিগারেট ধরাল ও। ঠোঁটেই ধরে রাখল সেটা। আমার দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে না দিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল সেটা। পুলিশ বিভাগের লোকেরা যাদেরকে সন্দেহ করে তাদেরকে সিগারেট দিতে অস্বস্তি নয়।

শোনাও দেখি আর একটা স্বপ্নের কাহিনি!



তীক্ষ্ণ বিদ্বিপাত্রক কণ্ঠে কথা কয়ে উঠল হাসান।

চোখ নামিয়ে নিলাম আমি। বললাম তুমি ভাবছ, আমি মিথ্যে কথা বলেছি, তাই না? কিন্তু...।

ওই পর্যন্তই বলতে পারলাম আমি। ক্ষেপে উঠল হাসান। চুপ করে যেতে বাধ্য হলাম আমি। ও আমার মুখের সামনে এসে দাঁড়াল। ঠেলে ঠেলে পিছিয়ে নিয়ে গেল দেয়ালের গায়ে। শারীরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নয়, হাত দু'টো ওর এখনও পকেটে ঢোকানোই রয়েছে, পিছিয়ে নিয়ে গেল ও আমাকে চোখ রাঙিয়ে কয়েক পা অগ্রসর হয়ে। তারপর গুরু করল ও যন্ত্রণাকর সংলাপ, যা বিদ্বিপাত্রক, বাজায় এবং অবিশ্বাসী: তুমি তাহলে জানতে, জানতে স্বপ্নের মাধ্যমে, কিভাবে এই বাড়িতে ঢোকা যায়, না? স্বপ্ন স্বয়ং তোমাকে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, বড় রাস্তার মুখে সরু মতো একটা গলি আছে, আর সেই গলির দু'পাশে দু'টো ল্যাম্প-পোস্ট দাঁড়িয়ে আছে, কেমন? বোঝাতে চাও, স্বপ্নের মাধ্যমে জেনেছ এই বাড়ির হল-ঘরের চাবি কোথায় থাকত, না? স্বপ্নেই তুমি জেনেছিলে, বারান্দার বাতির সুইচ আর হল-ঘরের বাতির সুইচ ঠিক কোন্ কোন্ জায়গায় আছে, কেমন, পট্টি মারার জায়গা পাওনি, তাই না? তুমি জানো, কি করব তোমায় আমি? রাহেলার ভাই হও বা না হও, স্রেফ হাড়গোড় গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেব।

হাসানের উত্তেজিত ভাব দেখে বুঝতে পারছি, এই মুহূর্তেই আমার হাড়গোড় গুঁড়ো করা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখার জন্যে নিজের সাথেই সংগ্রাম করতে হচ্ছে ওকে।

আমি যেন টলে উঠলাম। সিধে হয়ে দাঁড়াবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হচ্ছে আমাকে।

হাসান ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। দিলও না। গুরু করল থমথমে এবং সেই ব্যঙ্গ-মিশ্রিত কণ্ঠে। তুমি ছল করে আমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিলে, কেমন? কিন্তু সৎসাহসীর মতো সব কথা স্বীকার করার পৌরুষ তোমার ছিল না। বলতে পারতে আমাকে, যদি সৎসাহসী হতে, 'হাসান, শহরের অমুক জায়গায় অমুক এক বাড়িতে গতকাল গিয়েছিলাম আমি, সেখানে একজন লোককে খুন করে ফেলেছি, এই হলো সেই লোকের পরিচয়। আর অমুক অমুক কারণে তাকে আমি খুন করে ফেলেছি।' তা তুমি বলতে পারনি। উল্টো, আমাকে বোকা বানিয়ে নিজেকে সুচারুভাবে নিরীহ প্রমাণ করার কৌশল তৈরি করে ফেললে মনে মনে। আমাকে শোনাতে মনগড়া, অবাস্তব অদ্ভুত একটা স্বপ্নের কথা। আমি বিবেচনা করতে রাজী আছি সেই লোককে, কিছু যায় আসে না সে যত

নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডই ঘটিয়ে থাকুক, যদি সে খোলাখুলি আন্তরিকভাবে সব অপরাধ স্বীকার করে। অবশ্য আমার অপরিচিত কোনো অপরাধী যদি এককথায় সব অস্বীকার করে বা মিথ্যে কথা বলে রক্ষা পেতে চায় তাহলে সেটা খুবই স্বাভাবিক, কেননা মানুষের প্রকৃতিই তারজন্যে দায়ী। কিন্তু অপরাধী যদি আমার আপন লোক হয়? অপরাধীর বোনের স্বামীর কাছে অপরাধী সত্য কথা স্বীকার করলে সে নিশ্চয়ই সহানুভূতি এবং বিবেচনাবোধ পাবে, তা সত্ত্বেও তাকে বোকা বানাবার প্রয়াস! এ ধরনের লোকগুলো কুকুর-বেড়ালের চেয়েও নোংরা, আর কপালে এদের মহা খারাবি লেখা আছে।...‘দেখো, আমি এই অদ্ভুত ঢাবিটা পেয়েছি স্বপ্নের মধ্যে। কিভাবে এটা সম্ভব হলো?...দেখো, আমি এই বোতামটাও পেয়েছি...!’ ‘আমার সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা, কেমন? এই সব কথা শুনিye আমাকে দিয়ে আদায় করিয়ে নিতে চেয়েছিলে কোনো ডাক্তারের কাছে যাবার পরামর্শ, মেডিক্যাল অবজারভেশনে থাকার উপদেশ তাই তো?

ওর পকেটস্থ হাত দু’টোর মধ্যে থেকে অবশেষে একটি হাত বেরিয়ে এল। সিগারেটটা ফেলে দিল ও। তারপর বের হলো অন্য হাতটা। সেটা আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিল জোরেশোরে। একগুঁয়ে কণ্ঠে উচ্চারণ করল ও এবার গুরু করা যাক সত্যকথন। তোমার কাছ থেকে প্রকৃত ঘটনা জানবই আমি। তোমাকে দিয়ে স্বীকার করাতে পরি কি না পরি, দেখা যাক। আমাকে তুমি অতো সহজ ভেবো না।

কথা শেষ করে সজোরে নাড়া দিল ও আমার কাঁধ ধরে। আমার মুখ খোলার জন্যে শক্তি প্রয়োগ করছে ও, কিন্তু কি বলার জন্যে মুখ খুলব আমি?

যে রাতে ঘটনাটা ঘটেছে সে রাতে কেন তুমি এখানে এসেছিলে? কি করেছিলে তুমি এখানে এসে?

বেকুবের মতো, অসহায়ের মতো মাথা নাড়লাম আমি এদিক- ওদিক কোনোদিন এখানে আসিনি আমি। এই বাড়ি, এই এলাকা জীবনে কোনোদিন দেখিনি আমি, শুধুমাত্র আজই তোমার আর রাহেলার সাথে এখানে এসেছি...।

চোয়ালের নিচে ঘুষি মেরে বসল হাসান। মাথাটা পিছন দিকে হেলে গিয়ে ধাক্কা খেল দেয়ালের সাথে।

যাকে তুমি খুন করেছ তার পরিচয় বল এখনও। লোকটার নাম কি ছিল? কত দিনের পরিচয় ছিল তোমার সাথে?

হাসান জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

এমনিতেই মানসিক যন্ত্রণায় আধমরা হয়ে উঠেছি আমি, তার ওপর অবুঝের মতো ঝামেলা বাড়াবার চেষ্টা করো না, হাসান।

খেদোক্তির মতো শোনাল কথাগুলো।

দ্বিতীয়বার আঘাত করল হাসান। এবার আগে থেকেই সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম আমি। লাগল বটে, ব্যথা পেলাম না খুব একটা।

: উত্তর দেবে কিনা জানতে চাই, রহমান? দেবে কিনা বল?

আমি ক্ষোভ মিশ্রিত কণ্ঠে উত্তর দিলাম তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা আমার নেই হাসান, এর চেয়ে সত্য আর কিছু হতে পারে না, তা তুমি স্বীকার কর বা না কর। খোদাই তোমার প্রশ্নের উত্তর জানেন, তাকেই জিজ্ঞেস কর। একমাত্র তিনিই শুধু জানাতে পারেন, কি ঘটেছিল যে রাতে আমি ঘুমে অচেতন ছিলাম।

আমার কথায় কাজ হলো খানিকটা। হাসান আমার কাঁধ ছেড়ে দিল না অবশ্য, কিন্তু ধাক্কা মারাটা বন্ধ করল। কিন্তু প্রশ্নবান নিষ্কিণ্ত হলো সাথে সাথেই : লোকটা কে ছিল? কেন তুমি তাকে খুন করেছ? কেন? কেন? কেন?

একটু নড়েচড়ে ছাড়িয়ে নিলাম নিজেকে ওর হাত থেকে। ওর লম্বা লম্বা হাত দু'টোর আওতার বাইরে সরে এলাম। আমরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। পরস্পরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম হাপাতে হাপাতে

হাসান আমার কাছে এগিয়ে এল আবার সহজে ছেড়ে দেব তোমাকে তা কিন্তু মোটেও ভেবো না। তোমার মতো বাকহীন লোক নিয়ে কারবার আমি আগেও করেছি বহু। কিভাবে কথার তুবড়ি ছোট্টাতে হয় তা আমার ভালো করেই জানা আছে। হয় তুমি আমাকে সব কথা খুলে বলবে, নয়ত একজনকে খুন করার অপরাধে এক নম্বর শাস্তি দেব তোমাকে নিজের হাতের সুখ মিটিয়ে আধমারা করে—তা বলে দিচ্ছি!

যা করবে হুবহু তাই বলছে হাসান, পরিষ্কার বুঝতে পারছি। পুলিশী রক্ত গরম হয়ে ফুটতে শুরু করেছে চামড়ার নিচে। সবরকম সম্পর্কের কথা আপাতত ভুলে যাবে ও।

নিজের অজান্তেই নিজের মাথার চুলগুলো ধরে প্রাণপণে টানতে টানতে কয়েক পা সরে এলাম আমি। হাসান একটা চেয়ার কিচেন রুমের মাঝখানটায় নিয়ে এল এক পাশ থেকে। টেবিলটা এই মুহূর্তে আমাদের মাঝখানে। চেয়ারের উপর না বসে সেটার গায়ে একটা হাত রেখে আমার দিকে থমথমে মুখে তাকিয়ে আছে ও। চেয়ারটা হঠাৎ ছুঁড়ে মারবে না তো আমাকে লক্ষ্য করে? মনে মনে আশা পোষণ করলাম—না, আমার মাথা ফাটার ঝুঁকি হঠাৎ করে জাগবে বলে মনে হয় না ওর। ও শুধু আমার মুখ থেকে ওর সন্দেহ অনুযায়ী সদুত্তর পেতে চায়।

হাসানের জন্যে অন্তত একজন আছে, সে হচ্ছে আমি, যাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে উত্তর পাবার চেষ্টা করতে পারে ও। কিন্তু আমি যে রহস্যজালে জড়িয়ে পড়েছি তা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে কাকে প্রশ্ন করব? কার কাছে ছুটব আমি? কোথায় পালাব?

আমার দিক থেকে দৃষ্টি সরে গেল ওর। সিঁধে হয়ে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে তাকাল দরজার দিকে।

দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলাম। দরজাটা আমার পিছন দিকে। হাসান দেখতে পাচ্ছে, দেখছে, কিন্তু না ঘুরে দেখতে পাবার কথা নয় আমার। আমার দিকে নয়, এখনও তাকিয়ে আছে ও দরজাটার দিকেই।

আমি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। দেখলাম, দরজায় একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে। হাতে একটা উদ্যত পিস্তল।

পর মুহূর্তে দ্রুত ভঙ্গিতে কথা বলে উঠল সে : আপনারা দু'জন কি করছেন শুনি এখানে?

লোকটা ঘরের ভিতর একটা পা ফেলল!

চেয়ারের মাথা থেকে হাতটা নামিয়ে নিল হাসান। ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল ও ধীরে-সুস্থে। বলল : We came in out of the rain, that suit you?

: Identify yourselves-and hurry up about it.

লোকটার দ্বিতীয় পা এগিয়ে এল ঘরের মেঝেতে। এখনও পিস্তলটা উদ্যত। হাসান পরিচয়-পত্র বের করে ছুঁড়ে দিল : Help yourself.

অমনোযোগী কণ্ঠে কথাটা বলে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল ও। সিগারেট ধরিয়ে জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। তারপর ধীরে ধীরে নিবিকারভাবে ঘুরে দাঁড়াল আগন্তুকের দিকে।

স্যালুট করল আগন্তুক। একগাল হেসে বলে উঠল মাফ করবেন, স্যার। কিন্তু আপনি...? স্যার, আমি নবকুমারগঞ্জ থানার ও. সি., হেদায়েত খান।

একটু থেমে, সম্ভবত ঢোক গিলে আবার শুরু করল হেদায়েত খান। বাড়িটার ওপর নজর রাখতে হচ্ছে আমাদেরকে। এদিক দিয়ে যাবার পথে থামব কিনা, ভাবছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, আলো জ্বলতে দেখে ভিতরে ঢুকলাম আমি, তারপরই শুনতে পেলাম আপনাদের দু'জনার কণ্ঠস্বর..

হেদায়েত খান কৌতূহলী স্বভাবতই। আমাদের দু'জনার হাবভাব তার কেমন কেমন ঠেকবারই কথা। কি হচ্ছিল আমাদের দু'জনার মধ্যে, কি কথা বলছিলাম ইত্যাদি জানতে চায় সে। সরাসরি জানতে চাওয়াটা সম্ভব নয়

হাসানের গুরুতর পরিচয় পাবার পর। যদি হেদায়েত খান অন্য কোনো বড় অফিসার হতো তাহলেও তার প্রশ্নের উত্তরে আসল কথা বলতে রাজী হতো না হাসান। এর মুখের হাবভাব দেখেই বুঝতে পারছি তা আমি। ওর ধারণা, আমাদের মধ্যকার ব্যাপারটা স্রেফ আমাদেরই নিজস্ব ব্যাপার।

আমি ভাবছিলাম, হয়ত ছিঁচকে চোর-টোর চুরি করার মতলবে তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকেছে...।

হেদায়েত খান আবার যোগ করল। হাসান এতক্ষণ পর একটা প্রশ্ন করল: ঠিক এই বাড়ীটাকে নজরে রাখার উদ্দেশ্যে এবং কারণটা কি?

স্যার, গত সপ্তাহে এখানে একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে।

আমার অস্তিত্বের উপর কে যেন আক্রমণ করতে আসছে, হঠাৎ করে তৃতীয়বার এইরকম অনুভব করলাম আমি।

হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে।

হাসান হেদায়েত খানের কথার শেষ তিনটি শব্দ অর্থহীনভাবে উচ্চারণ করল। ওর প্রতিধ্বনিতে প্রশ্নবোধক চিহ্নও নেই। কয়েকটা মুহূর্তের আয়ু শেষ হয়ে যাবার পর বলল: আমি ব্যাপারটা সম্পর্কে সব কথা শুনতে চাই। এ সম্পর্কে সব কিছু

সিগারেটের প্যাকেট থেকে আবার সিগারেট বের করল হাসান। একটা চেয়ারে বসল। হেদায়েত খানকে দেখিয়ে দিল একটা চেয়ার ইঙ্গিতে। আমার দিকে না তাকিয়েই বলে উঠল : সিগারেট চাইছ?

প্যাকেটটা ছুঁড়ে দিল তিন নম্বর চেয়ারের পায়ার কাছে, যেমন ভাবে কুকুরের দিকে খাবার ছুঁড়ে দেয়া হয়। না, ঠিক সেরকম নয়। কুকুরকে ভালোবাসে লোকে, নিয়মানুযায়ী। আমি এগিয়ে গিয়ে প্যাকেটটা তুলে নিলাম। সিগারেট বের করে প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেরত দিতে যাব, এসময় হাসান আবারও আমার দিকে না তাকিয়ে বলে উঠল হেদায়েত খানের উদ্দেশ্যে: সিগারেট খান।

হাসান সম্মানের অপব্যয় করে না, জানি। হেদায়েত খান অর্ন্ত প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে পিছপা, জানলাম। সিগারেটের প্যাকেটটা তাকে দিলাম, কিন্তু সে ফেরত দিল হাসানকে: আমি কম খাই সিগারেট।

কিচেনরুমটা অব্যবহৃত। ভাঙা-আধভাঙা চেয়ারগুলো সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা এখানে সেখানে। ভালো চেয়ার মাত্র তিনটেই, তিনজন বসেছি আমরা।

হেদায়েত খান আমার এবং হাসানের দিকে মুখ করে বসেছে, কথা বলার সময় আমার দিকে সে তাকাল না যদিও একাটবারও। আমাকে গুরুত্ব দেবার

কোনো কারণ সম্ভবত সে দেখতে পায়নি। দেখার মতো তেমন কিছু ছিল না বটে, শুধু আমি মৃতপ্রায় পর্যায়ে পৌঁছে আছি এটুকু ছাড়া।

এই বাড়িটা মি. কায়েস এবং মিসেস্ কায়েস নামক এক দম্পতির।

হেদায়েত খান আরম্ভ করল সবকিছু শোনার জন্যে। একটু ভেবে নিলো সে নতুন করে শুরু করার আগে। হাসান অনর্থপূর্ণ এবং অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে আমাকে জরীপ করে নিল। মি. কায়েসের নাম শুনে আমার কোনো প্রতিক্রিয়া হলো কিনা বুঝতে চায় ও। কিন্তু কি প্রতিক্রিয়াইবা হতে পারে আমার, ওই নামের কাউকে আমি চিনলে তো? ওই নামের সাথে আমার পরিচয় নেই তা আমার চেয়ে ভালো আর কে জানে?

মি. কায়েস সচরাচর ব্যবসায় উপলক্ষে বিদেশে থাকতেন। যখন অশুভ ঘটনাটা ঘটেছে তখনও তিনি বাইরে অবস্থান করছিলেন। অবশ্য, প্রকৃতপক্ষে, আমরা এখনো ভদ্রলোককে দুঃসংবাদটা জানানোর জন্যে সামনে পাইনি। মিসেস্ কায়েস ছিলেন খামখেয়ালী ধরনের...।

ছিলেন...?

আমি পরিষ্কার বুঝলাম শব্দটা উচ্চারণ করার সময় হাসানের নিশ্বাস আটকে গিয়ে আবার পড়তে শুরু করল। হেদায়েত খান ওর কথাটা শুনতে পায়নি। নিজস্ব ভঙ্গিতে বলে চলল সে-পাশের বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে, মিসেস কায়েস অবশ্য স্বামীকে লুকিয়ে খামখেয়ালীপনা করতেন না। তবে নানা কানাঘুসা শুনতে পাওয়া গেছে ভদ্রমহিলা সম্পর্কে, যদিও কোনো অভিযোগই প্রমাণিত করেনি কেউ। এক যুবকের সঙ্গে তিনি মেলামেশা করতেন, এবং যুবকটির সঙ্গে তাকে আনন্দ দিত বলে জানা যায়। কিন্তু ব্যাপারটা কোনো বিশেষ অর্থবহন করে না। কেননা, যুবকটি মি. কায়েসের সাথেও সমান বন্ধুত্ব বজায় রাখত বলে প্রকাশ। এবং তিনজনকে প্রায়ই একসাথে দেখা যেত। যুবকটির নাম ‘ছিল’ মকবুল হোসেন...।

এবার আমার মাথার ভিতর একটা প্রশ্ন নিঃশব্দে প্রতিধ্বনি তুলল: **ছিল?**

হেদায়েত খান দম নিয়ে নতুন দিক থেকে আরম্ভ করল নিষিকার কিন্তু নাটকীয়ভাবে: একজন দুধওয়ালা দুধের গামলা মাথায় করে যাচ্ছিল, পাকা রাস্তাটা দিয়ে। এই বাড়ির নিজস্ব আওতাধীন সরু গলি মতো রাস্তাটার মুখে, যেখানে দু’টো ল্যাম্প-পোস্ট পোঁতা আছে, সেখানে সে দেখতে পায় বোপ-ঝাড়ের পাশে ছেঁড়াখোঁড়া কাপড় জড়ানো একটা বস্ত্র। তখন সবেমাত্র সকাল হচ্ছে, দিনটি ছিল মঙ্গরবার। আবছা আবছা অন্ধকারে ভালো দেখতে পায়নি

দুধওয়ালা বস্তুটাকে। ভাগ্য ভালো, লোকটা ছিল কৌতূহলী। এগিয়ে যায় সে, দেখে বস্তুটা আর কিছু নয়, একটা দেহ। দুর্ভাগিনী মিসেস্ কায়েসের দেহ।

মৃতদেহ?

হাসানের প্রশ্ন।

মৃতপ্রায়। নিশ্চয় নিজের আহত দেহটা মাটির ওপর দিয়ে টেনে-হেঁচড়ে মেইন রোডের দিকে নিয়ে যাবার অসম্ভব চেষ্টা করেছিলেন তিনি। লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা আর কি। কিন্তু একে রাত্রিকাল, তার ওপর মেইন রোডটা দিয়ে গাড়ি চলাচল তখন পর্যন্ত শুরুই হয়নি। লোক চলাচলও হয় কিনা সন্দেহ। রাস্তাটা এখনও শেষ হয়নি, আড়াই মাইল এগিয়ে গিয়ে থেমে আছে কাজ। রাত্রিবেলা কারো চোখে পড়ার সম্ভাবনা ছিল না। চীৎকার করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না বলেই বুঝতে পারা যায়। যদি চীৎকার করেও থাকেন, শোনার মতো কেউ ছিল না আশপাশে। কোনো বাড়ি-ঘর খুব একটা কাছে-পিঠে নেই। দুধওয়ালা তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় পেয়েছিল। আরো দু'জন গ্রামবাসীকে ডেকে নিয়ে আসে সে। তারা হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে। দু'টো পা-ই ভেঙ্গে গিয়েছিল, মেরুদণ্ডটাও। শরীরের সর্বত্রও অনেক জখম ছিল। ডাক্তাররা দেখেই বলেছিলেন, বাঁচার কোনোই আশা নেই। ঠিক তাই, পরবর্তী রাত্রির প্রথমদিকে মারা যান মিসেস্ কায়েস। মাঝখানে, বেলা পাঁচটার দিকে বেশ খানিকক্ষণের জন্যে একবার শুধু জ্ঞান ফিরে এসেছিল তাঁর।

নিশ্বাস ফেলা এবং শ্বাস নেয়া যে এতো কষ্টকর ব্যাপার তা আমার জানা ছিল না এমনভাবে। প্রাণ যেন বেরিয়ে যাবার দশা। অস্বাভাবিক কষ্ট অনুভব করছি, শব্দ হচ্ছে জোরে জোরে।

হেদায়েত খান আমার দিকে কৌতুকভরে তাকাল, তারপর হাসানের দিকে ফিরে মৃদু হাস্যে বলে উঠল-আপনার সঙ্গী খুন-জখমের কথা শুনতে পারেন না, না স্যার? জানি, অনেকে অসুস্থ ফিল করে।

আমার জন্যে হাসানের মনে আর যেন কোনো দয়ামায়া নেই। ঠিক এই মুহূর্তে কি ভীষণ ঘৃণা করছে ও আমাকে টের পেলাম। বলে উঠল কি হচ্ছে কি?

কটুস্বরে তিরস্কার করে উঠল হাসান। এমনকি আমার দিকে না তাকিয়েই।

এই হলো বাস্তব ঘটনার একটা অংশ। প্রথমে এর বেশ কিছু জানতে পারিনি আমরা। পরে জানলাম, অবশ্য সেই দিনই, একটা গাড়ি মিসেস্ কায়েসের ওই হাল করেছে। গাড়িটা পাওয়া গেছে মেইন রোডের পাশে কয়েকটা গাছের পাশেই ছিল গাড়িটা। গাড়ির দ্বিয়ারে রক্তের দাগ এবং চুল পাওয়া গেছে। আর গাড়িটা হচ্ছে মকবুল হোসেনের, আমরা প্রমাণ পেয়েছি।

হেদায়েত খান নতুন বক্তব্যের সূচনায় বলল: রিপোর্ট পেয়ে ইন্সপেক্টর গাউস চৌধুরী এই বাড়িটা পর্যবেক্ষণ করতে এলেন। তিনি দোতালায় আয়না ফিট করা আট-কোণবিশিষ্ট একটি রুমে ঢুকে দেখেন, বাড়ির আয়রণ সেফটা ভাঙা এবং লুণ্ঠিত। আপনাকে স্যার দেখাব রুমটা...।

রাখো তোমার ওটা!

হাসান অকস্মাৎ, অপ্রত্যাশিতভাবে ধমক মেরে উঠল। হেদায়েত খান চমকে উঠল। কিন্তু হেদায়েত খানকে নয়, ধমক মেরেছে হাসান আমাকে। ওদের কথার ফাঁকে ফাঁকে চোখ গিয়ে পড়েছিল আমার একটা মিট-সেফের ভিতর। হুইস্কির একটা বোতল দেখে চিনে ফেলি আমি সেটা নিয়ে আবার নিজের জায়গায় এসে বসে খোলবার জন্যে চেষ্টা করছিলাম, হাসান দেখে ফেরে বিরজিপূর্ণ কণ্ঠে ধমক মেরে উঠেছে। যন্ত্রচালিতের মতো বোতলটা যথাস্থানে রেখে এসে বসলাম আবার। হেদায়েত খান দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল, আমারই উদ্দেশ্যে: যদি অসুবিধে বোধ করেন খুন জখমের কথা শুনতে তাহলে বাইরে গিয়ে বসছেন না কেন?

হাসান উত্তর দিল : আমি চাই, ও আমাদের সব কথা শুনুক। এসব ব্যাপার সহ্য করবার অভ্যাস থাকা উচিত, ভয়টা দূর করতে হবে।

ওর গলার স্বর ভয়ঙ্কর রকমের শান্ত।

ভালো কথা, আয়রণ সেফের দশা দেখে আমরা কেসটা অনুমান করে ছিলাম। বোঝা গেল গোটা সমস্যা এবং রহস্যটা। জানা কথা, এই ধরনের কেস দাঁড় করাতে হয় না, আপনা আপনি দাঁড়িয়ে যায়। আমরাও দেখতে পেলাম, কেসটা চমৎকারভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। ব্যাখ্যা করে ফেললাম সম্পূর্ণ ঘটনাটার: বন্ধু বলে পরিচিত সেই যুবক যার নাম মকবুল হোসেন, সে জানত বা জেনে নিয়েছিল, মি. কায়েস বাড়ির বাইরে ব্যবসায় উপলক্ষে অবস্থান করলেও তাঁর অনুপস্থিতিতে আয়রণ-সেফে মোটা অঙ্কের টাকা থাকে। ঘটনার দিন রাতে সে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই বাড়িতে প্রবেশ করে, মিসেস কায়েসের অজান্তেই কিংবা অনেক অনেক আগে থেকেই সে বাড়ির ভিতর ঢুকে লুকিয়ে ছিল। যাই হোক, রাত্রিবেলা মিসেস কায়েস অপ্রত্যাশিতভাবে নিজের রুম থেকে বেরিয়ে আসেন। হয়ত আয়রণ সেফ ভাঙার শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তাঁর। ঘর থেকে বেরিয়ে উপর তালায় ওঠেন তিনি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখে ফেলেন, মকবুল হোসেন তাঁর স্বামীর আয়রণ-সেফ নিয়ে এলাহি ক্রাণ্ডে মেতে আছে। তারপর নিজের প্রাণরক্ষা করবার জন্যে প্রাণপণে দৌড়তে শুরু করেন তিনি....।



ফোন ব্যবহার করেননি কেন তিনি? তাছাড়া দৌড়বার দরকারটা ছিল কি? প্রাণের ভয় জাগবারইবা কি কারণ ছিল?

ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল হাসান।

সে কথা ভেবেছি বটে আমরা। কিন্তু ফোন করেও রেহাই পেতেন না মিসেস্ কায়েস। ব্যাপারটা তো কেবল পুলিশকে ডাকাতির খবর জানানোতেই শেষ হবার ছিল না। মিসেস্ কায়েস নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন যে, মকবুল হোসেন তাঁর মুখ বন্ধ করার জন্যে তাঁকে হত্যাই করবে। মকবুর হোসেনের ভাবভঙ্গি দেখে এটুকু তিনি হয়ত পরিস্কারই বুঝতে পেরেছিলেন। সুতরাং না পালিয়ে উপায় ছিল না। ফোন করতেও তো সময় লাগত। ইতিমধ্যে প্রাণ হারাতে হতো এমনিতেও। যাই হোক, মিসেস্ কায়েস প্রাণভয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে মেইন রোডের দিকে দৌড়ে যেতে থাকেন। কিন্তু মকবুল হোসেন নিচে নেমে চড়ে বসে নিজের গাড়িতে। গাড়ি বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। মিসেস্ কায়েস মেইন রোডের দিকে দৌড়ছিলেন। মকবুল হোসেন তাঁকে অনুসরণ করে এবং পিছন থেকে ধাক্কা মারে গাড়ির। দু'টো চাকা মিসেস্ কায়েসের ভূপতিত শরীরের ওপর দিয়ে পেরিয়ে যায়। ব্যাপারটা অ্যান্ড্রিডেন্ট নয়। নিশ্চিত হবার জন্যে দ্বিতীয়বার মিসেস্ কায়েসের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া হয়। মরে গেছেন বলেই বিশ্বাস জন্মে তার।

নিশ্বাস এবার যেন বেশ সহজে ফেলতে পারছি আমি। শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে না। বুকের কাছে একটা স্বস্তিবোধ দানা বেঁধে উঠছে অনুভব করছি। এবং শত শত বার নিজেকে শোনাচ্ছি একটি কথাই—‘খোদা রক্ষা করনেওয়ালো, আমি গাড়ি চালাতেই জানি না।’

সিগারেটের প্যাকেট আবার বের করল হাসান। নিজেরটা জ্বালিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল প্যাকেটটা : সিগারেট খাও হে।

হেসে, সত্যি, কথাটা হাসান আমার দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বলে উঠল।

মকবুল হোসেন গাড়ি নিয়ে পালাবার কথা চিন্তা করেছিল, আমাদের ধারণা হয়। কিন্তু আরো ভালো উপায় ভেবে পায় সে। গাড়ি নিয়ে পালাতে গেলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা, খুঁজে বের করতে খুব বেশিক্ষণ লাগবে না। তাই গাড়িটা কয়েকটা গাছের আড়ালে রেখে পালায় সে। আসলে কেসটা এরিকমভাবে সাজানো হালে দেখতে পাই। অন্তত এভাবে বিশ্বাস রবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বলে কল্পনা করে নিয়েছিলাম আমরা। কিন্তু এই বিশ্বাস স্থায়ী হয় ঘটনার দিনই, অর্থাৎ মঙ্গলবার বেলা পাঁচটায়।

হেদায়েত খান নাটকীয়তায় বিশ্বাসী। আবার আরম্ভ করল সে মকবুল হোসেনের খোঁজে চারদিকে খবর পাঠিয়ে দিলাম আমরা দুপুরের আগেই। কিন্তু বিকেল পর্যন্ত কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না তার। এদিকে হসপিটালে জ্ঞান ফিরে এল মিসেস্ কায়েসের বিকেল পাঁচটার দিকে। ইন্সপেক্টর গাউস চৌধুরী সে সময় উপস্থিত ছিলেন মিসেস্ কায়েসের বেডের পাশেই। মিসেস্ কায়েস জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রথম যে কথাটি বলে উঠলেন তাতেই, এককথাতেই, আমাদের কল্লিত সম্পূর্ণ কেসটা উল্টেপাল্টে গেল। মিসেস্ কায়েস বলে উঠলেন মকবুল কেমন আছে...মকবুল? লোকটা মকবুলকে খুন করেনি তো, না কি?

হেদায়েত খান শ্রেফ নাটকীয় ধাঁচে দম নিয়ে আরম্ভ করলো আবার: আমরা ভেবেছিলাম, অপরাধী নিশ্চয়ই মকবুল হোসেন। কিন্তু আমরা ভুল ভেবেছিলাম। মিসেস্ কায়েসের জবানবন্দি শুনে ছুটে এলাম এই বাড়িতে। প্রথমে যেসব জায়গা আমাদের দৃষ্টিতে পড়েনি বেছে বেছে সেই সব জায়গা খোঁজাখুঁজি শুরু করলাম। আয়না ফিট করা আটটি দেয়াল-আলমারির দরজা খুলতে শুরু করলাম। চারটের দরজা খোলা গেল। তার একটির মধ্যে থেকে পাওয়া গেল যুবক মকবুল হোসেনের লাশ। তাকে পিছন দিক থেকে কুড়ুল জাতীয় ভারী কোনো মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। তার ফলেই মৃত্যু ঘটে। লাশটা আবিষ্কৃত হবার পর আমরা অকূল সাঁতারে ভাসলাম। আজও ভাসছি। রহস্যটা স্পূর্ণ রহস্যময় হয়েই চোখের সামনে ঝুলছে আমাদের।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত কোনো প্রশ্ন করল না হাসান। তারপর করল মোক্ষম সেই প্রশ্নটি: আসল হত্যাকারী সম্পর্কে কিছুই কি তাহলে জানা যায়নি?

জানা যায়নি মানে? সব জানা গেছে। কিন্তু তার কোনো সন্ধানই আমরা করতে পারি নি এ পর্যন্ত। সঙ্গের আট-কোণবিশিষ্ট রূপে মিসেস্ কায়েস একটা টচ লাইটের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে দেখেছিলেন হত্যাকারীকে। লোকটার সুচারু বর্ণনা দিয়ে গেছেন তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে। মিসেস্ কায়েস হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলেন উপরতালার আয়না ফিট করা আট-কোণবিশিষ্ট রুমে। টচের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন তিনি হত্যাকারীকে। জ্ঞান ফেরার পর সব কথা জানবার মতো সময় তিনি দিতে পেরেছিলেন। সম্পূর্ণ জবানবন্দি লেখা আছে অফিসে।

একমুহূর্ত মাত্র চিন্তা করল হাসান। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েই যেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

চলুন, অফিসেই যাওয়া যাক।

মৃদু স্বরে বলল ও : সব কথা যথার্থভাবে শোনা দরকার।

আমার দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর দরজার কাছে গিয়ে বলল: এসো রহমান, তুমিও এসো। রাহেলার জন্যে একটা চিরকুট রেখে যাচ্ছি।

দরজার উপর দাঁড়িয়ে রইল ও, যতক্ষণ না চেয়ার ছেড়ে আমি উঠলাম। উঠে দাঁড়াবার জন্যে চেষ্টা করতেই অনুভব করলাম, পা দু'টো আমার অবশ হয়ে গেছে।

এসো, রহমান। আমি জানি, এসব তোমার লাইনের বাইরের ব্যাপার, তবু শেষ পর্যন্ত তোমার যাওয়া উচিত আমাদের সাথে।

দ্বিতীয়বার আমার উদ্দেশ্যে বলে উঠল হাসান।

তোমার কোনো মায়াদয়া নেই নাকি!

কাঁপা কাঁপা নিশ্বাসের সাথে উচ্চারণ করলাম আমি। মাথা হেঁট করে পাশ কাটিয়ে বের হয়ে এলাম দরজা দিয়ে।

## ছয়

গাউস চৌধুরী অল্পবয়সী পুলিশ ইন্সপেক্টর। আমরা অফিস-রুমে ঢুকতেই গাউস চৌধুরী চেয়ার ছেড়ে অভ্যর্থনা জানালেন। হাসানের পরিচিত, বোঝাগেল কুশলাদি বিনিময়ের দৃশ্য দেখে। আমার সাথেও পরিচয় করিয়ে দিল হাসান। তবে আমার সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত ঘটতে দিল না। হেদায়েত খান মজা করার জন্যে আমাকে অতিরিক্ত ভীতু-প্রকৃতির বলে ঘোষণা করার চেষ্টা করেছিল। হাসান তাকে সুযোগ না দিয়ে গাউস চৌধুরীকে প্রশ্ন করতে শুরু করল।

হ্যাঁ।

হাসানের প্রশ্নের উত্তরে গাউস চৌধুরী ড্রয়ার খুলে একটা ফিতে বাঁধা ফাইল বের করলেন। ফিতে খুলে ফাইলটা গুলটাতে শুরু করে বললেন: হ্যাঁ। আসল হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার সম্ভাবনা প্রচুর। খুনির চেহারার প্রায় শতভাগ বর্ণনা পেয়েছি আমরা। মিসেস্ কয়েস শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বে জরুরি উপকারটা করে গেছেন। এই ফাইলে লিপিবদ্ধ আছে হসপিটালে আমার সাথে মিসেস্ কয়েসের কথাবার্তার সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু। আমি মিসেস্ একজন স্টেনোগ্রাফারকে নিয়েছিলাম।

ফাইল থেকে কাগজপত্র বের করলেন গাউস চৌধুরী। তারপর সেগুলোর একটিতে চোখ রেখে পড়তে শুরু করলেন: আমাদের পূর্ব-সিদ্ধান্ত মতে মিসেস্

কায়েসকে গাড়ি চাপা দিয়ে হত্যা করেছিল মকবুল হোসেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হয়েছে। মিসেস্ কায়েসকে গাড়ি চাপা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে তাতে অবশ্য কোনো ভুল নেই। তবে মকবুল হোসেন কর্তৃক মিসেস্ কায়েস নিহত হবার পরিবর্তে মকবুল হোসেন এবং মিসেস্ কায়েস তৃতীয়কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নিহত হয়েছেন। মিসেস্ কায়েস দেখেছিলেন ছোট কুড়ুলটা মকবুল হোসেনের পিঠে গেঁথে গেছে। তাই দেখে সচীৎকারে বাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়েন তিনি। আততায়ী মকবুল হোসেনের গাড়ি নিয়ে অনুসরণ করে এবং চাপা দেয় তাকে। হত্যাকারী তারপর ফিরে আসে পূর্বোক্ত জায়গায়। আয়রণ সেফেল সম্পদ সরাবার ব্যবস্থা করে এবং মকবুল হোসেনের লাশটা লুকিয়ে রাখে আয়না ফিট করা দরজাবিশিষ্ট দেয়াল আলমারির একটিতে। বাড়িটা সে তালাবন্ধও করেছিল যতটা সম্ভব বেশি সময় পাবার জন্যে...। ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাতা নাড়াচাড়া করল খানিকক্ষণ গাউস চৌধুরী। তারপর বলল: স্যার, আপনি যা জানতে চাইছিলেন, হত্যাকারীর বয়স হবে পঁচিশের মতো। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। নিটোল মাংসের আধিক্যহীন গাল। টর্চের আলো পড়ার ফলে গালের দু'দিকের দু'টো হাড়ের ছায়া পড়েছিল। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। মিসেস্ কায়েস সেই শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে এও লক্ষ্য করেছিলেন, লোকটার মাথার সিঁথি ডানদিকে কাটা, সাধারণ লোকের মতো বাঁ দিকে নয়।

আমি চমকে উঠলাম চতুর্থ বার। আমার গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। আমার গালে অতিরিক্ত মাংস নেই। ডান দিকে সিঁথি কাটা আমারই অভ্যাস। হাসান যখন আমাকে নিয়ে পড়েছিল তখন মাথার চুলে আঙুল চালিয়েছিলাম বলে মাথায় সিঁথির কোনো চিহ্ন নেই এই মুহূর্তে। কিন্তু আমি তো জানি।

লোকটার চোখ দু'টো ছিল অচঞ্চল, স্থির এবং দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ কাচের মতো, এখানে ঠিক স্বপ্লাচ্ছন্ন বা ভাবলেশহীন শব্দ দু'টো খাপ খাবে কিনা বুঝতে পারছি না। তবে মিসেস্ কায়েসের জবানবন্দি অনুযায়ী লোকটাকে দেখাচ্ছিল অপ্রকৃতিস্থের মতো।

দেখলাম, হাসান চিন্তিত ভঙ্গিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে আবার মাথা ঝুলল। শার্টের উপর একটা সোয়েটার পরেছিল লোকটা। এমনকি মিসেস্ কায়েস লক্ষ্য করেছিলেন যে, গলার কাছে সোয়েটারটা তালি দেয়া এবং ওই স্থানের উলের রঙ আপেক্ষাকৃত হালকা ছাই রঙের।

গত শীতে সোয়েটারটা রাহেলা নিজের হাতে তৈরি করে দিয়েছিল আমাকে। তিন-চারদিন পরই সিগারেটের আগুন লেগে পড়ে যায় গলার কাছে। নতুন জিনিসটা বাতিল করে দেয়া চলে না। তাছাড়া রাহেলা আমাকে পরতে দেখবে

বলেই কষ্ট করে বুনে দিয়েছিল। ওকে নিরাশ করতে মন চায়নি। মেরামত করার জন্যে ফেরত দিয়েছিলাম। কিন্তু হুবহু সেই উল অনেক খুঁজে-পেতেও পাওয়া যায়নি। অগত্যা অপেক্ষাকৃত হালকা রঙের উল দিয়েই মেরামত করা হয় পোড়া যায়গাটুকু। এই মুহূর্তে সেটা আমার গায়ে নেই। বাসাতে রেখে এসেছি। কিন্তু সেই রাতে ছিল।

চোখ সরিয়ে নিলাম। তাকালাম জানালা দিয়ে বাইরের দিকে। কিন্তু ঝাপসা হয়ে গেছে যেন আমার দৃষ্টি। যেন দেখতে পাচ্ছি না ভালো করে কিছু।

গাউস চৌধুরী বলে চলেছেন ঘণ্টা দু'য়েক লেগেছে আমাদের মিসেস্ কায়েসের কাছ থেকে তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে। একটা একটা করে শব্দ উচ্চারণ করতে পারছিলেন তিনি। তবু যা বলতে পেরেছেন তা আশাতীত।

শুনতে পেলাম কাগজ-পত্র ফাইলে ঢুকিয়ে রাখার শব্দ। কেউ কোনো কথা বলল না খানিকক্ষণ। তারপর হাসানের কণ্ঠস্বর: ইতোমধ্যে সমাধিস্থ করা হয়েছে, কেমন?

তা তো নিশ্চয়। তবে মিসেস্ কায়েসের বেলাসের বেলায় সাময়িকভাবে, বিশেষ ব্যবস্থাধীনে। এদিকে মি. কায়েসের সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি আমরা এখনও। যতদূর জানি, তিনি বার্মায় আছেন।

ফটো আছে ওঁদের?

আছে বৈকি। ওঁদের দু'জনার জীবিত অবস্থার এবং মৃত অবস্থার দু'টো করে চারটে ফটো আছে ফাইলে। দেখবেন নাকি?

বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, সামনে কি আসছে। শরীরের রক্ত জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে আমার। হাসানের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলাম আমি, নিঃশব্দ ইজিতে ওকে সাবধান হবার অনুরোধ জানাবার জন্যে। ও যেন ফটোগুলো সকলের সামনে আমাকে দেখতে বাধ্য না করে। তারচেয়ে পালিয়ে যাই আমি, হাসান যদি অনুমতি দেয়। সহ্য করার ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে আমার অনেক আগেই, আর পারব না।

কিন্তু আমার দিকে ভুলেও না তাকিয়ে হাসান গাউস চৌধুরীর উদ্দেশ্য বলে উঠল: হ্যাঁ, দেখা যাক।

সেই একই ফাইল থেকে ইন্সপেক্টর বের করলেন ফটোগুলো। দেখলাম, বড় আকারের চারকোণা ফটোগুলো হস্তান্তরিত হচ্ছে। মাথা সরিয়ে নিলাম আমি। শ্বাস ফেলতে পারছি না আর।

চোখ সরিয়ে রাখলাম বলে হাসানের কার্যকর পর্যবেক্ষণ করা হলো না। হঠাৎ অনর্গলভাবে কথা বলতে শুরু করে দিল হাসান। ফটোগুলো সম্পর্কেই।

মিসেস্ কায়েসের এবং মকবুল হোসেনের মৃতদেহের ফটো সম্পর্কে নিজস্ব ব্যাখ্যা দিতে শুরু করল ও। হাতা মাথা কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি সে সব কথার। আমার ধারণা বুঝতে পারছিল না বাকী দু'জনও। কিন্তু পরে বুঝতে বাকী ছিল না, এমন হঠাৎ বাক্যালাপ শুরু করার এবং বারবার প্রসঙ্গ বদলে ফেলার উদ্দেশ্য ছিল ফটোগুলো যথাস্থানে আবার রেখে দেবার কথা ইন্সপেক্টরকে মনে করতে না দেয়া।

হঠাৎ কারেন্ট চলে যাওয়াতে অন্ধকার হয়ে গেল রুমটা। মোমবাতি জ্বালার পর হাসান বিদায় নিতে নিতে উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছে গিয়ে, খালি হাতে, আমার উদ্দেশ্যে বলল: এসো, রহমান।

দু'টো রুম অতিক্রম করে রাস্তায় এসে পৌঁছলাম আমরা। হেদায়েত খান বলল: আমিই পৌঁছে দেব আপনাদের। আমার বাড়ি ফেরার পথেই পড়ছে মি. কায়েসের বাড়ি।

হেদায়েত খান ড্রাইভিং সিটে। তার পাশে হাসান। আমি পিঁছনের সিটে উঠে বসবার উপক্রম করছি, এমন সময় হাসানের কণ্ঠস্বর কানে ঢুকল দৌড়ে যাও দেখি রহমান, অফিসরুমে ফেলে এসেছি বোধ হয় সিগারেটের প্যাকেটটা।

কথাটা আমাকে বলে আমার দিকে আর মনোযোগ দিল না হাসান। বারান্দায় দাঁড়ানো ইন্সপেক্টর গাউসের সাথে একরকম খোশগল্প জুড়ে দিল।

হাসানের কণ্ঠস্বর পিছনে রয়ে গেল এবং ইনার অফিস-রুমে আবার প্রবেশ করলাম আমি। এবার একা। আমি জানি, দ্বিতীয়বার কেন আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। হাসানের সিগারেটের প্যাকেট এখানে নিশ্চয়ই নেই। কেননা মি. কায়েসের বাড়িতেই সবক'টা সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল ওর।

মোমবাতিটা জ্বলছে টেবিলের উপর। এগিয়ে গেলাম আমি টেবিলের দিকে। তাকালাম। চোখ বোলালাম। ওই যে ওগুলো, আমার চোখের সামনে পড়ে রয়েছে, হাসান কৌশলে টেবিলের উপর ফেলে রেখে গেছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে। আমারই জন্যে।

স্ট্রীলোকটার ফটোটা সবগুলোর উপরে রাখা। মোমবাতির পাশেই বলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মুখটা। ফটোটা হাতে তুলে নিতেই স্ট্রীলোকটার মুখ যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। মৃত্যুর কালিমা, পাণ্ডুরতা, ছায়া, প্রাণহীনতা মুহূর্তের মধ্যে উবে গেল। চঞ্চলতা ফিরে এল যেন তার চোখের দৃষ্টিতে এখনও পান্ডিত্য তার চেনা সেই কণ্ঠস্বর আবার: ওই যে, ওই যে লোকটাকে তোমার পেছনে!

এদিকে আমার অন্যহাতে যুবকটির ফটোটাও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সেই, সেই দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে যখনওকে আহত করে ওর উপর বুক পড়েছিলাম। ও যেন বলছে—“কেন তুমি এমন সর্বনাশ করলে আমার।”

এরপর কতক্ষণ জানি না, তবে খুব বেশিক্ষণ নাও হতে পারে, হয়ত দশমিনিট হবে, এই দশমিনিট আমি সচেতনতা হারিয়ে ফেলেছিলাম।

কখন জানি না ইলেকট্রিসিটি আবার ফিরে এসেছে। উজ্জ্বল বাল্ব জ্বলছে আমার মাথার উপর। চোখ মেলেই আবার বন্ধ করে ফেললাম। তিন জোড়া পদশব্দ এসে থামল আমার সামনে, মেঝেতে, যেখানে আমি হাত-পা মেলে দিয়ে শুয়ে আছি। আমার মাথার উপরে ভারী একটা কণ্ঠস্বর বিস্ময়বোধক শব্দ উচ্চারণ করল। শুনতে পেলাম।

জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন নাকি!

আর একটা কণ্ঠস্বর, এটা হেদায়েত খানের : ফটোগুলো দেখে এমন হয়েছে মনে হয়, তাই না? এরকম খুন-খারাবির সাথে জড়িত ব্যাপারগুলো সহিতে পারেন না, বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। মি. কায়েসের বাড়িতে আপনাকে যখন কেসটা সম্পর্কে বলছিলাম তখনও লক্ষ্য করেছি...।

ও সুস্থ নয়, বুঝলেন? একজন ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে আছে কিছুদিন থেকে। এরকম জ্ঞানহারী মতো প্রায়ই হয় ওর। ও কিছু না।

শেষ কণ্ঠস্বরটি হাসানের। আমার মুখের সামনে বসে পড়েছে ও। মাথাটা আমার উঁচু করে ধরতে চোখ মেলে তাকলাম আমি। এক কাপ ঠাণ্ডা পানি ধরল ও আমার মুখে। আমি হাঁ করার আগে দুর্বল গলায় বলে উঠলাম : আমি...।

চুপ করো।

প্রায় ঠোঁট না নেড়েই চুপ করিয়ে দিল আমাকে হাসান।

আমি উঠে বসলাম। হাসান দাঁড় করাল আমাকে। গাড়ির কাছে নিয়েও এল হাত ধরে। অদ্ভুত উপলব্ধি বটে, যুক্তিগতভাবে ও এখন থেকে একজন শত্রু আমার, অথচ এভাবে সাহায্য করছে আমাকে হাঁটার ব্যাপারে। পরিবেশটাকে স্বাভাবিক রাখতে বলতে হলো ওকে : ঠিক হয়ে যাবে ও।

গাড়িতে আমাকে উঠিয়ে দিয়ে ওরা সামনের সিটে উঠে বসল। ইন্সপেক্টর গাউস চৌধুরী দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দার উপর আমাদের দিকে তাকিয়ে। তার মনোভাব বুঝতে পারলাম না। ছেড়ে দিল গাড়ি।

গাড়িতে কথাবার্তা আমাদের একেবারেই হলো না। হেদায়েত খান উপস্থিত রয়েছে। মি. কায়েসের বাড়ির সামনে এসে নামলাম আমরা। হেদায়েত খান চলে গেল। রাহেলা গজরাতে গজরাতে নেমে এল বারান্দা থেকে। প্রচণ্ড রেগেছেও। অভিমান, ক্রোধ, হিংস্রতা, গোয়ারত্বমি সবগুলোই দেখা গেল তার মধ্যে। ফিরতি পথে শ্রেষ্ট ধুয়ে ফেলতে শুরু করল হাসানকে। হাসান গম্ভীর, থমথমে মুখে গাড়ি চালাতে লাগল। রাহেলা থামছে না: তুমিই না রোজ অপিস

থেকে ফিরে বলো, রাস্তা-ঘাটে মেয়েছেলে নিয়ে বের হওয়াটা আজকাল দুঃসাহসের মতো হয়ে উঠেছে। আর সেই তুমিই কোন্ আক্কেলে দু'লাইন লিখে রেখে আমাকে একা একটা খা খা বাড়িতে ফেলে রেখে যেতে সাহস পেলে! কোথায় যাচ্ছ সেটা লিখতে কি হয়েছিল? এদিকে ভয়ে ভাবনায় যাচ্ছেতাই অবস্থা আমার।

হাসানের গল্পীরতা অটুট। আসলে রাহেলাই ওকে সুযোগ করে দিয়েছে। থমথমে ভাবটা ওর রাহেলার কথা শুনে নয়। ভাবনা-চিন্তা করার জন্যে অন্য কোনোদিকে মন দেবার ওর সময় নেই। রাহেলার কথা ও শুনতেই পাচ্ছে না। মুখটা অমন করে রেখেছে, শিক্ষা দিতে পেরেছে মনে করে রাহেলা যাতে মনে মনে সন্তোষবোধ করে।

রাস্তা ভুল হবার আর কোনো আশঙ্কা ছিল না। হেদায়েত খান রাস্তা বাতলে দিয়েছে হাসানকে। মাত্র তৈরি হচ্ছে এমন একটা রাস্তায় ঢুকে পড়েছিলাম বলে সমস্যাটা সৃষ্টি হয়েছিল সম্ভবত। শহরের কাছাকাছি পৌঁছে চুপ মেরে গেল রাহেলা। বেশ অনেকক্ষণের ঠাণ্ডা, অন্তঃসারশূন্য নীরবতা। এক সময় শুধু রাহেলা নিয়ন্ত্রিত কণ্ঠে জানতে চাইল: অমন দুলছ কেন রহমান তুমি? শরীর খারাপ মনে হয়?

বিশ্রামহীনভাবে টো টো করে বেড়ানো ধাতে সয় না ওর।

হাসান তিক্ত কণ্ঠে উত্তর দিল।

স্বর্গে যাবার আশা ত্যাগ করতে রাজী আছি আমি যদি তাড়াতাড়ি নিজের পরিচিত কোথাও গিয়ে পৌঁছতে পারি। তা যেটাই হোক, হাসানের বাড়ি বা আমার। যেখানে আমি রাগ করেছি হয়ত, ক্ষেপে গেছি হয়ত, মন খারাপ করেছি হয়ত, হয়ত পিঁপড়ে, মাছি, মশা, তেলাপোকা মেরেছি—কিন্তু মানুষ খুন করিনি। বেহেশতের আশা আমি পরিত্যাগ করতে পারি, কেননা বেহেশতে যাবার কোনো সম্ভাবনা আর নেই আমার।

গাড়ি আমাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। হাসান বলে উঠল দু'মিনিটের জন্যে রহমানের সাথে ওপর তালায় যাব আমি।

হাসানের পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম আমি। বেডরুমের দরজা বন্ধ করে দিল ও নিঃশব্দে। কথা বলে উঠল নাটকীয়ভাবে এবং আমিকা-বর্জিত ভাষায়: রাহেলা নীচে অপেক্ষা করছে, প্রথমে ওকে আমি বাড়িতে রাখতে যাব, অন্য কিছু করার আগে। রাহেলা আমার জীবনের অর্ধাংশ। এর কথা যখন ও জানবে তখন প্রচণ্ড আঘাত পাবে ও। মুষড়ে পড়বে। যাতে ও অন্ততঃ আর একটি রাত



আরামে ঘুমুতে পারে, সেদিক তাকিয়ে, ব্যবস্থা নেব আমি। সব কথাও জানবেই একদিন আগে বা পরে, পরে হলেই ভালো ওর জন্যে।

ফিরে যাবার জন্যে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল হাসান। শেষ মুহুর্তে কোনো কথা যেন মনে উদয় হয়েছে, চিন্তা করার জন্যে সময় নিল পাঁচ-সাত সেকেন্ড। তারপর বলতে শুরু করল আবার নাটকীয়, ভূমিকাহীন ভাষায়: পালিয়ে যাও... তোমার নিজের ভালোর জন্যেই, এর চেয়ে ভালো পথ আর খোলা নেই। যেদিক দু'চোখ যায় ছুটতে শুরু করো। পালিয়ে পালিয়ে, বেড়িয়ে বেড়িয়ে কাটিয়ে দাও জীবনটা, যেখানে ইচ্ছা, যতদূর ইচ্ছা.... শুধু আমার আর তোমার বোনের চোখের সামনে নিরুদ্দেশ জীবনের ইতি টানার জন্যে ফিরে এসো না। তোমাকে রেখে এখুনি চলে যাচ্ছি আমি। ফিরে এসে তোমাকে যদি দেখতে পাই তাহলে মিসেস্ কায়েস এবং মকবুল হোসেনকে হত্যার অপরাধে গ্রেফতার করব তোমাকে। তখন আমি আর জিজ্ঞেস করব না, তুমি ওদের দু'জনকে খুন করেছ কিনা। ওদের মৃতদেহের ছবি দেখে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়েছিলে তুমি মেঝেতে। অনেক বাস্তব, রুঢ় প্রমাণের সাথে যোগ হয়েছে পরিচ্ছন্ন একটা অনুমান। প্রত্যেকটি প্রমাণ, সন্দেহ, অনুমান তোমাকে নির্দেশ করছে।

হাসান ওর টাইয়ের নব ধরে নাড়াচাড়া করছে, যেন খুলে ফেলতে চায়, যেন ও ওর প্রতিষ্ঠিত জীবনকে বিসর্জন দিতে যাচ্ছে।

আমার উপদেশ গ্রহণ করো এবং আমি যেন ফিরে এসে তোমাকে কোথাও দেখতে না পাই। তারপর আমি আমার কর্তব্য পালন করার জন্যে জানা সবগুলো তথ্য বাড়িতে সাংবাদিকদেরকে ডেকে জানিয়ে দেব, তারাই জানাবে সব ইন্সপেক্টর গাউস চৌধুরীকে। আর, পরে, আগামীকাল সকালে, আমি আমার পদত্যাগ-পত্র পাটিয়ে দেব কমিশনারের কাছে।

দেয়ালঘেঁষে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আমি, দেয়াল ভেদ করে কোথাও যেন নুকিয়ে পড়বার ইচ্ছা জাগছে। পা দু'টো কাঁপছে, সামলাতে কষ্ট হচ্ছে। কাঁপা গলায় অস্ফুটে বলে উঠলাম: ভয় করছে ভীষণ...!

অপরাধী মাত্রই ভয় পেয়ে থাকে...।

হাসান উত্তর দিল যোগ করে: অপরাধ করার পর অঙ্গীকার। শোনো, আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব আমি। যা বলে গেলাম সেই মতো কাজ করো তো ভালো, তা না হলে জানোই তো...।

চলে গেল হাসান দরজার হাতল ঘুরিয়ে দিয়ে। স্থগিত স্বরে যে আধঘণ্টা সময় আমাকে দেবার কথা ঘোষণা করে গেল হাসান তার অর্ধেকটা সময় পেরিয়ে যেতেও নড়াচড়া করলাম না আমি। আরো মিনিটখানেক পর ওয়াশ-

স্ট্যান্ডের সম্মুখস্থ আলোটা জ্বলে নিলাম। গরম জলের কলটা খুলে দিলাম তারপর। চোয়ালে ঘুষি খাবার ফলে ব্যথাটা রয়েছে এখনও, অনুভব করছি। কিন্তু ব্যথার কথা ভাবার কোনো ইচ্ছে নেই আমার। ড্রয়ার খুলে ক্রিমের শিশি, ব্রেড আর রেজার বের করে আনলাম। ক্রিম আর রেজারটা বের করে আনলাম স্নেফ অভ্যাসের বশে। সাথে সাথেই মনে পড়ল, এতসব লাগবে না। ক্রিমের শিশি আর রেজারটা রেখে এলাম যথাস্থানে।

গরম জল কলে বেয়ে পড়ছে, বয়ে যাচ্ছে ড্রেন বেয়ে।

প্রচণ্ড হয়ে উঠল ক্ষতস্থানের ব্যথাবোধ। এমনই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল যে, ক্ষতটাকে আরো গভীর করার সময় নতুন করে আর কোনো ব্যথা অনুভব করতে পারছি না। ড্রেন বেয়ে ধাবিত জল রক্তস্রোতকে নিজের সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে।

হয়ত গলায় ব্রেডটা ব্যবহার করলে দ্রুততর হতো কাজটা, কিন্তু অতটুকু সাহস আমি পাচ্ছি না। প্রাচীন রোমবাসীগণ এই পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিল। বই-পুস্তকে পড়েছি আমি। হয়ত মন্থর গতিতে কাজ হয়, কিন্তু হয়। সম্পূর্ণভাবেই উদ্দেশ্য সাধন করে। বাঁ দিকের হাতটায়ও ক্ষতের সৃষ্টি করলাম। তারপর ফেলে দিলাম ব্রেডটা। পৃথিবীর সকল সুখ-স্বপ্ন এবং সকল দুঃস্বপ্নের ছোঁয়া থেকে নিস্তার পেতে চলেছি আমি। দেরি আছে এখনও, একথা জোর করে বলা যায় না না, কতই বা আর দেরী হতে পারে বড়জোর? এই তো, দুর্বলতা বোধ করছি আমি। হ্যাঁ, দুর্বলতা আমাকে পেয়ে বসছে ক্রমশ।

## সাত

চোখের সামনে কালো কালো বিন্দু ফুটে উঠেছে, এমন সময় ওর আগমন-ধ্বনি শুনলাম দরজার বাইরে। অসম্ভব স্থির থাকার চেষ্টা করলাম আমি। ঠিক যেভাবে ও ভাবে, আমি ওর উপদেশ গ্রহণ করেই পালিয়ে গেছি। কিন্তু আমি আর দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা পাচ্ছি না।

ও নিশ্চয়ই শুনতে পেল, ধপ করে যে শব্দটা হলো হাঁটু ভেঙে আমার শরীরটা মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার ফলে। পরক্ষণে শুনতে পেলাম ওর কণ্ঠস্বর, আগের মতোই শাসালো: দরজা খোলো, তুমি না হলে তালায় গুলি করে ভিতরে ঢুকব!

কোনো লাভ নেই আর ঘরে ঢুকে। ও যদি ভিতরে ঢুকতে চায় তাহলে ঢুকতে পারে। অনেক দেৱী করে ফেলেছে। আমার আর কোনো আশা নেই। চাবিটা কী-হোলে আগে থেকেই ঝুলছে। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলাম। দরজার সামনে গিয়ে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উঁচু করলাম শরীরটাকে। চাবিটা ধরে ঘুরিয়ে দিলাম ধীরে ধীরে। তারপর আমি দরজা ধরে উঠে দাঁড়িলাম আবার দু'পায়ে ভর দিয়ে। দুর্বল কণ্ঠে বললাম: ঝামেলায় না জড়িয়ে ফিরে গেলেই ভাল করতে নিজের জন্যে।

ও শুধু বলল, দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে, অনুশোচনাময় কণ্ঠে: এমনটি যে করে বসবে তা আমি ভাবিনি সত্য!

দ্রুত শার্ট ছিঁড়ে ফেলল হাসান ওর নিজেরই। ক্ষতস্থানগুলো বেঁধে দিল ও ভয়ানক শক্ত করে। আমাকে নিয়ে নিচে নামল অতি কষ্টে। গাড়িতে উঠিয়ে বসাল। তারপর ছুটিয়ে দিল গাড়ি ব্যত্ৰভাবে। হাসপাতালে আমাকে ধরে রাখল না ডাক্তাররা। ক্ষতস্থানগুলো সেলাই করল শুধু। বাড়িতে পাটিয়ে দিল বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম নেবার উপদেশ দিয়ে। আত্মহত্যা করার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলেছি আমি...সেই, সেই ঘটনার পর থেকেই নিশ্চয়। তাছাড়া সেফটি-রেজারের ব্লেডগুলোর গভীরতা সৃষ্টির ক্ষমতাও অতল্প।

সময় ইতিমধ্যে থেমে থাকোনি। থাকে না বলেই। আমার রুমে যখন আমরা ফিরলাম তখন ভোর চারটে। কাপড় বদলাবার সময় হাসান আমার বিছানাটা ঠিক করে দিল।

গ্রন্থতারের কি হলো? স্থগিত?

সাধারণ একটা প্রশ্নের মতোই প্রশ্ন করলাম আমি। ব্যঙ্গ করে নয়, বিদ্রূপ করে নয়, এমনকি কৌতূহলী হয়েও নয়।

বাতিল।

হাসান যোগ করল : বাতিল করে দিয়েছি। আমি তোমাকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছিলাম, কিন্তু তা তুমি গ্রহণ করনি। সত্যি কথাটাই বলি, রাহেলাকে একাই আমি বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমি গোটা সময়টা দাঁড়িয়েছিলাম রাস্তার ওপর সদর-দরজার দিকে চোখ রেখে। কেউ যদি পালিয়ে গিয়ে নিজেকে বাঁচাবার সুযোগ হাতে পেয়েও বেছে নেয় নিজেকে যন্ত্রণাবদ্ধ করে শেষ করে ফেলার পথ, তাহলে স্বীকার করা উচিত যে তার কাহিনীতে নিশ্চয় কিছু একটা আছে। রহমান, তুমি আমাকে জয় করে নিয়েছ নিজেকে বিশ্বাসী প্রমাণিত করে। তোমাকে বিশ্বাস করার চেষ্টা করা যেতে পারে এই অবাস্তব ঘটনা ঘটে যাবার পর এটুকু অন্তত পরিষ্কার শিখেছি আমি। আমি জানি না, সে রাত্রির ঘটনার

ব্যাখ্যা কি হতে পারে, কিন্তু আমি এখন মনে করি না, সত্যি সত্যি তুমি জান সে রাতে তুমি কি করেছিলে। আমার বিশ্বাস, তুমি সত্য কথাই বলতে চেষ্টা করেছ তোমার নিজস্ব জ্ঞান অনুযায়ী।

ক্লান্ত বোধ করছি আমি।

বললাম যোগ করে: বারোটা বেজে গেছে আমার মনের। এসব বিষয়ে আর কোনো কথা বলার ইচ্ছা পর্যন্ত নেই আমার।

একটা বালিশ নিয়ে সোফা-সেটের উপর ফেলে হেলান দিল হাসান: আমি বরং রাত্রিটা তোমার সাথে কাটিয়ে যাই।

শক্তিহীন কণ্ঠে বললাম: চিন্তা করো না শুধু শুধু। দ্বিতীয়বার সে চেষ্টা আমি করব না। আমার মনে হচ্ছে...

আমরা কথা বলছিলাম নিচু স্বরে। সারারাত ধরে আবেগ, উত্তেজনা আমাদেরকে উন্মাদপ্রায় করে রেখেছিল। আবেগ, উত্তেজনার ছিটে-ফোঁটাও নেই এখন আমার বা হাসানের মধ্যে। আমার বিষয়ে অবশ্য অন্য এক কারণ রয়েছে, সেটা হলো প্রচুর রক্তক্ষরণ-জনিত। আর এক মুহূর্তের বিলম্বে আমরা দু'জন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতাম চিরদিনের জন্যে। কোনো ভাবেই আর যোগ হতো না আমাদের দু'জনার সময়, চিন্তা, ভাব, স্থান। ব্যাপারটা যেন একটা কেমিক্যাল ফর্মুলা। একটি অণু অপরিবর্তন করো, ফল কোনো দিনই এক হবে না।

এই মুহূর্তগুলো একান্তভাবেই আমাদের, আমাদের সময়, আমার এবং হাসানের। আরাম করে পা ছড়িয়ে দিয়ে লম্বা হয়েছে ও সোফার উপর। মেঝের দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানছে ও। হঠাৎ কেমন যেন স্থির হয়ে গেল ওর দৃষ্টি মেঝেতে। তারপর মেঝের উপর দিয়ে দরজার কাছে গিয়ে আবার স্থির হয়ে রইল। মেঝেতে, অর্থাৎ ওয়াশস্ট্যান্ড থেকে দরজা পর্যন্ত রক্তের দাগ লেগে লেগে রয়েছে আমার আত্মহনন প্রচেষ্টার স্বাক্ষীস্বরূপ। সোজা একট লাইন। আমার দিকে ফিরে হাসান মুখ খুলল: সত্যি, অদ্ভুত একটা পদ্ধতি বেছে নিয়েছিলে...

গ্যাসের কথাই প্রথমে সব আত্মহত্নাকারীর মনে পড়ে, আমার ধারণা।

ধীরে ধীরে, থেমে থেমে আবার বললাম আমি: আমারও তাই হয়েছিল, কিন্তু এ বাড়িতে গ্যাস নেই আমাদের, সুতরাং কোনো উপায় দেখতে পাইনি তখন ব্লেন্ড ছাড়া...

ঘুমের আমেজে জুড়ে আসতে চাইছে চোখের পাতা। হাসান বলছে, শুনতে পাচ্ছি: ভাগ্য ভালো গ্যাস ছিল না, তিতাস প্রোজেক্ট-এর ফলে আশপাশে তো

অনেক বাড়িতে এসে গেছে গ্যাস। গ্যাস যত বাড়িতে থাকবে না, আমার মনে হয় ততই কমসংখ্যক মানুষ...।

একটা কথা মনে পড়ে গেল। গ্যাস কিন্তু বিশ্বস্ত। বিদ্যুতের মতো এখন আছে এখন নেই, তা নয়! হাসানকে বললাম তা হয়ত ঠিক, কিন্তু ইলেকট্রিসিটির অসুবিধেও সহ্য করা মুশকিল। প্রায়ই ভোল্টেজ বেড়ে যায়, ফলে বারোটা বেজে যায় বালবের। এই রকম ঘটেছিল একদিন আমার পাশের রুমের বাসিন্দার। মনে পড়ছে আমার, বেচারাকে মোমবাতি ব্যবহার করতে হয়েছিল...।

চোখ জোড়া বন্ধ হয়ে গেছে আমার। ঘুম পাচ্ছে সত্যি, সম্ভবত হাসানেরও। কিন্তু কথার পিঠে একটা কথা থাকে, সেটা না বলে থাকতে পারা যায় না কোনো কোনো সময়। তাই নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বললাম, প্রায় ফিসফিস করে স্বর বের হলো: কবে, তাও মনে পড়ছে আমার, যে রাতে সেই দুঃস্বপ্নটা দেখেছিলাম আমি। হ্যাঁ, মনে পড়ছে...।

ঘুমিয়ে পড়ছি এবার সত্যিসত্যি।

তুমি জানলে কিভাবে লোকটা মোমবাতি ব্যবহার করেছিল?

তুমি সেখানে ছিলে নাকি?

হাসানের কণ্ঠস্বর শুনে চোখ খুলে গেল আমার। আমার বলা শেষ কথাটা শুনে হাসানেরও চোখ খুলে গেছে অনুমান করলাম। পাশ ফিরেছে ও। আমার দিকে তাকিয়ে আছে বালিশে মাথা রেখে।

বললাম: না, সে আমার দরজা ঠেলে মাথাটা গলিয়ে দিয়েছিল রুমের ভিতরে এক মিনিটের জন্যে, হাতে ধরা ছিল জ্বলন্ত মোমবাতি। প্রশ্ন করে জানতে চাইছিল আমার আলোও চলে গেছে কিনা। তার আগে বলেছিল, ওর বালব জ্বলছে না কেন যেন। অনুমান করলাম ও জানতে চাইছে, কারেন্ট গোটা বাড়ি থেকেই চলে গেছে কিনা। নাকি শুধু তার নিজের রুমই আলোহীন। এধরনের রুমিং হাউসের বাসিন্দারা কেমন হয় তা জানই তো...।

কিন্তু দরজা ঠেলার কারণ কি, হল থেকে কি কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারত না?

হাসানের কণ্ঠস্বর এখন আগের মতো তন্দ্রালু মনে হচ্ছে না।

বাড়িওয়ালা ওপরের হলের আলো নিভিয়ে দেয় ষাট এগারোটার পরে। হয়ত হল অন্ধকারময় ছিল বলে...।

হাসানের মাথা বালিশ থেকে উপরের দিকে উঠে পড়েছে। মনোযোগ দিয়ে, যেন দু'টো কানই ব্যবহার করে আমার কথা শুনতে চায় ও। আমার কথা শেষ

হবার আগেই বলে উঠল: তা সত্ত্বেও এটা কোনো কারণ নয় দরজা ঠেলে ভিতরে মাথা গলিয়ে দেবার। রহমান, ব্যাপারটার বাকী অংশটা বলো আমাকে। শুনতে চাই।

আর কোনো বাকী অংশ নেই এর। যা বললাম তাই সব।

তুমি তাই ভাবছ বটে। লক্ষ্য করো এর ভিতরে কত প্রশ্ন এবং উত্তর আছে। শুরুতেই বলো দেখি, লোকটা কে? কিংবা আগে কখনও দেখেছ তুমি তাকে?

বাহ, দেখেছি বৈকি!

আমি হাসানের অতি-কৌতূহলে হেসে ফেললাম। অনেকদিন পর এই আমার প্রথম হাসি। ওকে বললাম: আমরা পরস্পর অপরিচিত নই ওর নাম রুহুল আমিন। ঘটনাটা ঘটার এক সপ্তাহ বা দশদিন আগে থেকে বাস করছিল ও এখানে। ‘কেমন আছেন?’ ‘এই তো ভাল, আপনি?’—এই জাতীয় কুশল প্রশ্ন করতাম পরস্পরের দেখা হয়ে গেলে। প্রায়ই দেখা হতো আমার সিঁড়িতে ওঠা-নামার সময়। তাছাড়া কোনো কোনো সন্ধ্যায় গায়ে বাতাস লাগাবার জন্যে রাস্তার মুখে দু’জনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, যখন কারো কাজকম হাতে থাকত না।

কিন্তু কি ভয়ঙ্কর অদ্ভুত ব্যাপার বলো তো, কিভাবে তুমি ঘটনাটা উল্লেখ করতে ভুল করেছিলে, সন্ধ্যার পর থেকে সে-রাত্রির প্রতিটি মিনিটের প্রতিটি ঘটনা উল্লেখ করার জন্যে হাজার বার করে প্রশ্ন করার পরও?

কিন্তু এই ঘটনার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই সেটার’। স্বপ্নটা দেখেছিলাম আমি আরো পরে, লোকটা চলে যাবার পর ঘুমন্ত অবস্থায়। তুমি বার বার করে আমাকে প্রশ্ন করেছিলে, সন্ধ্যার পর সে-রাত্রে ঘর ছেড়ে মুহূর্তের জন্যেও বাইরে বেরিয়েছিলাম কিনা, এই জাতীয় প্রশ্ন। বেরুইনি, এমন কি দরজা পেরিয়ে হলে পা-ও রাখিনি আমি, এমন কি যখন রুহুল আমিন দরজায় অমনভাবে হাজির হয়েছিল তখনও নয়। আর কেউ কোনো কথা আমাকে জিজ্ঞেস করতে আসেনি, ডাকতে আসেনি, সুতরাং ঘরের ভিতর থেকে আমি যে বের হইনি সে ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। রুহুল আমিন যখন দরজায় এসেছিল তখন আমি রীতিমতো শুয়ে পড়েছি বিছানায়, এবং আমি বিছানা ছেড়েও উঠিনি তাকে ভিতরে ডাকার জন্যে—এখন বলো এর চেয়ে বেশি তুমি আর কি জানতে চাও?

আচ্ছা, তুমি তাহলে সে-সময় বিছানায় শুয়ে পড়েছিলে?

শুয়ে পড়েছিলাম আরো খানিক সময় আগে, শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলাম রোজকার মতো। কাগজ রেখে আলো নিভিয়ে দেবার কয়েক মিনিট পরই রুহুল আমিনের হালকা আঙুলের টোকা শুনি দরজার গায়ে...

হাত নাড়ল হাসান সম্মতিসূচক ভাবে। বলল: হ্যাঁ, ঠিক ওইভাবে সহজ সরল করে বলে যাও ধীরে ধীরে, ভাগ ভাগ করে। যেন আমি একটা আট বছরের বাচ্চা ছেলে, তুমি আমাকে কোনো গল্প শোনাচ্ছে।

সোফা ছেড়ে উঠে এসেছে হাসান অনেক আগেই। দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। আমি ভেবে ভেবে অবাক হচ্ছি শুধু, এমন একটা সাধারণ, তাত্পর্যহীন ঘটনা শোনার জন্যে এমন অস্বাভাবিকভাবে কেন ব্যথ হয়ে উঠেছে হাসান?

বিছানায় ফিরে সাড়া দিয়েছিলাম আমি, ‘কে দরজায়?’ ও উত্তর দিয়েছিল নিচু স্বরে, ‘রুহুল আমিন, পাশের রুমের।’

চোখ নাচাল হাসান। ভুরু কুঁচকে উঠল ওর প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে। জিজ্ঞেস করল: নিচু-স্বরে? গোপন কণ্ঠে? রুদ্ধস্বরে?

হাসানকে নিয়ে দেখছি ভাবি মুশকিলে পড়লাম। বললাম ও হয়ত চায়নি আমাকে ডাকতে গিয়ে বাড়ির আর সব বাসিন্দাদেরকে জাগিয়ে ফেলে। তাই ফিসফিস করে...।

হয়ত ব্যাপারটা তাই হবে। বলে যাও।

বিছানা থেকেই দরজা ছুঁতে পারি আমি, তা তো তুমি জানই। তাই করলাম, বালিশের তলা থেকে চাবি নিয়ে কী-হোলে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘুরিয়ে দিলাম, খুলে গেল দরজা। ও দাঁড়িয়েছিল পায়জামা পরে, নিজের সামনে ধরে রেখেছিল জ্বলন্ত মোমবাতিটা। আমাকে জিজ্ঞেস করল আমার রুমে কারেন্ট আছে কিনা। বেড-সুইচ জ্বলে দেখলাম। বললাম, ‘ছিল, এখন নেই।’

তারপর সে কি ফিরে গিয়েছিল তক্ষুণি?

মানে, ঠিক তক্ষুণি নয়। বেড-সুইচ সেই মুহূর্তেই অফ করে দিয়েছিলাম আমি। কিন্তু আরো কয়েক মিনিট দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েছিল ও।

আলো আছে কি নেই জানতে এসেছিল, আলো নেই তা তো জানল, তারপরও দাঁড়িয়ে থাকার মানে কি?

ভালো কথা, মানে, আনুষ্ঠানিক ক্ষমা-প্রার্থনা বা বিনয় প্রকাশ ইত্যাদি করতে দাঁড়িয়েছিল আর কি?

ঠিক কি ভাষায় বিনয় প্রকাশ করেছিলেন ভদ্রলোক?

বাবা, সে এক অবাক কাণ্ড বটে! লোকটা বাতিকগ্রস্ত স্কুল মাস্টারের চেয়েও বেশি।

তোমার তো জানা আছে মানুষগুলো এরা কেমন হয়। বলল যে, সে খুব ভয়ানকভাবে দুঃখিত আমাকে বিরক্ত করার জন্যে। সে যদি জানত ইতিমধ্যে বিছানায় শুয়ে পড়েছি আমি ঘুমোবার জন্যে তাহলে কোনো অবস্থাতেই বিরক্ত

করতে আসতো না আমাকে। তারপর বলল, ‘আপনি খুবই ক্লান্ত, তাই নাকি? হুঁ, বুঝতে পারছি আপনি খুবই ক্লান্ত বোধ করছেন।’

লাইট তখন অফ রুমের।

স্বগতোক্তি হাসানের, প্রশ্ন নয় কোনো।

বললাম: বেড-সুইচ অফ করে দিয়েছিলাম আগেই। কিন্তু মোমবাতিটা উজ্জ্বল হয়ে আলো ফেলছিল আমার মুখে। ও বলল— হ্যাঁ, আপনি ক্লান্ত, আপনি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু, জানো হাসান, সবচেয়ে মজার ব্যাপারটা হলো ওর কথাগুলো শোনার আগে মোটেও ক্লান্ত বোধ করছিলাম না আমি, কিন্তু যখন ও বলতে শুরু করল ‘আপনি ক্লান্ত, আপনি খুবই ক্লান্ত’ তখন সত্যি সত্যি ক্লান্তি বোধ করছিলাম আমি।

পুনরাবৃত্তির মতো, ভাই নাকি? ইতোমধ্যে চারবার উল্লেখ করেছ তুমি কথাটা।

চিন্তাকুল মনে হলো হাসানকে। বললাম: সত্যি, কথাটা সে বার-বার বলছিল, চেষ্টা করলেও বলা যাবে না মোট কতবার বলেছিল কথাটা। ধীরে ধীরে বরছিল, বলেই যাচ্ছিল, আর খুব নিচুস্বরে নেমে যাচ্ছিল ওর উচ্চারণ ক্রমশ।

আমি কথা বলতে বলতে হাসলাম। আবার বললাম: আজব ধরনের মানুষ, এরকম হয় কেউ কেউ; একটা কথা বারবার করে উল্লেখ করাটা এদের রোগ, নিজেকেই শোনাতে থাকে যেন একটা কথা অসংখ্যবার।

ঠিক আছে, বলে যাও। তারপর?

এরপর আর বলবার কি থাকবে? দরজা বন্ধ করে চলে গেল ও, পর মুহূর্তে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছিলাম আমি।

এক সেকেন্ড দাঁড়াও। তুমি কি স্থির নিশ্চিত যে, ভদ্রলোকটা দরজা বন্ধ করেছিলেন ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে? তুমি স্বচক্ষে ‘দেখেছ’ দরজা বন্ধ হতে? কিংবা বন্ধ হবার শব্দ ‘শুনেছ’? নাকি, অনুভবের ওপর নির্ভর করে বিশ্বাস করেছিলে যে, দরজা নিশ্চয়ই বন্ধ করে দিয়েছেন ভদ্রলোক বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? কেননা তুমি আশা করেছিলে এটাই, অন্যকিছু আশা করার থাকতে পারে না।

হাসান সামান্য একটা ব্যাপারকে এমন ঘোলাটে করে তুলেছে কেন বুঝতে পারছি না ছাই আমি: অবশ্য, অতটা মনোযোগ বা সচেতনতা সেই মুহূর্তে ছিল না আমার। বললাম না তোমাকে, ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছিলাম...!

অধৈর্যস্বরে কথাটা শেষ না করেই ওর দিক তাকিয়ে রইলাম। হাসান দরজাটা আস্তে করে খুলে ধরল, সম্পূর্ণ ভেজিয়ে দিল আবার। ক্যাঁচক্যাঁচ করে শব্দ উঠল মৃদু।



এরকম শব্দ হয়েছিল কি?

প্রশ্ন করে অপেক্ষার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল হাসান আমার দিকে। আবার বলল: পরিষ্কার ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ উত্তর দিতে পারছ না তুমি, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না আমার। তার মানে, তুমি শব্দটা শোনোনি।

কিন্তু দরজাটা বন্ধ না হয়ে পারে না, হাসান।

বাধা দিয়ে যোগ করলাম আমি: দরজা বন্ধ না করে কি করবার ছিল ওর? সারারাত বসে থাকত নাকি আমার বিছানার পাশে পাহারা দেবার জন্যে? মোমবাতিটা অদৃশ্য হয়েছিল, সুতরাং রুহুল আমিন নিশ্চয় চলে গিয়েছিল।

মোমবাতিটা অদৃশ্য হয়েছিল। তোমার চোখ দু’টো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে মোমবাতিটা দেখতে পাও নি, এমন ও তো হতে পারে? কিভাবে তুমি জানলে যে, মোমবাতিটা অদৃশ্য হয়েছিল? বলে মনে হবে।

আমি কোনো কথা বললাম না। হাসান আবার বলল: তোমাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছিল রুহুল আমিনের গলার স্বর তোমার ওপর? বিশেষ করে যখন উচ্চারণ করছিল বারবার করে ‘আপনি খুবই ক্লান্ত’?

যেন, মানে, খুবই শান্তিদায়ক ধরনের। অত্যন্ত ভালো লাগছিল আমার।

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল, উত্তরে সম্ভ্রষ্ট হয়েছে যেন: আর একটা ব্যাপার। ঠিক কোন্ জায়গাটায় ধরে রেখেছিলেন তিনি মোমবাতিটা, ওঁর শরীরের কোন্ অংশ বরাবর?

ঠিক মধ্যখানে, ওর নিজের মুখের ঠিক মাঝখানে। তার মানে, মোমবাতির শিখাটা ছিল ঠিক ওর দুই চোখের মধ্যবর্তী জায়গায়।

আবার মাথা নাড়ল হাসান। প্রশ্ন করল তুমি কি সোজাসুজি তাকিয়েছিলে মোমবাতির শিখার দিকে?

হ্যাঁ। চোখ ফেরাতে পারিনি আমি। অন্ধকার ঘরে এরকম আগুনের শিখা পেয়ে বসে মানুষকে একেবারে।

আচ্ছা, মোমবাতিটার পেছনে, যদি তিনি মোমবাতিটা ধরে রেখে থাকেন তুমি যেমন করে বলছ, তাহলে ওঁর সাথে তোমার চোখাচোখি হয়েছিল।

ভারি মুশকিলে পড়লাম। বললাম: নিশ্চয়, আমার বিশ্বাস নিশ্চয় ওর চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম আমি। মোমবাতিটা সারাক্ষণ ধরেছিল ওর আর আমার চোখের ঠিক মধ্যবর্তী সরলরেখা বরাবর।

হাসান ঢোক গিলল বার কয়েক, যেন খাটো আগুور খাচ্ছে ও। তারপর স্বগতোক্তি করল আপন মনেই, কিন্তু আমি শুনতে পেলাম কথাগুলো: চোখ

দু'টো ছিল অচঞ্চল, স্থির, এবং দৃষ্টি স্বচ্ছ কাচের মতো... স্বপ্নাচ্ছন্ন বা ভাবলেশহীন... লোকটাকে দেখাচ্ছিল অপকৃতিস্থের মতো...!”

কি?

প্রশ্ন করে উঠতে হাসান বলল—স্মরণ করছিলাম মিসেস্ কায়েস মৃত্যুশয্যায় শুয়ে যা বলেছিলেন ইসপেক্টর গাউস চৌধুরীকে। আর একটা কথা—তুমি বলেছিলে, রুহুল আমিনের সাথে মাঝেমধ্যে রাস্তার মুখে হাওয়া খেতে যেতে, কি কি বিষয়ে কথাবার্তা চলত, মনে করতে পার?

মানে, অল্প-বিস্তর সব বিষয়েই। এই যেমন আবহাওয়া, ক্রিকেট, রাজনীতি ইত্যাদি, লোকে যেমন আলাপ করে থাকে সচরাচর। কখনো-সখনো হয়ত দু'টো-একটা ব্যক্তিগত বিষয়েও কথা হয়েছে, ভালো শ্রোতা পেলে যেমন সুখ-দুঃখের কথা বলে ফেলি আমরা।

তোমার অতীত জানার প্রচেষ্টা।

আপন মনেই বলল হাসান। তারপর আমাকে প্রশ্ন করল আবার ওর সাথে থাকার সময় কখনও কি এমন কাজ নিজেকে করতে দেখেছ যা তুমি করতে চাওনি?

না। আচ্ছা, দাঁড়াও, ...হ্যাঁ। একরাতে ওর পকেটে কফ-ড্রপ ছিল। ড্রপটায় আবার কর্পূরের গন্ধ। পকেট থেকে সেটা বের করে বারবার অপার দিচ্ছিল যতক্ষণ কথাবার্তা বলেছিলাম আমরা। উহ্, ওই গন্ধটাই সহ্য হয় না আমার! প্রত্যেকবার ‘না’ বলেছি ওর প্রস্তাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ব্যবহার করতে হয়েছিল ড্রপটা।

নিম্পলক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসান বলে উঠল তোমার ইচ্ছাশক্তি কতটা দুর্বল তার পরীক্ষা নিচ্ছিল।

মনে হচ্ছে, তুমি কিছু একটা বের করতে চাইছ সম্পূর্ণ ব্যাপারটার ভিতর থেকে।

অসহায়ভাবে যোগ করলাম আমি কি সেটা? তোমাকে আমি বুঝতে পারছি না এতটুকুও।

ভেবো না। ঠিক এখনি তোমাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাই না আমি। এখন ঘুমোও তুমি, রহমান। এতক্ষণ ধরে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়ে নিয়েছি তোমাকে দিয়ে। ঘুমোও।

সোফা থেকে রুমালটা নিয়ে পকেটে ভরল হাসান। চলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে ও। জিজ্ঞেস করলাম: যাচ্ছ কোথায় তুমি? তুমি না বললে, রাতটা থাকবে আমার সাথে?

যেতে হচ্ছে মি. কায়েসের সেই বাড়িতে। যাব ইন্সপেক্টর গাউস চৌধুরীর সাথেও দেখা করতে। কেসটার সাথে জড়িয়ে রয়েছি যখন, তখন...।

কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে তুমি ছুটবে অতটা পথ পেরিয়ে সেই বাড়িতে? সকাল হয়নি যে এখনও?

দরজা খুলে ঘুরে দাঁড়াল হাসান। বলল একটা কথা রহমান, কি হয়েছে না হয়েছে সেসব কথা ভেবে মুষড়ে পড়ো না যেন। একটা না একটা উপায় খুঁজে পাবই আমরা। Don't take any more short-cuts.

চলে গেল হাসান আমাকে বিন্দু-বিসর্গ কিছুই বুঝতে না দিয়ে।

## আট

হাসান চলে যাবার খানিক পর ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।

ঘুম ভাঙল আমার দুপুরের শেষাংশে। কিন্তু তখনও হাসান ফিরে আসেনি। ঘণ্টা দু'য়েক পরও ওর ফেরার নাম-গন্ধ নেই। কাপড়-চোপড় পরলাম। কিন্তু কোনো রকমেই বাইরে বেরুতে পারলাম না ঘর ছেড়ে। এমনকি এক কাপ চা খেতে যাব রাস্তার মোড়ে, তারও সাহস হলো না। ভয় হতে লাগল অন্যদিক দিয়ে, হাসান এসে আমাকে না দেখতে পেয়ে যদি আবার ফিরে যায়? বলা যায় না, আমাকে না দেখতে পেয়ে ও হয়ত ভেবে বসবে, সিদ্ধান্ত বদলে সত্যিসত্যি পালিয়ে গেছি আমি শেষ পর্যন্ত।

পালাবার সুযোগটাই আসলে বড় কথা নয়। পালিয়ে কোথায় যাব আমি? পালানো কি প্রকৃতপক্ষে সম্ভব হয় শেষ পর্যন্ত?

এখন একমাত্র মাধ্যম, মুক্তি পাবার উপায়-হাসান।

বেলা চারটের দিকে এল ও। হাত দু'টো কচলাতে কচলাতে আমাকে উত্তেজিত পদক্ষেপে পায়চারি করে বেড়াতে দেখল।

চোখের কোণে কালি জমেছে যেন ওর গতরাত এবং আজকের এত বেলা পর্যন্ত না ঘুমোনোতে। একটা চেয়ারে হাত-পা ঢিলে করে দিয়ে বসে পড়ল ও। পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে খুলে ফলল জুতো জোড়া। তারপর ঘরের দ্বারতাসে আলোড়ন তুলে বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাঁপ ছাড়ল।

অধৈর্যের চরম সীমায় উপনীত হয়েছি এতক্ষণে, রুদ্ধকণ্ঠে জানতে চাইলাম: তখন থেকে সেখানেই ছিলে নাকি এতটা সময় ধরে?

একবার ফিরে এসেছিলাম শহরে এর মধ্যে, প্রয়োজনীয় কিছু কাজ সারতে, অফিস থেকে ছুটি নিতে।

বড়সড় একটা মোড়ক সাথে করে নিয়ে এসেছে হাসান। ব্রাউন পেপারে মোড়া জিনিসটা। ওর হাতেই ধরা রয়েছে সেটা। আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে মোড়কটা খুলে ফেলল ও। বাঁধানো ফটো সম্ভবত জিনিসটা। ব্যাক-সাইডটা আমার দিকে করে ধরে আছে ও। তারপর সোজা দিকটা ঘুরিয়ে ধরল বটে আমার দিকে, কিন্তু বাঁ দিকের অর্ধাংশ চাপা দিয়ে রেখেছে ওর একটা হাত। জিনিসটা বাঁধানো ফটোই। বুকের কাছে ধরে, অর্ধাংশ ঢেকে, আমার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে ও। কিন্তু কোনো কথা বলছে না ও, স্রেফ দেখছে আমাকে।

লোকটাকে চিনতে এতটুকু কষ্ট হলো না আমার। পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল, পরিষ্কারভাবে কামানো দাড়ি-গোঁফ, উঁচু নাক, নিষ্পলক দৃষ্টি, কগালের দাগ—সবই চেনা আমার। কিন্তু নতুন ঠেকল অবশ্য কয়েকটা জিনিস। গর্বোন্মত্ত ভাবটা আগে কোনোদিন লক্ষ্য করিনি আমি ওর মধ্যে। এমন চমৎকারভাবে ফিটফাট হালেও বড় একটা দেখিনি। অবশ্য ফটো তোলার সময় দামী স্যুট পরাটা কিছু বিচিত্র নয়। টাইও লাগিয়েছে, এটা অবশ্য কখনও পরতে দেখিনি ওকে। আর একটা জিনিস, ফটোতে ওকে দারুণ স্মার্ট দেখাচ্ছে। বয়সও কম যেন, হয়ত ফটোটা অনেকদিন আগে ওঠানো হয়েছে।

আমি ঘোষণা করলাম ফটোর দিক থেকে হাসানের দিকে চোখ ফিরিয়ে এই-ই তো রুহুল আমিন! আমার পাশের রুমের বাসিন্দা। কোথায় পেলো তুমি...?

এ যে রুহুল আমিন তা আমি জেনেই এসেছি। কোথা থেকে পেয়েছি এটা, সে কথা জিজ্ঞেস করো না। সবই তো জানতে পারবে একসময়। রুহুল আমিন বলে একে চিনলাম কিভাবে বলো তো? তোমাদের এখানকার আর সব বাসিন্দাদেরকে ফটোটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে জেনেছি। দেখলাম, তুমি চিনতে ভুল করো কিনা।

আমি জানতে চাইলাম কিন্তু রুহুল আমিনের পাশে আর একজনকে ফটো আছে বলে মনে হচ্ছে, ও কে?

ওর পরিচয় এই মুহূর্তে তোমার না জানাই ভালো। এর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করো না, কেমন?

হাসানকে সত্যিসত্যি আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বারবার কেন যেন মনে হচ্ছে, আমার মুক্তির কোনো-না-কোনো একটা পথ আবিষ্কৃত হতে যাচ্ছে। সেই পথটা যে কোনদিকে কে জানে।

হাসান নিঃসন্দেহে আমার চোখে-মুখে আশার আলো ফুটে উঠেছে লক্ষ্য করল। মাথা নেড়ে, নিষ্ঠুর, নির্মমভাবে আমাকে জানিয়ে দিল ও না না, কোনোভাবেই নিরপরাধী প্রমাণিত করা যাচ্ছে না তোমাকে। সে প্রশ্নই ওঠে না। জানতে চাও তুমি রহমান, আমরা কিসের পিছনে ছুটছি, একবার এবং শেষবারের জন্যে? জানাতে তোমাকে হবেই, আগে বা পরে, এবং সহ্য করে নেয়া খুব একটা সহজ হবে না তোমার পক্ষে সেটা।

কোনো খারাপ খবর আছে আমার জন্যে?

খুব খারাপ। কিন্তু অন্ততঃপক্ষে এখন পর্যন্ত যে অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক রহস্যময় সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে ঘটনাটা ঘটার পর থেকে তারচেয়ে অবশ্য ভালো। এটা অনেক বাস্তব, পরিচিত, এবং এমন কিছু যা মন মেনে নিতে পারে অন্তত। তুমি একজন লোককে খুন করেছ সেই মঙ্গলবার রাত্রে। স্বাভাবিকভাবে অভ্যস্ত হয়ে যাবার চেষ্টা করা উচিত তোমার এই আইডিয়াটার সাথে। কেননা এর ভিতরে ফাঁক-ফোকর নেই কোনো, কোনো ভুল নেই, দায়টা ঝেড়ে ফেলার উপায় নেই কোনো। ব্যাপারটা প্রমাণিত হচ্ছে শুধুমাত্র মিসেস্ কায়েস যে জবানবন্দি দিয়ে গেছেন তা থেকে উপসংহারে পৌঁছে তা নয়, যদিও তাঁর মাথায় জবানবন্দির কথাগুলো ভিত্তিহীনভাবে সৃষ্টি হয়নি তুমি জানো; কল্পনা করো তিনি এমন একজন লোকের বর্ণনা দিয়ে গেছেন যার সাথে তোমার মিল আছে হুবহু। প্রমাণিত হচ্ছে অন্যান্য ভাবেও, এবং সেগুলো এড়ানো সবরকম ভাবেই অসম্ভব। যে আয়না ফিট করা দরজা বিশিষ্ট দেয়াল-আলমারির ভিতরে মকবুল হোসেনের লাশ পাওয়া গেছে, আঙুলের ছাপ পাবার জন্যে ছবি তোলা হয়েছে বেটার। পাওয়া গেছে আঙুলের ছাপ। ছাপগুলো তোমার হাতের আঙুলের, গোপনে আমি মিলিয়ে দেখেছি। তোমার রুম থেকে একটা পানি খাবার গ্লাস সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলাম আমি। তাতে তোমার হাতের ছাপ ছিল। দু'টো মিলিয়ে দেখেছি—একই।

হতবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। বারোটা বেজে গেছে আমার। পরিষ্কার।

তুমিই, এবং তুমি ছাড়া আর কেউ নয় মি. কায়েসের বাড়িতে হাজির হয়েছিলে এবং মকবুল হোসেনকে কুড়ুল দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেছিলে, আর লাশটা ঢুকিয়ে রেখেছিলে দেয়াল-আলমারির ভিতরে।

আমার সারা মুখ ভিজে গেছে ঘামে।

এবার শান্ত হবার চেষ্টা করো। তুমি মিসেস্ কায়েসকে হত্যা করোনি। করতে অবশ্য পারতে বটে, আমার অনুমান, কিন্তু তিনি ছুটে বের হয়ে পড়েছিলেন বাড়ি ছেড়ে প্রাণরক্ষার্থে। তুমি গাড়ি চালাতে জানো না, কিন্তু তিনি

নিহত হয়েছেন কারো হাতে গাড়ি-চাপা পড়ে গাড়িটা মকবুল হোসেনের, কিন্তু মকবুল হোসেন মিসেস্ কায়েসকে খুন করতে পারে না স্পষ্টত, কেননা তার আগেই মকবুল হোসেন নিজেই খুন হয়ে গেছে তোমার হাতে। এখন এসব থেকে বোঝা যায় অবশ্যই যে, কেউ না কেউ তোমাকে সেই বাড়িতে ‘নিয়ে’ গিয়েছিল এবং অপেক্ষা করছিল নিরাপদ দূরত্বে। বটে, কিন্তু সেই সাথেই আবার যথেষ্ট কাছে ছিল সে যাতে করে তার প্ল্যান মতো কাজটা সমাধা হবার পথে কোনো ভুল বা ত্রুটি দেখা দিলে সে যেন স্বয়ং কলকাঠি নাড়তে পারে, তাছাড়া কোনো একজন ভিকটিম পালাবার চেষ্টা করলে যাতে করে সে সে-পথ বন্ধ করে দিতে পারে।

দায়-মুক্তি ঘটছে না এতে করে আমার। একটা থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হচ্ছে বটে আমাকে, কিন্তু অন্য একটার সম্পূর্ণ দায় ঘাড়ে চাপার সমান। কাউকে যদি জানানো হয় যে, তুমি ‘একটা’ খুন করেছ, আবার তাকে যদি বলা হয় যে, তুমি ‘একজনকে’ খুন করেছ—তাতে কিছু যায় আসে না তার। একজন যা একটাও তাই।

ধপাস করে বসে পড়লাম আমি, কাত হয়ে গেল মাথাটা। ব্যাকুল কণ্ঠে বলে ওঠবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু স্বর বের হলো দুর্বল: কিন্তু কেন জানতে পারিনি আমি কাজটা করার সময়? আমি করছিলাম কাজটা..?

কথা বলার ক্ষমতা লোপ পাচ্ছে আমার।

এই সমস্যাটা পরে ভেবে দেখব আমরা। সমস্যাটার রহস্য কোথায় আছে তা আমি অনুমান করতে পারলেও প্রমাণ করতে পারছি না ঠিক এখনি। এখন তুমিই বল, প্রমাণ ছাড়া কোনো রহস্যের ব্যাখ্যা কিভাবে করা যায়? এবং কেবলমাত্র একটি উপায়ই জানা আছে আমার প্রমাণ সংগ্রহ করার মাধ্যম হিসেবে। তা হলো, সে রাত্রির ঘটনাটা পুনরায় ঘটানো। যেভাবে ঘটনাটা ঘটেছিল প্রথমবার, সেভাবেই দ্বিতীয়বার ঘটাবার চেষ্টা করে।

ভেবে দেখছি, হাসান পাগল হয়ে যাচ্ছে—কিংবা আমি।

হাসান, তুমি কি বলতে চাও, ফিরে গিয়ে হত্যা করা হোক আবার ওদেরকে ওরা কবরস্থ হবার পরেও?

না। আমি যা বলছি তা হলো, মৌলিক ঘটনার সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতিটা সম্ভাব্য বিশেষ বিশেষ অবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে রেকর্ড করে নিতে হবে। অবশ্য, তারপরও, রেকর্ডটা বিশেষ অবস্থাস্থিতিতে প্রমাণ হিসেবেই বিবেচিত হবে, কিন্তু এই পদ্ধতিতেই সবচেয়ে ভাল ফল আমরা আশা করতে পারি।

কিন্তু তুমি আমাকে নিশ্চয় বলতে চাইছ না যে...?

হাসান বলল তোমাকে যা করতে বলব তা যথেষ্ট যুক্তি দিয়েই বলব। তোমাকে শিখিয়ে দেব সব, বুঝিয়ে দেব সব, জানিয়ে দেব সব। যা যা করতে বলব সে সবের মানে কি তাও অজানা থাকবে না তোমার। অজানা থাকলে ভুল করে বসতে পারো তুমি। আমি শুধু চাই, তুমি ঠাণ্ডা মাথায় যেমনটি বলে দেব তেমনটি করে যাবে। সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে হলে শুধুমাত্র তোমাকে সুচারুভাবে, নির্ভুলভাবে কাজগুলো সারতে হবে। সবকিছু, গুরু এবং শেষটা, নির্ভর করবে এর ওপর...।

বিস্মিত হয়ে ভাবছি হাসান আমাকে কি বলতে যাচ্ছে।

এখন প্রায় পাঁচটা বাজে।

হাসান দ্রুতস্বরে আবার যোগ করল আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।

উঠে দাঁড়াল হাসান চেয়ার ছেড়ে। আমাকেও উঠতে হলো। ওর সাথে রুম ছেড়ে নিচে এসে পৌঁছুলাম। গাড়িতে উঠে বসবার ইঙ্গিত করাতে বাধ্য হয়ে উঠে বসতে হলো আমাকে ওর পাশে। জিজ্ঞেস করলাম দ্বিধাভরা গলায় কোথায় যাচ্ছি আমরা?

গাড়ি তখনি ছাড়ল না হাসান। কৌতুক ভরা চোখে আমার মুখের দিকে দিকে তাকিয়ে উল্টো জিজ্ঞেস করল দুনিয়ার সব জায়গার মধ্যে কোন্ জায়গায় যেতে চাও তুমি রহমান, ঠিক এই মুহূর্তে?

সহজ একটা প্রশ্ন। বললাম সব জায়গায় যেতে রাজী, শুধু এক জায়গা ছাড়া। সেটা হলো, আয়নাফিট করা দরজাবিশিষ্ট দেয়াল-আলমারিওয়ালা...।

আমি শঙ্কিত, তোমার ওপর জুলুম করতে হচ্ছে বলে। দুঃখিত, রহমান, তোমাকে সেই বাড়ি, সেই রুমেই ফিরে যেতে হচ্ছে আবার। এবং আজকের রাতটা তোমাকে কাটাতে হচ্ছে ঠিক সেই জায়গাতেই যদি তুমি তোমার অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চাও একান্তভাবে। এখন তোমার মতামত কি, রাজী?

গাড়ি ছাড়ল না হাসান। প্রচুর সময় দিচ্ছে আমাকে।

আমি মাত্র চার-পাঁচ মিনিট সময় নিলাম। সিদ্ধান্ত নেবার কথা ভাবতেই গলা শুকিয়ে আসছে। শূন্য শূন্য ঠেকছে তলপেট। কিন্তু উত্তর দিয়ে দিলাম কোনোরকমে আমি তৈরি।

আমাকে পৌঁছে দেয়া হয়েছে যথাস্থানে। বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে সব কথা। সব সুচারুভাবে শিখিয়ে দিয়ে ফিরে গেছে হাসান।

বসে আছি আমি মেঝেতে, আয়না ফিট করা দরজাবিশিষ্ট দেয়াল আলমারির বাইরে, আপাতত বিশ্রাম নেবার জন্যে।

খানিকক্ষণ পর, বেশ খানিকক্ষণ পর, পদশব্দ শুনলাম আমি তার। বাড়ীটাকে ঘিরে চারপাশের নিস্তব্ধতা এবং বাড়িটার অভ্যন্তরস্থ অটুট নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে শব্দের প্রতিধ্বনি তুলল ওদের পদসঙ্ঘগার এবং কণ্ঠ। ওরা এখনও সবাই নিচের তালায়। সবাই উপরে উঠবে কিনা জানা নেই আমার। সে কিন্তু উঠবেই, হাসানের এবং আমার যুক্তি অনুযায়ী।

বুঝতে পারছি, ওরা সবাই মিলে কতজন হবে। নিচের তালায় কোনো রুমের ভিতরে ঢুকল ওরা। ফলে ওদের কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট হয়ে বাজছে আমার কানে।

উঠে দাঁড়লাম এবং প্রস্তুত হয়ে নিলাম আমি। অপেক্ষা করে রইলাম আরো খানিকক্ষণ, সুষ্ঠুভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করার এই তো সময়। এরপর কতক্ষণের জন্যে, কে জানে, সময় পাওয়া যাবে না। তবে খুব বেশি কষ্ট আমাকে করতে হবে বলে মনে হয় না। আমি জানি, আরো খানিক সময় হাতে আছে আমার। এতো জলদি উঠে আসবে না উপরে।

কণ্ঠস্বরগুলো কান পাতলে এখনও শোনা-যাচ্ছে। সবাই কথা বলছে কেমন যেন দুর্বল, শোকাভিভূত কণ্ঠে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একবার কানে ঢুকল একজনের কণ্ঠস্বর: তুমি ভাই আমাদের সাথে তো কাটাতে পার রাতটা। এমন একটা ব্যাপার ঘটে যাবার পর একা এই নির্জন বাড়িতে রাত না কাটানোটাই ভালো।

উত্তর শোনার জন্যে উৎকর্ষ হয়ে রইলাম আমি। শুনতে পেলুম অবশেষে না, আমি থাকতে পারব, ভাই। ধন্যবাদ। কোনো অসুবিধে হবে না আমার এখানে। কিন্তু আমি যে ভাবতেই পারছি না ভাই, কেমন করে এমন ভয়ঙ্কর ওলট-পালট হয়ে গেল...!

উত্তরটা শুনে কিন্তু বিস্মিত হলাম আমি। একেবারে পর এক বিস্ময় ধাক্কা মারতে মারতে কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে কে জানে। এ বাড়িতে ও আসবে, হয়ত রাত কাটাতে—এই কথা আমাকে জানিয়ে ছিল হাসান। কিন্তু হাসান



বলেনি, এই বাড়ির সাথে ওর সম্পর্ক কি। এই তো বলল, ‘কেমন করে এমন ভয়ঙ্কর ওলট-পালট হয়ে গেল...!’ কিসের ওলট-পালট? মিসেস্ কায়েস নিহত হয়েছেন বলে কথাটা বলল ও, না, মকবুল হোসেনের কথা মনে করে বলল। কার সাথে সম্পর্ক ছিল ওর? হাসান কিন্তু আমাকে জানাতে পারতো, লোকটার সাথে এই বাড়ির সম্পর্ক কি।

ওরা বোধ হয় আবার ফিরে এল হলের মধ্যে। সম্ভবত এবার সবাই বিদায় নিয়ে চলে যাবে। ঠিক তাই, বিদায় নিচ্ছে সবাই, শুনতে পাচ্ছি কথাবার্তা। একজন বলে গেল ঘুমোবার চেষ্টা করবেন, ভাই। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। কে কার হয়ে চিরদিন বেঁচে থাকে বলুন, তবে এটা হলো অপ্রত্যাশিত, ভয়ঙ্কর ব্যাপার এই যা। ধৈর্য ধরার চেষ্টা করুন আল্লা আপনার মঙ্গল করুন। চলি ভাই। আসসালামু-আলায়কুম।

হল-ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যাবার শব্দ হলো। একটা গাড়ি ছাড়ার আওয়াজও পেলাম। একটু পরই দ্বিতীয় আর তৃতীয় গাড়ি ছাড়ল। আর কোনো কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম না।

বাড়িটায় আবার নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। কিন্তু সে অল্প একটু সময়ের জন্যে। একটা পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। তার মানে, সবাই চলে গেলেও একজন যায়নি। বেডরুমে গিয়ে ঢুকল সেই পদশব্দ, বুঝতে পারছি। গ্লাসের টুংটাং শব্দ হলো খানিক পর। পানির গ্লাস হলে এমন হালকা শব্দ হবার কথা নয়। মদ? মদের গ্লাস? তাই হবে হয়তো। তার মানে, মদ খাচ্ছে ও। তারপরই পিয়ানোর শব্দ এলোপাখাড়ি আঘাতের ফলে খাপছাড়া ধরনের আওয়াজ উঠল, একা নিজেকে নিয়ে মৌজ করার সন্ধিক্ষণেই কেবল এরূপ ব্যাকরণহীনভাবে পিয়ানোয় আঙুলের টোকা দেওয়া সম্ভব।

সুইচ অফ করার শব্দ হলো। পরপরই দ্রুত পদশব্দ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে লাগল উপরপানে। এই হলো সময় নিজেকে লুকোবার। আয়না ফিট করা দরজাবিশিষ্ট দেয়াল-আলমারির ভিতর সেধিয়ে গেলাম। খুব কম জায়গা। এক ইঞ্চি জায়গাও নেই অবশিষ্ট। নাকের সামনে বড়জোর পৌনে এক ইঞ্চি জায়গা পাচ্ছি। শ্বাস প্রশ্বাসের জন্যে ফাঁক করে রেখেছি দরজাটা পৌনে এক ইঞ্চির মতোই।

ক্রমাগত পদশব্দ প্রবেশ করল বেডরুমে। শিউষে উঠল সর্বশরীর আমার অজান্তেই। ওদিকটা আলোকিত হয়ে উঠল। জানালার খিড়খড়ি খুলে ফেলা হলো একটা। দরজার ফাঁক দিয়ে চোখ মেলে আছি আমি। দেখতে পাচ্ছি বড় একটা স্যুটকেস। স্যুটকেসটা খুলে ফেলল ও। ভিতর থেকে বের হলো বার্মা-

এয়ারলাইনস্-এর ছাপ মারা এয়ারব্যাগ একটা। ওর শুধু হাত দু'টো দেখতে পাচ্ছি আমি। দেহটা চোখে পড়ছে না। স্যুটকেস থেকে বের করছে একটার পর একটা জিনিস। প্যান্ট, শার্ট, রুমাল, পায়জামা, কাগজের ছোটো বাক্স, মদের বোতল ইত্যাদি।

ধক ধক করছে আমার বুক। আমার পেছনে, দেয়াল আলমারির অভ্যন্তরস্থ কাঠে, শুকনো রক্ত লেগে আছে, এমন একজন মানুষের রক্ত যে খুন হয়েছে আমার হাতে, তা সে জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারে। রক্তটুকু শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে গেছে। আমার পিঠ কাঠের গায়ে লাগতেই বিধছে শুকনো রক্তের স্পর্শ, শিউরে উঠছে আমার সর্বশরীর।

লোকটাকে হত্যা করেছি আমিই। কিছু এসে যায় না আজ রাতে কি ঘটে না ঘটে তার উপর, একটা খুনের দায় থেকে মুক্তি পাবার কোনো উপায়ই আমার নেই। কোনো সম্ভাবনাই নেই আমার দায় ঘাড় বদল করার। হাসান আমাকে তাই বলেছে, এবং কোনো ভুল নেই ওর বলায়, বিশ্বাস করি আমি।

আমি যেখানে অবস্থান করছি তার বাইরে জ্বলে উঠল উজ্জ্বল আলো। সরু এক ফালি আলোর অংশ ঢুকে পড়ল ভিতরে। আমার হাতের উপর পড়েছে আলোটুকু। শিরশির করে উঠল সর্বশরীর।

ফাঁক দিয়ে ওর পেছন দিকটা দেখতে পাচ্ছি আমি। ও কাছাকাছি সরে এসে অপর একটা দেয়াল-আলমারির দরজা খুলে ভাঙা আয়রণ সেফটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। সেফটার সম্মুখাংশ ভেঙেছে, দুমড়ে গেছে অন্যান্য অংশ। নেড়ে চেড়ে দেখে টেনে বের করল ও সেটা ভিতর থেকে। তারপর কোটের পকেট থেকে নানা প্রকার জিনিসপত্র বের করে আপাতত ভরে রাখতে শুরু করল সেফের ভিতরে। টাকার বান্ডিল কয়েকটা, সব একশ' টাকার নোটের। সোনার হরেক রকম গহনা, তারপর প্রাইজবন্ড বের হলো ওর পকেট থেকে। সবগুলো সেফের ভিতরে ঢুকিয়ে রাখার পর বন্ধ করার কোনো উপায় না দেখে উঠিয়ে রাখল সেটা আবার আলমারির ভিতরে। সাময়িকভাবে এই নিরাপদমূলক ব্যবস্থাই চলবে, ওর মনের ভাব যেন সেইরকম, মুখ দেখে যতটুকু বুঝতে পারছি আমি।

এবার ও উঠে দাঁড়াল, ফিরে যাবার জন্যে।

এই হলো সময়। বুঝতে পারছি আমি। এই সময়ের কক্ষই আমাকে বলে দিয়েছে হাসান। হাসানের দেয়া ওর নিজস্ব রিভলবারটা পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে নিলাম আমি। যেমন করে ধরা হয় অস্ত্রটা, ডানহাতে ধরে হাতটা কোমরের একটু উপরে রেখে, কোমর থেকে ইস্টিখানেরক তফাতে, সামনে সামান্য বাড়িয়ে ধরলাম আমি। রিভলবারটার মুখ স্বভাবতই ওর দিকে ওর বুক

লক্ষ্য করে ধরেছি। এবার একটা পা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে অগ্রসর হলাম, ফলে দরজার বাইরে চলে এল আমার অর্ধেক শরীর।

এভাবেই, নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। ও ঘুরে দাঁড়াল অবশেষে আমার দিকে মুখ করে। এতক্ষণ অন্যদিকে ফিরে ছিল ও, ফলে আমার ছায়াও লক্ষ্য করেনি ও। দেয়াল আলমারির দরজাটা খুব সতর্কভাবে খুলে বেরিয়ে এসেছি আমি, ফলে কোনো শব্দও কানে যায়নি ওর।

ও আমাকে দেখছে কিনা সে ব্যাপারে বিস্ময়ের প্রথম দফায় সন্দিহান হয়ে উঠল। ও হয়ত ভাবছে, রহমানকে দেখছি, না রহমানের ভূতকে দেখছি! বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা সম্ভবত বৈপ্লবিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে ওর মনে। মুখ ধেখে বিশ্বাস হচ্ছে আমার। কথাটা হাসান আগেই বলে দিয়েছে, হাসানের কথা ভুল প্রমাণিত হয়নি, দেখা যাচ্ছে।

ওর ঠোঁট দু'টো থরথর করে কাঁপতে লাগল গাছের পাতার মতো। ফলে নদীর পানিতে আঙুল দিয়ে টোকা দিলে যেসকল শব্দ হয় অনেকটা সেরকম 'ভুট ভুট' শব্দ হচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, ও বুঝি ঢলে পড়ে যাবে জ্ঞান হারিয়ে। হাঁটুজোড়া বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চাইছে, রীতিমতো বিক্ষোভ শুরু করে দিয়েছে ওরা— কাঁপছে। কিন্তু তবু দাঁড়িয়ে রইল ও ক্ষমতাবলে।

স্মরণে রাখতে হচ্ছে আমাকে হাজারো কথা। হাসান আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে ঠিক কি কি কথা বলতে হবে, আর কি কি কথা বলতে হবে না। সব শিখে নিয়েছি আমি আমার সম্পূর্ণ মানসিক শক্তি এবং মেধা ব্যয় করে। সব সময় সচেতন থাকছি। সময়ের ব্যাপারটাও ভুলে যাইনি আমি। ভুলে গেলে চলবে না। সময়ের ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। হাসান আমাকে সাবধান করে দিয়েছে, যে সব কথা বলতে হবে এবং কোনো কথা বাদ দেয়া চলবে না তার মধ্যে থেকে, 'সেসব বলতে সময় পাবে তুমি খুবই অল্প।' অল্প সময়ের মধ্যেই সারতে হবে। কাজটা সারতে হবে আমাকে উপমা অনুযায়ী, সরু তামার তারের উপর দাঁড়িয়ে। সুতরাং পা হড়কে বা ভারসাম্য হারিয়ে যেকোনো মুহূর্তে পড়ে যেতে পারি নিচের অন্তঃহীন শূন্যে। কিন্তু বিপদটা আসলে কেমন হতে পারে তা আমাকে হাসান বুঝিয়ে বলেনি। শুধু সাবধান করে দিয়েছে যে, আমরা দু'জন—আমি এবং আমার সামনে দাঁড়িয়ে কম্পনরত এই লোকটা, দু'জনাই হাঁটছি সরু দড়ির উপর দিয়ে। ভারসাম্য রক্ষার জন্যে কোনো রকম সাহায্য আমরা পাব না। সব কিছুই নির্ভর করছে আমাদের দু'জনার মধ্যে, প্রথম কে ভুল করে পা ফেলবে।

লোকটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে অনেক কথা ঝালাই করে নিচ্ছি আমি। লোকটাকে বলতে হবে সব। লোকটা, ওর প্রকৃত পরিচয় আমি জানি না এখন পর্যন্ত, এই বাড়ির সাথে ওর সম্পর্কের সূত্রও অজানা আমার, যদিও অনুমান করছি একটা সম্পর্কের কথা, কিন্তু হাসান আমাকে পরিষ্কার করে কিছু বলেনি। না বলায় কারণ হিসেবে বলেছে, তোমাকে এই মুহূর্তে না বলার যুক্তিসঙ্গত কোনো বাধা নেই, কিন্তু আমার মন বলছে তোমাকে ওর প্রকৃত পরিচয় পরে জানালেই ভালো হবে। হাসানের কথা মেনে নিয়েছি আমি। ওর সব কথাই মেনে নিয়েছি আমি। লোকটার অবশ্য একটা পরিচয় আমার জানা আছে। খুব ভালো করেই জানি। কিন্তু সেটা নাকি ওর আসল পরিচয় নয়, হাসান বলেছে।

আমি যে পরিচয়টা জানি সেটা হাসানও জানে। এই লোকটাই রুহুল আমিন। এই লোকটাই আমাদের রুমিং হাউসের বাসিন্দা ছিল, আমার পাশের রুমে। এই রুহুল আমিনই মোমবাতি নিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছিল আমার রুমের কারেন্ট আছে না চলে গেছে, যে-রাত্রে সেই, সেই ঘটনাটা ঘটেছিল। হাসানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই লোকটাই নাকি আমার অস্তিত্ব অকস্মাৎ বিপন্ন করে তুলেছে। আমার জীবনের চারপাশে সৃষ্টি করেছে কালো মেঘের অশুভ পায়তারা।

হাসানের প্রথম আদেশ হলো, ওকে দিয়ে কথা বলাতে হবে সবচেয়ে আগে যদি তাতে করে সারারাত অতিবাহিত হয়ে যায়-যাবে। অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না ও প্রথম কথা বলে। এরমধ্যে নিশ্চয় কোনো-না-কোনো তাৎপর্য আছে, কিন্তু আমার একক চিন্তায় সে তাৎপর্যের ব্যাখ্যা নেই কোনো।

ও কথা বলল অবশেষে। বলতে একজনকে না একজনকে হতোই, কিন্তু আমি বলতামই না।

কিভাবে ‘তুমি’ এসেছ এখানে?

ব্যাঙের কোঁকানির মতো স্বর ওর, বিকৃত।

তুমিই তো রাস্তা চিনিয়েছ আমাকে, নয় কি?

ঠোট জোড়াকে স্থির করার প্রাণপণ প্রয়াস পাচ্ছে ও। বেসুরো গলায় বলল আবার আমার কথা শুনে তুমি তাহলে...তুমি তাহলে স্মরণ করতে পার এখানে আসার কথাটা!

তুমি ভেবেছিলে, স্মরণ করতে পারব না রাস্তাটা, তাই না?

চোখ জোড়া ঘুরতে লাগল ওর বিস্ফারিত দুই পাপড়ির ওপারে। বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেছে ওর মন, নিশ্চয়ই। বলে উঠল পার না...তুমি পার না সে-কথা স্মরণ করতে!

ওর গলার স্বরে অবিশ্বাস। আমি এবং আমার রিভলবার, নড়লাম না আমরা কেউই। বললাম তাহলে কিভাবে আবার আমি এখানে ফিরে এলাম? তুমিই বল?

বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো আতঙ্কের প্রবাহ ওর আপাদ মস্তক চলাচল করছে। দেখলাম, আমি যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি সেই দেয়াল-আলোমারির দিকে বেকুবের মতো তাকিয়ে আছে ও। বা হাতটা আমার পেছনে চলে গেল। ঠেলা দিয়ে বন্ধ করে দিলাম আয়না ফিট করা দরজাটা।

কতক্ষণ ধরে তুমি এখানে রয়েছ এভাবে?

বললাম অন্ধকার নামার কিছু আগে থেকে।

নতুন করে পুরনো প্রশ্ন আবার করল ও কে তোমাকে সাথে করে নিয়ে এসেছে এখানে?

এই রিভলবারটা।

রিভলবারটা চোখের ইঙ্গিত দেখিয়ে দিলাম ওকে। এবার ও যে প্রশ্নটা করল সেটা নাকি না করে কোনো উপায় থাকতে পারে না, হাসান আগেভাগেই জানিয়ে দিয়েছে আমাকে। যদি জিজ্ঞেস না করে তাহলে ও নাকি মর্তের মানুষই নয়।

ঠিক কি কি, কোন্ কোন্ ঘটনা স্মরণ করতে পার তুমি?

সবজ্ঞানী ধরনের একটু হাসি দিলাম ওকে। সব বুঝল ও কথার বদলে এই হাসি দেখেই। হাসিটা অবশ্য ধার করা, আমার নয়। হাসানের মুখের হাসি, কিন্তু পরিবেশন করলাম আমার ঠোঁট জোড়ার মিলিত ব্যবস্থাপনায়।

তোমার মনে আছে গাড়ি করে আসার কথা?

নিচু, ফাঁসফেঁসে গলায় উচ্চারণ করল ও, কিন্তু গলায় এখনও সন্দেহের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম নয়। যোগ করল অধিকতর দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে: সম্ভব নয়! কিভাবে সম্ভব হবে! তোমার চোখের দৃষ্টি, সেই নিয়মমাফিক টিপিক্যাল দৃষ্টি...!

কেমন দৃষ্টি?

চূপ করে থাকল ও। ফিরে পাচ্ছে ও ওর মানসিক ভারসাম্য। হাসানের শেখানো বুলি আওড়ালাম আমি আবার সারা রাস্তা আমি একটা পেরেক হাতের চেটোয় বিঁধিয়ে এসেছিলাম।

তাহলে কেন তুমি সব কাজ করলে যা যা বললাম আমি... যা যা বলা হয়েছিল তোমাকে, নিখুঁতভাবে?

আমি জানতে চেয়েছিলাম, ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে থাকে। ভেবেছিলাম, ব্যাপারটার মধ্যে হয়ত নিশ্চয়ই কোনো রকম ভালো আছে পড়ে আমার জন্যে।

তুমি উদ্দেশ্যমূলকভাবে অভিনয় করেছিস? সম্মোহিতের মতো? মানে সম্মোহিত হওনি? বিশ্বাস করতে পারছি না আমি! তুমি মুহূর্তের জন্যেও চঞ্চল

হও, একবারের জন্যেও পালাতে চেষ্টা করনি যখন গাড়ি থেকে নামিয়ে তোমার হাতে ছোরাটা দিলাম, যখন বাড়িটার দিকে পাঠিয়ে দিলাম, বললাম কিভাবে ঢুকতে হবে ভিতরে এবং কি করতে হবে! তুমি বলতে চাইছ, বাড়ির ভিতর ঢুকে তুমি সচেতনভাবে, সজ্ঞানে...?

বাড়িতে ঢুকে কাজটা করেছি আমি তাতে সন্দেহ কোথায়? করেছি, কেননা আমি মনে করেছিলাম পরে তোমার কাছ থেকে মোটা অক্ষের টাকা আদায় করতে পারব, তুমি আমার মুখ বন্ধ করে রাখার জন্যে টাকাটা দিতে বাধ্য হবে। তাছাড়া এমন এক পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম যে, তোমার ‘আদেশ’ পালন না করে কোনো উপায় ছিল না। হয়ত ছোরাটা বিদ্ধ হতো আমারই পিঠে কাজ সমাধা না করে ফেরার চেষ্টা করলে, অবশ্য ভুলটা আমারই।

কি ঘটেছিল, ভিতরে কি গোলামাল হয়েছিল?

অ্যাক্সিডেন্টলি ছোরাটা নিচের তলার অন্ধকার হলে পড়ে যায় আমার হাত থেকে, সেটা আবার খুঁজে না পেয়ে খালি হাতে উপরে যেতে যেতে ভাবি, শুধুমাত্র ভয় দেখিয়ে বাড়ির পিছনের পথ দিয়ে ভাগিয়ে দেব ওদেরকে, তারপর নিজেকে বাঁচাবার সুযোগ নেব একটা। কিন্তু মকবুল হোসেন তেড়ে এল আমার দিকে, পেড়েও ফেলল আমাকে সাথে সাথে। আমার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাবান ও, খুন করে ফেলতে বাকি ছিল বড়জোর কয়েক মিনিট। সামান্য একটু দেরী হলেই ইহলীলা সঙ্গ হয়ে যাচ্ছিল আমার ওর হাতে। শুধুমাত্র আমার হায়াতগুণে এবং মিসেস্ কায়েসের ভুলক্রমে কুড়ুলটা চলে এল আমার হাতে মকবুল হোসেনের বদলে। আত্মরক্ষার্থে ঘা মারলাম ওকে কুড়ুলটা দিয়ে।

লোকটা এমনভাবে মাথা নাড়ল যেন কোনো একটা দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল ওর। বলল: ওহ, ছোরার বদলে কুড়ুলটা কেন ব্যবহার হলো বুঝতে পারলাম এতক্ষণে, ব্যাপারটা তাহলে এইরকম! তাছাড়া ভাবছিলাম, একজন আবার তোমার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়ে কিভাবে। ভাগ্য ভালো মকবুলের গাড়িতে আগে থেকেই বসেছিলাম আমি, তা না হলে গোলামাল হয়ে যেত সব। ও ড্রাইভিং জানত না বলেই গাড়ির দিকে ছুটে আসেনি। বাড়ি থেকে বের হয়ে বড় রাস্তার দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল ও চীৎকার করতে করতে। গাড়ির ভিতরে বসেছিলাম, দেখতে পায়নি তাই আমাকে গাড়িটা যখন ওর পিছনে ছুটিয়ে দিয়েছি তখনও পিছন ফিরে থাকায় নিশ্চয় ভেবেছিল, তুমিই নিচে নেমে গাড়ি নিয়ে অনুসরণ করছ ওকে। ওকে ধরার মারল কে, তা জানতেই পারে নি। সময়মতো যদি ওকে গাড়ি-চাপা দিতে না পারতাম তাহলে সমস্ত

উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হতো কিন্তু, কি বোকা আমি! আমার বোঝা উচিত ছিল যে, তুমি আমার ক্ষমতার আয়ত্তাধীন না হয়েই...।

হাসানের কথানুযায়ী, দড়ির উপর থেকে পা ফসকে অনেক আগেই পড়ে গেছে লোকটা। অনেক কথা, গুরুত্বপূর্ণ কথা স্বীকার করে ফেলেছে ও। বলা যায়, বাধ্য হয়েছে স্বীকার করতে। কিন্তু আমি এখন হাঁটছিল সরু দড়ির উপর দিয়েই, বলা যায়, কেন এবং কোন্দিকে তা না জেনেই। বললাম যথাক্রমে তোমার যথেষ্ট আয়ত্তাধীনে ছিলাম আমি, ঘাবড়িও না নিজের ক্ষমতা কাজে লাগেনি মনে করে। 'তোমার কৌশল, নৈপুণ্য হারাও নি তুমি।

কিন্তু এই তুমি বললে...!

এবং তুমি বোকার মতো বিশ্বাস করেছ তা। আমি আসলে বিন্দু বিসর্গ কিছুই জানি না কি করেছিলাম যখন তুমি আমাকে সাথে নিয়ে গাড়িতে করে এখানে পৌঁছে দিয়েছিলে। পৌঁছে দিয়ে যখন এই রুমে পাঠিয়েছিলে তখনকার কাজগুলোও সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে, অচেতন মনে করেছি। মনে রেখ, তুমি আমার পাশের রুমে থাকতে, এবং তোমার রুমে দু'-একবার ঢুকেছি আমি।

চুপ করে গেলাম আমি। হাসান এই জায়গায় চুপ করে যেতে বলেছিল আমাকে। লোকটাকে দিয়ে এখানে স্বইচ্ছায় স্বীকার করিয়ে নেবার চেষ্টা করতে হবে, ওব ঘরে কখনও ঢুকিনি আমি। মিথ্যে কথা বানিয়ে বললাম। ধরতে পারবে বলে মনে হয় না। মনের অবস্থা সেরকম নয় এখন ওর।

তাতে কি হলো?

প্রশ্ন করল ও। বললাম ফটো দেখেঠিলাম আমি।

কার ফটো বললাম না।

ফটো দেখেছিলে! কিন্তু সে তো আমার স্যুটকেসে ছিল! তোমার সামনে কোনোদিন স্যুটকেস খুলিনি তো আমি!

বললাম: তুমি একদিন স্যুটকেস খুলছিলে পিছন ফিরে, মন ছিল কোনইদিকে কে জানে, স্যুটকেসের দিয়ে তাকিয়েছিলে তুমি গভীরভাবে লক্ষ্য করনি তোমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছি আমি। স্যুটকেসের ফটো দেখে ফেলেছিলাম আমি।

স্যুটকেসে ফটো ছিল একথা লোকটা স্বীকার করল বলেই মিথ্যে কথাটা বানিয়ে বলতে পারলাম আমি। হাসানের নির্দেশ।

তুমি তাহলে আমাদের দু'জনার ফটো একসাথে দেখেছিলে? কিন্তু কোনোদিন জানতে চাওনি তো আমার সাথে ওর সম্পর্ক কি?

কাজ হচ্ছে। বললাম ব্যক্তিগত ব্যাপার মনে করে জিজ্ঞেস করিনি। তোমার পিছনে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছিলাম আমি, তুমি কি মনে করবে ভেবে ফিরে এসেছিলাম নিঃশব্দে, টের পাওনি।

তুমি তাহলে জান, ওর সাথে আমার সম্পর্ক কি?

না। তা কি করে জানব? কিন্তু স্মরণ ছিল তোমার সাথে, একসাথে দেখা মহিলার ফটোর চেহারাটা। কি সম্পর্ক ছিল ওর সাথে তোমার? লোকটা একমুহূর্ত কি যেন ভাবল। ভারপর বলে উঠল বা বলছিলে যেটা শেষ করো।

আমি শুরু করলাম ফটোটা আমার স্মরণে ছিল। যাকগে, যা বলছিলাম। যে-রাত্রের ঘটনাটার খানিকটা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না আমি। যতটুকু জানতাম, সকাল বলা উঠে ভাবলাম, দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু না! কিন্তু খবরের কাগজে বের হলো খুনের খবরটা। কুড়ুল দিয়ে হত্যার খবরটা ছিল, আয়না ফিট করা দরজাবিশিষ্ট দেয়াল আলমারির কথাও ছিল। এসব কথা স্মরণে ছিল আমার দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে। মিসেস্ কায়েসেরও ফটো দেখেছি আমি। এর আগে কথাটা মনে পড়েনি আমার, যদিও উচিত ছিল। যাই হোক, সন্দেহ হলো, অবশ্য কোনো ভিত্তি খুঁজে পাইনি সন্দেহের যে, তুমি প্রত্যক্ষভাবে এর সাথে জড়িত।

তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু তুমি জানলে কিভাবে যে, আজ রাতে আমি আসব এখানে? একটু আগে বলেছ যে, ওর সাথে আমার সম্পর্ক কি তা তুমি জান না।

জানি না, তা ঠিক। কিন্তু একটা সম্পর্কে কথা আন্দাজ করে নেয়া অসম্ভব নয়। তবে ভুল করছ তুমি, সম্পর্কের ব্যাপারে অজ্ঞ হলেও কিছু যায় আসে না। আজই তুমি এখানে আসবে তা অবশ্য জানতাম না। আসলে, প্রতিদিন সময় পেলে এখানে এসে লুকিয়ে থাকি আমি। কেন যেন আমার ধারণা হয়েছিল, তোমার সাথে মিসেস্ কায়েসের যে সম্পর্কই থাকুক না কেন, তুমি এখানে একবার না একবার আসবেই। সুতরাং তোমার দেখা পেতে হলে এখানে লুকিয়ে থেকে দিন গোণা ছাড়া আর কি করার ছিল আমার, বল? তোমার দেখা শেষপর্যন্ত আমি পেয়েছি। এবং আমার সন্দেহও বাস্তব বলে প্রমাণিত হয়েছে। নিজের মুখেই তুমি স্বীকার করে ফেলেছ তোমার অপরাধের কথা। আমি ঠিক করে ফেলেছি কি করব তোমাকে নিয়ে। টাকা-পয়সার লোভ এই মুহূর্তে নেই আমার। আর তোমার যা টাকা আছে তাতে আমার মন ভরবেও না। তুমি হয়ত দুর্বল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হিসেবে বেছে নিয়েছ আমাকে, কিন্তু সেই সাথে আমি যে চরমপন্থী লোক তা তোমার জানা ছিল না। আমি একজন নিরপরাধী, সৎ মানুষ ছিলাম। তুমি আমাকে দিয়ে, আমার অজ্ঞাতে, মানুষ খুন করিয়েছ আইনের চোখে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে পারবে না কোনোদিন। এর জন্যে তোমাকে মূল্য দিতে হবে। এইভাবে...!

দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও, গুলি করো না... এতে কোনো লাভ হবে না কিন্তু তোমার। আমি বেঁচে থাকলে হয়ত তোমার জন্যে কিছু করতে পারি, সুতরাং



আমাকে বাঁচিয়ে রাখাটা তোমার পক্ষে সবচেয়ে জরুরি। আমি তোমাকে প্রচুর টাকা-পয়সা দিতে পারি। দেশত্যাগ করার জন্যেও ব্যবস্থা করে দিতে পারি। কেউ জানবে না।

জানবে। আমার বিবেক চিরকাল ধরে জানবে। এখন আমার শরীরটা একটা হত্যাকারীর শরীর, কিন্তু মনটা একনও বিবেকসম্পন্ন মন। দোষটা তোমার, অপরাধটা তোমার, পাপটা তোমার। তোমাকে ক্ষমা করা যায় না। এবার। গুলি করছি...।

এদিকে দেখ, ...এই যে, এই দিকে তাকাও...।

প্রার্থনা করে চলল লোকটা এদিকে দেখো। মাত্র এক মিনিট আর। দেখো...কাঁটা দু'টো দশের অঙ্কে। তাকাও, এই যে এদিকে, এই দিকে... সেকেন্ডের কাঁটাটা আবার এই দেশে না আসা পর্যন্ত... তাকাও ...এই যে...।

আমি দেখতে পাচ্ছি, ও কি যেন করার চেষ্টা পাচ্ছে। হাসান এ ব্যাপারে বারবার সাবধান করে দিয়েছে আমাকে। তাড়াতাড়ি ওর মুখের দিক থেকে চোখ নামিয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম মেঝের দিকে, ওর পায়ের সামনে রিভলবারটা তেমনি ভাবেই ধরে আছি। ওর একটা হাত নড়ে উঠতে বাধ্য হয়ে তাকালাম সেদিকে। হাতঘড়ি ছাড়া একটা পকেটঘড়িও ওর সাথে রয়েছে। সেটা পকেট থেকে বের করে আমার দিকে নিচু করে ধরল ও। আবার সেই কথা মাত্র কয়েক সেকেন্ড... দেখো না, দেখো তুমি, এই দিকে দেখো...।

রিভলবারের ট্রিগারটায় গোলমাল হয়েছে কোনো, নড়ছে না কেন। আঙুল দিয়ে পঁচিয়ে ধরে টানার চেষ্টা তো করছি, কিন্তু আসছে, পিছছে না। কিংবা হয়ত দোষ আমার আঙুলের, আঙুলটা বোধ হয় আমার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করছে না, আমার আদেশ পালন করছে না।

ঘড়ির ডায়ালে বৈদ্যুতিক উজ্জ্বল আলো পড়ে প্রতিফলন ঘটছে। প্রতিফলিত আলো আমার চোখ জোড়া ঠোকবাচ্ছে। চোখ কুঁচকে থাকছি আমি, বারবার। প্রতিফলিত আলোটা চোখে পড়ছে, সরে যাচ্ছে, আবার পড়ছে, আবার সরে যাচ্ছে, আবার...। এমন বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়াচ্ছে গোটা ব্যাপারটা যে এদিকে না তাকিয়ে নিস্তার নেই আমার।

ধীরে ধীরে উপর পানে তুলে ধরল ও ঘড়িটা। ছোট্ট একটা শব্দ হলো, যেন দম দেয়ার গোল চাকাটা ধরে দ্রুত এবং গোপনে টানল ও। অব্যাহত হবার আর কোনো ক্ষমতা থাকছে না আমার। উপরে ধরে আনল ঘড়িটা, যেমন করে সেই রাতে মোমবাতিটা ধরে রেখেছিল ও, যেন নিম্নের ডায়ালটার দিকে তাকিয়ে থাকতে কোনো অসুবিধে না হয় আমার। আমি ওর চোখের উপর দৃষ্টি রাখলাম।

এবং অকস্মাৎ আমার দৃষ্টি অপলক হয়ে গেল। এক ধরনের আরামপ্রদ নিষ্ক্রিয়তা, জড়তা পেয়ে বসল আমাকে যেন নরম খানিকটা মোম আমি, বা যেন সাবানের ফেনা আমার সর্বশরীর, বা যেন মাখনের মতো নরম হয়ে গেছি আমি। আমার যেন আর কিছুই নেই; অতীত না, বর্তমান না, ভবিষ্যতও না। আমি যেন কি! আমার যেন কোনো ইচ্ছা নেই, কামনা নেই, রাগ নেই, দুঃখ নেই, সুখ নেই। যেন শরীর নেই, মন নেই। যেন আমি নেই, যেন কেউ নেই, পৃথিবী নেই...। কিন্তু আমি নেই, এরকম একটা উপলব্ধি হলেও আমি যেন আছিও। কিছু নেই, তবু যেন সব আছে। এখন আমি আর আমার নই। সকলের, যার ইচ্ছা তার আমি। সবাই চালাতে পারে আমাকে, সবাই ফেরাতে পারে, নাড়াতে পারে।

আমার কণ্ঠস্বর যতটুকু সময় ধরে বের হচ্ছে তার চেয়েও বেশিক্ষণ ধরে শোনা যাচ্ছে আমি তোমাকে গুলি করব এবার।

না।

লোকটা মোলায়েম করে বলছে আবার তুমি ক্লান্ত, তুমি কাউকে গুলি করতে চাও না। তুমি খুবই ক্লান্ত, হ্যাঁ, তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, রিভলবারটা সে তুলনায় খুব বেশি ভারী। একটা ভারী জিনিস কেন তুমি ধরে রাখতে চাইছ!

রিভলবারটা পড়ে যাবার শব্দ বহুদূর থেকে এসে আমার কানে বাজল। শুনতে পেলাম। যেন এই রুম ছাড়িয়ে, এই বাড়ি ছাড়িয়ে বহুদূরের একটা শব্দ শুনতে পেলাম। বড্ড অলসতা জাগছে আমার, উফ্। আলো চলে যাচ্ছে, কিন্তু ক্রমশ, যেন আলোটাও খুব ক্লান্ত। গোটা দুনিয়াটাকেই ক্লান্ত বোধ হচ্ছে। কে যেন পড়াচ্ছে: তুমি ক্লান্ত, খুবই ক্লান্ত তুমি... হারামজাদা, এবার তোমাকে পেয়েছি।

### [সম্মোহনের প্রভাবে চিন্তাশক্তির বিরতি]

শুভ্র আলোকচ্ছটা যেন আমার মাথার ভিতর বিচ্ছুরিত হচ্ছে। যন্ত্রণা, আঘাত পাচ্ছি রীতিমতো। কি যেন, ঠাণ্ডা এবং ভিজে আমার চোখের পাতায় চাপ দিচ্ছে, যখন আমি প্রাণপণে পাপড়ি দু'টো মেরুতে চেপ্টা করছি।

যখন চোখের পাপড়ি মেললাম আমি, ঘুম ভাঙার পরমুহুর্তে আলোর যেমন চোখ ধাঁধিয়ে যায় তেমন না হয়ে ঠিক বিপরীত ভাবে পৃথিবীটা আমার সামনে গাঢ় অন্ধকার হয়ে দেখা দিল। যন্ত্রণাবোধ ক্রমশ বিপরোয়া হয়ে উঠল। নাড়া দিচ্ছে মাথা থেকে লাংস্ পর্যন্ত। তীক্ষ্ণধার ছুরি দিয়ে যেন ফালাফালা করে কাটা হচ্ছে মধ্যবর্তী পথটুকু। আমি নিশ্বাস ফেলতে পারছি না। শ্বাস নিতে পারছি না।

চোখের বলটা ছিটকে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। মাথাটা ফেটে যাবে বলে সন্দেহ করছি। প্রচণ্ড আঘাত হানছে অন্ধকারের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চেউগুলো আমার উপর। বুঝতে পারছি, পানির অতল তলে ডুবে যাচ্ছি ক্রমশ। সাঁতার কাটতে পারব মনে হচ্ছে, কিন্তু কাটছি না। আমি উঠতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনো একটা বাধা আমাকে উঠতে দিচ্ছে না।

দু'বার পাশ ফিরলাম পরপর। অন্ধের মতো পা দু'টো হুঁড়লাম। আমার চারদিকের আবছা, অস্পষ্ট পরিবেশটাকে তাড়াতে চাই আমি।

একটা আকৃতিহীন অন্ধকারময় জড়পিণ্ড কোথা থেকে যেন হাজির হলো। ধাক্কা দিল মৃদুভাবে আমাকে। আবার সরে গেল আমি সেটাকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করবার আগেই। খুব পরিস্কারভাবে সেটাকে এখন দেখতে পাচ্ছি না, তবে মনে হচ্ছে পানির মধ্যে কোনো গোলমেলে বস্তুর আবির্ভাব ঘটেছিল।

আমার ত্বকের ভিতরের দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। জড়পিণ্ডটা রূপান্তরিত হয়েছে ইতোমধ্যে কেবল একটা ছায়ায়। অপেক্ষাকৃত কাছে সরে এল সেটা। যেন ঝুলছে ওটা। দুলছে আমার পাশে।

বুঝতে পারছি একটা হাত আমার ঘাড় ধরে আছে। তারপর একটা ছোরা এসে ঠেকল আমার তলপেটের কাছে। ফেরত নেয়া হলো ছোরাটা আবার। দড়ির বাঁধনে বাঁধা হয়েছে যেন আমাকে, অনুভব করা যাচ্ছে।

নিজেকে অনুভব করা ছাড়া আমার মগজের আর সব কাজ এখন স্থগিত। আমাকে পানির নিচে যথেষ্টভাবে নাড়াচাড়া করা হচ্ছে।

আমার কপালে কোথাকার একটা বড় পাথরের স্পর্শ পেলাম। পাথরটা ছুঁড়ে মারা হয়নি, আমিই গিয়ে ধাক্কা মেরেছি পাথরটাকে। উপরপানে দেখতে পাচ্ছি উজ্জ্বল তারার সমাবেশ। ভিজে গেছি আমি, ভিজে গেছে কাপড়-চোপড় সঁগতসঁতে ঠেকছে। মুখ দিয়ে পানি বের হচ্ছে গলগল করে। কে যেন আমার পাশে বসে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, চাপড় মারছে, নাড়া দিচ্ছে। কে যেন আমার হাত-পা ধরে ঘন ঘন উপরে তুলছে আর নামাচ্ছে, উপরে তুলছে আর নামাচ্ছে।

অনেকক্ষণ ধরে কাশলাম আমি। এবং কে যেন বলে উঠল ঠিক হয়ে যাবেন, এই তো ভালো হয়ে আসছেন উনি।

কথাটা বলে উঠে দাঁড়াল ও, ওকে চিনতে পারছি আমি হ্যাঁ, পরিস্কারভাবে চিনতে পারছি। হাসান। ওর পরনে শার্ট নেই। শুধু একটা আভারওয়্যার।

এক মিনিট পর ইন্সপেক্টর গাউস চৌধুরী আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পরনেও কেবল আভারওয়্যার, বাকি উঠলেন চলুন, এবার ওকে নিয়ে ফেরার ব্যবস্থা করি। কফি ছাড়া বাঁচব না আর একদণ্ড।

আমাদের পিছনের কোনো জায়গা থেকে আলো আসছিল। সামনে নদী। পাশেই একটা গাছ। দেখতে পাচ্ছি গাছের পাশে জড়ো করা আমার শার্ট, প্যান্ট, জুতো। শার্টের উপর একটা কাগজ। সাদা, ধবধবে সাদা কাগজ।

হাসান কাগজটা হাতে তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করল:

“আমি মি. কায়েসের বাড়িতে সংঘটিত দু’টি মানুষ হত্যার দায়ে দায়ী। খুন করার দরকার ছিল ওদেরকে। পুলিশ আমাকে খুঁজে পাবেই আগে বা পরে। তাই আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনো পথ দেখছি না আমি।

মোহাম্মদ আবদুর রহমান।”

লেখটা আমার নিজের হাতের। উজ্জ্বল আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি;

হাসান ইন্সপেক্টরকে বলল এটা কি দরকার আমাদের?

চিন্তিভাবে ঠোট কামড়ে ধরলেন গাউস চৌধুরী। বললেন নষ্ট করে ফেলাই ভালো। বিচারকমণ্ডলীর কেউ কেউ অতি-মনোযোগিতার পরিচয় দিয়ে থাকেন, ন্যায় বিচারের ভার বহন করতে অসুবিধেয় পড়েছেন মনে করে ভুগতে পারেন তাঁরা। পুড়িয়ে ফেলুন।

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফেলল হাসান কাগজটা।

এখন বেশ সুস্থ মনে হচ্ছে নিজেকে। কষ্টগুলো দূর হয়ে গেছে। শুধু মাঝে মাঝে কাঁপছি নিজের অজ্ঞাতে। আমি পিছন দিকে তাকিয়ে লালচে আলোর উৎসের চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে উঠলাম কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বরে কি ওটা?

লোকটার গাড়ি। তুমি যাকে রহুল আমিন বলে জানো তার। আমরা পিছু পিছু এসে পড়াতে বেরোয়াভাবে গাড়ি গাড়ি ঘুরিয়ে ভাগতে চেয়েছিল অন্য পথে, উল্টে গিয়ে আগুন ধরে গেছে।

দুর্বলভাবে হাসার চেষ্টা করলাম আমি। হাসি বের হলো না, কেবল বিকৃত দেখাল মুখ-ভঙ্গিটা অনুমান করলাম।

গুলি ওকে আমিই করেছি প্রথম।

ইন্সপেক্টর বললেন। হাসানের রক্তব্যও গুলনাম আমরা তিনজনই একসাথে গুলি করেছিলাম। কার গুলিটা যে আগে লেগেছে বলা মুশকিল। জালাও যাবে না কোনোদিন। দরকারও নেই। আমি আর হেদায়েত খান পানিতে নেমেছিলাম। তোমার রহুল আমিনকে গুলি না করে উপায় ছিল না কোনো। সময় মতো হিপনোসিস্ ভাঙবার জন্যে ওকে আক্রমণ না করলে কি যে হতো খোদা মালুম। তুমি তো ‘নিজের’ ইচ্ছায়ই ক্রমশঃ ডুবে যাচ্ছিলে। লোকটার দিকে রিভলবার ধরে তোমার ওপর থেকে তার প্রভাব প্রত্যাহার করে নেবার জন্যে লুকুম করা

যেত, কিন্তু তাতে দেৱী হয়ে যেত অনেক । তোমাৰ অবস্থান জানাৰ পৰ চোখেৰ সামনে নোঙৰেৰ দড়ি ছাড়া আৰ কিছু দেখতে পাইনি আমৰা । নৌকো তো পৰে পাওয়া গিয়েছিল ।

একটা ছায়ামূৰ্তি আমাদেৰ দিকে হেঁটে আসছিল লালচে আলোৰ দিক থেকে । হেদায়েত খান । সামনে এসে বলল কোনোই উপায় নেই । সব ছাই হয়ে গেছে ।

ফিৰে যাওয়া যাক বাড়িটায় ।

হাসান বলল ।

ফিৰে এলাম আমৰা । যেখানে ফিৰে এলাম সেখান থেকেই গিয়ে-ছিলাম আমি । কিন্তু কিভাবে গিয়েছিলাম, যাৰাৰ কথা বিন্দু-বিসৰ্গ কিছুই মনে নেই আমাৰ । ফিৰলাম আমৰা চাৰজন । ফেৰাৰ কথা ভুলব না, মনে থাকবে ।

আমাকে ওৱা ঘুমোবাৰ ব্যবস্থা কৰে দিল । ওৱাও কাটাল ৰাতটা ওখানে । পৰে আমি জানতে পেৰেছিলাম, এতসব অপৰাধেৰ হোতা যে, যে দায়ী, যে আমাৰ জীৱনেৰ সবচেয়ে ভীষণতম এবং সৰ্বনেশে শত্ৰু, তাৰ বিছানাতেই ৰাতটা ঘুমিয়ে কাটিয়েছিলাম আমি ।

ভোৰবেলা হাসান আমাৰ কাছে উঠে এসে বসল । অন্য দু'জনেৰ ঘুম ভাঙেনি তখনও । খানিক পৰে ওৱ সাথে কোথায় যেতে হবে আমাকে তা আমাৰ জানা আছে ভালো কৰেই । কিন্তু খুব বেশি ভয়-ভাবনা নেই সে জন্যে আৰ ।

ওকে জিজ্ঞেস কৰলাম কোনো উপকাৰে আসবে নাকি গতৰাতে যা যা কৰেছি আমি? সাহায্য কৰবে আমাকে?

নিশ্চয় ।

হাসান যোগ কৰে বলে যেতে ৰাগল এই তো চেয়েছিলাম আমি গতকালকে অতোটা সময় ধৰে এখানে এসে কি কৰেছিলাম বলে মনে কৰো তুমি? তোমাকে বাৰবাৰ কৰে নিৰ্দেশ দিয়েছিলাম কেন লোকটাকে কথা বলাবে আট দেয়াল-আলমাৰিবিশিষ্ট ৰুমের ভিতৰেই, বাইৰে কোথাও নয়? সব ব্যৱস্থা সেই অনুযায়ী কৰেছিলাম আমি, ফলে তোমাদেৰ সবটুকু আলাপ-আলোচনা লিখে নিতে পেৰেছি আমৰা । বেজমেন্টেৰ নিচে ছিলাম আমৰা তিনজনৰ পাঁচাকা দিয়ে । তাছাড়া টেপ-ৰেকৰ্ডাৰেৰ ৱিসিভিং সুইচটা অন কৰে ৰেখে দিয়েছিলাম একটা দেয়াল আলমাৰিৰ ভেতৰে । ৱেকৰ্ডে এখন সম্পূৰ্ণ ব্যাপ্তিটা ৱক্ষা কৰা গেছে । যে ৱিভলবাৰটা তোমাকে দিয়েছিলাম সেটাৰ সবকটা গুলি বের কৰেই দিয়েছিলাম । তাতেই কাজ হবে, ধাৰণা ছিল আমাৰ । যথেষ্ট ভয় পেয়েছিল ও তোমাৰ হাতে ৱিভলবাৰ দেখে । সন্দেহ কৰতে পাৰেনি যে, ওতে একটাও গুলি

নেই। ফলে ভয়ে মাথাটা প্রথম দিকে গুলিয়ে যায় ওর, এবং স্বীকার করতে থাকে এক এক করে সব কথা। আমাদের একটু ভুলের সুযোগে দ্রুত তোমাকে সাথে নিয়ে নিজের গাড়িতে গিয়ে ওঠে ও আমরা বাধা দেবার আগেই আর একটু হলে তোমাকে হারাতাম আমরা চিরতরে। গাড়িটা দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়েছিল। একটা ট্রাক-ড্রাইভার দেখেছিল শুধু গাড়িটাকে লেকের দিকে যেতে। তার কথার ওপর নির্ভর করেই গাড়ি ছুটিয়ে ছিলাম আমরা। ভাগ্য ভাল, ট্রাক-ড্রাইভারটা ঠিকই দেখেছিল। তোমাকে দিয়ে ও আত্মহত্যার স্বীকৃতিপত্র লিখিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু এর দায়ে আমরা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত না ওর বিরুদ্ধে।

হাসান একটু থেমে আরম্ভ করল তোমার মুখে সব শুনে আমার ধারণা হয়েছিল, রুহুল আমিন এবং তার মোমবাতি তোমাকে হয়ত হিপনোটাইজড অর্থাৎ সম্মোহিত করেছিল। কিন্তু প্রমাণ করব কিভাবে? ব্যাপারটা, সম্মোহনের মধ্যেও এমনই দারুণ এবং নির্মম যে লোকে তা এমনিতেই অবিশ্বাস করবে। তাই প্রমাণ ছাড়া চলতো না। প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে। আমি সরকারের নিরাপত্তা বিভাগে যতবড় চাকরীই করি না কেন, আমার বক্তব্য বলার সময়ও প্রমাণ দাবী করা হতো। বরং বিশেষভাবে প্রমাণ চাওয়া হতো আমার ক্ষেত্রে। যাক, শেষ পর্যন্ত সবই পাওয়া গেছে। এখন আমার সাথে সাথে আরো দু'জন পুলিশ অফিসার প্রকৃত ব্যাপারটা চাক্ষুষ দর্শন করেছে বা স্বকর্ণে শুনেছে—নতুন করে, দ্বিতীয়বারেবটা। টেপ-রেকর্ডারেও রেকর্ড করা রয়েছে তোমাদের সম্পূর্ণ কথাবার্তা। এবং এসব প্রমাণ এমনই বলিষ্ঠ যেগুলো অস্বীকার করতে পারবেন না কোনো জুরি।

হাসান ধীরে ধীরে বলে চলেছে তুমি যখন খুনটা করেছ তখন ছিলে হিপনোটাইসিস অবস্থায়। কোনো স্বইচ্ছা ছিল না তোমার, কোনো বোধশক্তিও ছিল না। তোমার সচেতন মনটাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে কেড়ে নেয়া হয়েছিল তোমার সব মানবিক ক্ষমতা, শক্তি, গুণ। এটাই হলো আসল পয়েন্ট। স্রেফ একটা অস্ত্র ছিলে তুমি প্রকৃত খুনীর হাতে। তোমার নিজের বোধ-শক্তি বাতিল হয়ে গিয়েছিল, কোনো বোধ-শক্তিই সে-সময় ছিল না তোমার। দু'জনের শরীর পরিচালিত হচ্ছিল একজনের নির্দেশ মোতাবেক—খুনীর। কিহে, <sup>উন্নত</sup> পাচ্ছ নাকি খুব?

টোক গিয়ে দুর্বল কণ্ঠে বললাম নাহ্, মানে...।

হাসান মৃদু হেসে বলল ভাল হয় প্রথম থেকে যদি শুরু করি আমি। তুমি যাকে রুহুল আমিন হিসেবে চিনতে তার পরিচয় একটা নয় তিনটে। তিন নামে সে পরিচিত। তুমি মাত্র একটা পরিচয় জানো। দ্বিতীয় পরিচয় ওর বহুবছর পূর্বে

সে ছিল একজন পেশাদারী হিপনোটিস্ট। এই দুর্লভ গুণ মহৎ কোনো কাজে লাগাবার মতো পরিবেশ পায়নি ও। সে ইচ্ছাও ছিল কিনা জানা নেই। সস্তা দরে থিয়েটার হলে ও ওর যাদুকরী ক্ষমতা প্রদর্শন করত দেশে বিদেশে সর্বত্র। ‘বাহবা’ সার্কাসের নাম এখনও শোনা যায়, সেই সার্কাস পাটিতেও তখন ছিল ও। ওর স্টেজ-নেম ছিল ‘ওস্তাদ কেরামত মিয়া’। পুরোনা থিয়েটার পার্টির অনুষ্ঠানসূচি খুঁজে বের করেছি আমি, তাতেই জানা গেছে ব্যাপারটা। তাছাড়া এই বাড়ির গুদাম-ঘরে প্রাপ্ত পুরোনা দিনের কাগজপত্রও তা প্রমাণ করে। নিঃসন্দেহে দুর্লভ একটা ক্ষমতা ছিল ওর হিপনোটাইজড করার নির্দিষ্ট কোনো কিছুই ওপরে। কিন্তু সব ব্যাপারের মতোই, ক্ষমতাটা তার শর্ত নিরপেক্ষভাবে কাজে লাগার নয়। শুধুমাত্র, বিশেষ ধরনের লোকেরাই অপেক্ষাকৃত সহজে প্রভাবিত হতো— তাই হয়। ভালো কথা, রুহুল আমিনের তৃতীয় পরিচয়টা বলি। অনুমান করতে পার কি, রহমান?

সম্ভবত মিসেস্ কায়েসের স্বামী? মি. কায়েস?

ঠিক তাই। কায়েস আহমেদই আসলে রুহুল আমিন। বহুবছর আগে থিয়েটারে থিয়েটারে সম্মোহন বিদ্যার কেরামতি দেখিয়ে কায়েস আহমেদ সুনাম অর্জন করে পরিচিত হয়েছিল ওস্তাদ কেরামত মিয়া নামে। বেশি পয়সা রোজগার করত ও। সেই পয়সা কাজে লাগিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা একটা ব্যবসা শুরু করে। ব্যবসায় নেমেও ধীরে ধীরে বেশ পয়সা করে ও। টাকা-পয়সার সাথে দেখা দিল সম্মানবোধ। সম্মানবোধের খাতিরে সম্মোহন বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে লাগল ও ব্যবসার পিছনে পূর্ণোদ্যমে। প্রচুর টাকা করল ও। বিয়ের বয়স পেরিয়ে গিয়েছিল, তবু বিয়ে করল। তাও করবি তো কর, ওর চেয়ে অর্ধেকেরও কম বয়েসের একটা কলেজে পড়া মেয়েকে বিয়ে করে বসল ও। বিয়েটা করেছিল মেয়ের চাচাকে টাকার লোভ দেখিয়ে, এবং মেয়েটার আর কেউ ছিল না বলে। এভাবে, এতো কম বয়সের মেয়েকে বিয়ে করেই চরম ভুল করল ও। কেন না, বিয়ের আগে থেকেই ওর স্ত্রীর প্রেমিক ছিল একজন। বিয়ের পর, যখন ওর স্ত্রী মিসেস্ কায়েস নামে পরিচিতা তখন সেই প্রেমিকপ্রবর আবির্ভূত হলো ওর শুভানুধ্যায়ীর ছদ্মবেশে। মকবুল হোসেনকে দূর সম্পর্কের ভাই বলে পরিচয় দিল মিসেস্ কায়েস স্বামীকে। মকবুল হোসেন তখন পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। বেকার। পূর্ব-প্রেমিকার স্বামী বড়লোক দেখে লোভ হলো তার। প্রেমিকা তো তার মতোই আছে, শুধু স্বামী বোচারার মন জয় করল। মকবুল হোসেন যেন যেচে পড়ে ভালো সম্পর্ক তৈরি করে নিল কায়েস স্বামীর সাথে। এদিকে ভিতরে ভিতরে চলতে লাগল পরকীয়া প্রেম। কিন্তু অন্যায় আর কতদিন চাপা থাকে,

বল? মনে মনে সবই টের পেল কায়েস আহমেদ। কানাঘুয়া হয় আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে, ব্যবসা উপলক্ষে বাইরে থাকলে মকবুল হোসেন আর তার স্ত্রীর নাকি হাত-পা গজায় নতুন করে। বেপরোয়াভাবে দিন কাটায়, যা ভাই-বোনের সম্পর্কে সম্ভব নয়। সতর্ক হলো কায়েস আহমেদ। প্রকৃত সত্য জানার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলো। কিছুদিনের মধ্যেই সব জানতে পারল ও। তার অল্পবয়স্কা স্ত্রী এবং মকবুল হোসেন প্ল্যান করছিল—এবার কায়েস আহমেদ ব্যবসা উপলক্ষে বামায় গেলেই ওরা দু'জন সব টাকা-পয়সা, গহনা-গাটি নিয়ে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি জমাবে—ওদের সব কথা ওত পেতে শুনে ফেলল কায়েস আহমেদ।

একটু থেমে আবার আরম্ভ করল হাসান ষড়যন্ত্র শুনে মাথার রক্ত গরম হয়ে গেল কায়েস আহমেদের। স্বাভাবিক। বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রী এবং প্রাণের শত্রু মকবুল হোসেনকে হত্যা করবে সে—সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু নিজের হাতে খুন করলে নিজেকেও খুন করা হয় ইলেকট্রিক চেয়ারে। কিন্তু ভাবনা কি, সে তো হিপনোটিজম জানেই। প্ল্যান ঠিক করে ফেলল কায়েস আহমেদ। বার্মায় যাবার কথা ছিল আগে থেকেই। বার্মায় যাবার নাম করেই বাড়ি থেকে বের হলো ও। কিন্তু চিটাগাঙ ছেড়ে গেল না ও, বার্মায় তো নয়ই। গিয়েছিল অবশ্য পরে। বাড়ি থেকে বের হয়ে তোমাদের বাড়িতে নাম বদলে একটা রুম ভাড়া নিল ও। রুমিং-হাউস, সেখানে নানা রকম লোকের বাস। লোক বাছতে শুরু করল ও। পরীক্ষা করে দেখতে লাগল কাকে দিয়ে তার কাজ উদ্ধার হবে, করানো যাবে। তোমাকেও পরীক্ষা করল ও। এবং দেখল তুমিই হচ্ছে যোগ্য লোক ওর কাজের জন্যে। সে ভুল লোক বাছিনি তা গতকালও প্রমাণ হয়ে গেছে। তুমি সাবধান থাকা সত্ত্বেও সম্মোহিত হয়েছিলে দ্বিতীয়বার। একটা কথা, ও কিন্তু কোনো দিন তোমাকে পুলিশে দেবার কথা ভাবত না। পুলিশ তোমাকে খুঁজে পাক বা না পাক, তাতে কিছু যেত আসত না ওর। খুনী হিসেবে তুমিই প্রমাণিত হতে। শুধু নিজে কিছু জানতে না পারতে যদি তুমি তোমার দ্বারা সংঘটিত কাজগুলো সম্পর্কে, তাহলে সম্ভ্রষ্ট থাকত ও।

হাসান খালি পেটেই সিগারেট ধরাল, শুরু করল আবার— যা ঘটেছে বলে মনে হয় তা দেখে পুলিশ যাকে খোঁজবার কথা সে হচ্ছে তুমি। সব প্রমাণই নির্দেশ করবে, তুমি খুন করেছ। কায়েস জানত তাকে কখনও দায়ী করা সম্ভব হবে না। ও তোমাকে গাড়িতে করে এখানে নিয়ে এসেছিল, কেননা তুমি গাড়ি চালাতে জান না। কিংবা সম্মোহিত অবস্থায় গাড়ি চালানো সম্ভব কিনা, জানা নেই আমার। হিপনোটিজম সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানি না আমি।



আমার মনে একটা প্রশ্ন রয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম-আচ্ছা, তুমি আমাকে রিভলবার দিয়ে আয়না লাগানো রুমে রেখে গেলে, তারপর এল রুহুল আমিন বা কায়েস আহমেদ। কিন্তু তুমি জানলে কিভাবে ও সেই সময় আসবে?

তোমাকে দিয়ে কাজটা সমাধা করার পর কথামতো বার্মায় চলে গিয়েছিল ও, সম্ভবত পরদিনই। সেখান থেকে টেলিগ্রাম করে স্ত্রীর নামে-গতকাল সেই টেলিগ্রাম ইন্সপেক্টর গাউস চৌধুরী পান। আমি তখন ওঁর সাথেই ছিলাম। দেখলাম টেলিগ্রামটা। সেই মতো পরিকল্পনা করেছিলাম আমি।

একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। পরদিন সকালে অমন পুংখানুপুংখভাবে হত্যার দৃশ্যটা কিভাবে স্মরণ করতে পারলাম আমি, হাসান? বিশেষ করে ওদের দু'জনার মুখের চেহারা...?

কায়েস আহমেদের কন্ট্রোলিং ক্ষমতা শতকরা একশ ভাগ কার্যকরী হয়নি। কখনো তা সম্ভব কিনা জানা নেই আমার। সম্পূর্ণ দৃশ্যটা নিশ্চয়ই তোমার সচেতন মনে মৃদুভাবে ছায়া ফেলেছিল, পরদিন তোমার স্মরণশক্তি সেই কথা নাড়াচাড়া করতে করতে মনের ভিতর থেকে বের করে এনেছিল। যেমন স্বপ্ন দেখলে হয় আর কি। আর ব্যাপারগুলো তোমার অচেতন মনে ঠাঁই করে নিয়েছিল। যদি বাস্তবে সেই জিনিসগুলোর সংস্পর্শে তুমি না আসতে তাহলে অচেতন মন চাপা দিয়েই রাখত তা মৃত্যু পর্যন্ত গুপ্তধনের মতো। সেই সুরু মতো গলির কথা, গলির মুখে দু'টো ল্যাম্প-পোস্ট, দরজার স্পেয়ার চাবি রাখার বাস্ক, হলের রাইট-সুইচ, ইত্যাদি সব তোমার মনে পড়ে গিয়েছিল কেবলমাত্র সে জায়গায় গিয়ে পড়েছিলে বলে। যাই হোক, যা বললাম তা আমার নিজস্ব ব্যাখ্যা, এর বেশি কিছু বোঝার বা বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই।

কেন আমার মনে হয়েছিল যে, যুবতীটি আমার পরিচিতা, অথচ চিনতাম না যখন? জায়গাটাকেও মনে হচ্ছিল পরিচিত, কেন?

ওসব চিন্তা তোমার ছিল না, ছিল কায়েস আহমেদের। কায়েস আহমেদের হয়ে তোমার মাথা কাজ করছিল।

আমি এখন তৈরি। ইন্সপেক্টর গাউস চৌধুরী এবং হেদায়েত খান চলে গেছেন আমাদেরকে কথা বলতে দেখে। ওরা হয়ত ভালো মনে করেছে হাসানের সাথে আমার যাওয়াটা। এবং হাসান আমার কাছে গোটা ব্যাপারটা সহজ করে তুলতে প্রয়াস পাচ্ছে। ইন্সপেক্টরও বলে গেছেন, যখন হোক ওকে সাথে করে নিয়ে আসবেন, মি. রহমান।

আধ ঘণ্টা পর আমরা দু'জন বেরিয়ে পড়লাম বাস্তুটা থেকে। আমি জানি, আমাকে হাজতে থাকতে হবে অল্প সময়ের জন্য, কিন্তু ভয়ের কিছু দেখছি না ওতে।

থানার সম্মুখে গাড়ি থামিয়ে হাসান প্রশ্ন করল-ভয় পাচ্ছ নাকি হে?

একটু পাচ্ছিলাম, যেমন দাঁত তুলতে বা ভাঙা পা ঠিক করতে যাবার সময় পায় মানুষ, তার চেয়ে বেশি নয়। জানা আছে, কাজটা ঘটবেই এবং ঘটার পর পরম আরাম পাওয়া যাবে। বললাম স্বীকার করে এবং হাসার চেষ্টা করেঃ সামান্য।

সব ঠিক করে দেয়া হবে।

প্রতিজ্ঞা করল ও। গাড়ি থেকে নেমে আমার কাঁধে হাত রেখে যোগ করল: সবটুকু সময় তোমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকব আমি। নিয়ম অনুযায়ী ফর্মালিটিগুলোও হয়ত পালন করতে বলা হবে না তোমাকে।

একসাথে গেটের দিকে পা বাড়ানাম আমরা।

-----

 *The Online Library of Bangla Books*  
**BanglaBook.org**